মুহাম্মাদ বিন কাসিম এর
সিন্ধু অভিযান-১
স্বপ্নের তারকা
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

সিন্ধু অভিযান-১

স্বপ্নের তারকা

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযান - ১

স্বপ্নের তারকা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

রূপান্তর

শহীদুল ইসলাম

সম্পাদক, গবেষক, গ্রন্থকার

দারুল উলূম লাইব্রেরী

বিন কাসিম-এর সিন্ধু অভিযান-১

স্বপ্নের তারকা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

রূপান্তর ঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশক ঃ শহীদুল ইসলাম

দারুল উলূম লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭২-৫০৭৮৭৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী— ২০০৫

কম্পিউটার কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

SAPNER TAROKA : Writer Enayatullah Altamas, Translated by Shahidul Islam, Published by Darul Ulum Library, Bishal Book Complex, 37, North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Mobile : 0172-507877

PRICE : TAKA ONE HUNDRED ONLY

ISBN : 984-8409-02-5

উৎসর্গ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজো
যারা ভারতের পৌত্তলিক শাসকদের শোষণ-
নিপীড়নের নাগপাশ থেকে মুসলমানদের
মুক্তি দিতে অবিরাম জিহাদ করে
যাচ্ছেন এবং ইরাক থেকে আগ্রাসী
বেঈমানদের উৎখাত করতে
জীবনপণ যুদ্ধ করছেন
তাদের সাফল্য
কামনায়—

প্রকাশকের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

বর্তমানে এদেশে ঔপন্যাসিক আলতামাশের পরিচয় দেয়ার যেমন প্রয়োজন পড়ে না, তদ্রূপ বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও অনুবাদক শহীদুল ইসলাম-এরও বিশেষ পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামী উপন্যাসের রুচিবান পাঠক মাত্রই তাঁর অনুবাদ ও লেখার সাথে পরিচিত। কালজয়ী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ-এর অন্যতম কীর্তি মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর সিন্ধু অভিযান সিরিজ এর এটি প্রথম খণ্ড। যা স্বপ্নের তারকা নামে প্রকাশিত হলো।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটিকে সার্বিক সুন্দর করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পাঠক পাঠিকা মহলে এ সিরিজ আদৃত হলেই আমাদের প্রয়াস স্বার্থক হবে।

প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম এর নাম জানে না এমন শিক্ষিত লোক কমই রয়েছেন। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই মুসলিম ইতিহাসের এই মহানায়কের সাথে কমবেশী পরিচিত। শিকড় ও ঐতিহ্য সন্ধানী গল্প উপন্যাস পাঠে অভ্যস্তরাও মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর উপর লেখা একাধিক উপন্যাস হয়তো পড়েছেন নয়তো অন্তত নামটুকু হলেও শুনেছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সতের বছর বয়সী মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম এই মহানায়কের কীর্তি-কর্ম, বৈশিষ্ট্য গুণাবলী এবং তাঁর ভারত অভিযানের প্রেক্ষিত প্রেক্ষাপটের প্রকৃত চিত্র না আছে একক কোন ইতিহাস গ্রন্থে না আছে উপন্যাসে। উপন্যাস ও গল্প লেখকগণ প্রধান কয়েকটি চরিত্র, বিশেষ স্থান ক্ষেত্র ও ঘটনার উল্লেখ করে গল্পকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্যে যতটুকু নাট্যরূপ দেয়ার দরকার তাই করেছেন। ইতিহাসও চরিত্রের বস্তুনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি মোটেও মনোযোগী হননি। যার ফলে বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রথম বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ তৎকালীন সিন্ধু রাজা দাহির ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির প্রকৃত চিত্র কোথাও পাওয়া যায় না।

উপমহাদেশের অন্যতম ইতিহাস গবেষক, শিকড় সন্ধানী ঔপন্যাসিক 'এনায়েতুল্লাহ আলতামাস' পূর্বাপর সকল ঐতিহাসিকদের রচনাবলী মন্থন করে বিন কাসিম এর উপর রচিত উপন্যাসগুলোর বিকৃতি দূর করার জন্যে উর্দু ভাষায় মুহাম্মদ বিন কাসিম এর জীবনকে কেন্দ্র করে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ভিত্তিক যে রচনাটি উপস্থাপন করেন এর নাম—

"সিতারা জো টোট গিয়া"

বাংলা ভাষাভাষী পাঠককুল বিশেষ করে উপন্যাস ও গল্পপ্রেমী নবীনদেরকে ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে বস্তুনিষ্ঠতার বিচারে মনোত্তীর্ণ এ গ্রন্থটির অনুবাদের ইচ্ছা আমার অনেক দিন থেকে। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে অনুবাদ কর্মে হাত দেয়া হয়ে ওঠেনি। দারুল উলূম লাইব্রেরীর পরিচালক শহীদুল ইসলামের উপর্যুপরী অনুরোধে শত ব্যস্ততার মধ্যেও অনুবাদকর্মে হাত দিতে হয়েছে। দুই খণ্ডে লিখা মূল উর্দু বইটিকে আমরা সিরিজ আকারে চারখণ্ডে প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করে। এটি মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর সিন্ধু অভিযান সিরিজের প্রথম খণ্ড। এ উপন্যাস পাঠককে নিয়ে যাবে প্রায় তেরশ' বছর আগের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আরব সাগরের তীরবর্তী সিন্ধু অঞ্চল এবং বসরা বাগদাদ ও ইরাকে। পাঠকের চোখে ভেসে উঠবে সে সময়কার ইরাক, ভারতের হিন্দু রাজাদের শঠতা, পুরোহিতদের মুসলিম বিদ্বেষ আর মুসলিম মুজাহিদদের আত্মত্যাগের অম্লান চিত্র। সকল শ্রেণীর পাঠ উপযোগী করার চেষ্টা করেছি। এরপরও হয়তো অনেক ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। আশা করি পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবহিত করবেন।

শহীদুল ইসলাম
পান্থনীড়
আনন্দবাজার,
নেত্রকোণা।

৬৩০ খৃস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারী। ৮ হিজরী সনের ১৫ শাওয়াল। রাসূল (স.) তায়েফ অবরোধ করলেন। হুনাইন ও আউতাসে তুমুল লড়াই করে তায়েফ পৌঁছে মুসলিম লস্কর। তায়েফ শহরকে অবরোধ করার প্রাক্কালে বেঈমানদের আতংক আল্লাহর তরবারী নামে খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালিদ মারাত্মকভাবে আহত হলেন। খালিদের আঘাত খুবই মারাত্মক। জীবনের আশা নেই। জীবন মৃত্যুর মুখোমুখী খালিদ। বীর বাহাদুর খালিদ শত্রু পক্ষের আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি। শত্রু বাহিনীর অসংখ্য ধাবমান ঘোড়া তাঁর ওপর দিয়ে চলে গেছে। এমতাবস্থায় খালিদ যে জীবিত রয়ে গেছেন সেটিই ভাগ্যের ব্যাপার।

রাসূলের জীবনে এটি ছিলো হক ও বাতিলের মধ্যে একটি যুগান্তকারী লড়াই। আবু বকর, ওমর, আব্বাস (রা.)-এর মতো প্রথম সারির সকল সাহাবীই লড়াইয়ে লিপ্ত। রাসূল (স.)-এর নেতৃত্বে তায়েফ এলাকার অধিবাসী বনী ছাকিফও হাওয়াযিন কবিলার মোকাবেলায় মিলিত হচ্ছে। এতোদঞ্চলে বনী ছাকিফ ও হাওয়াযিন কবিলা যুদ্ধবাজ হিসেবে খ্যাত। মালিক বিন আউফ নামের এক ত্রিশ বছরের যুবক মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে এমন কঠিন লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের কথা শুনতে অবাক লাগলেও মালিক বিন আউফ এতো অল্প বয়সেই যুদ্ধবাজ কবিলা দু'টির সেনাপতিত্ব করার সর্বময় যোগ্যতার অধিকারী। কবিলা দু'টির মধ্যে মালিক বিন আউফের কোন জুড়ি নেই। মালিক বিন আউফ কবিলা দু'টির জন্যে বিস্ময়কর যুদ্ধ প্রতিভা, আশা ভরসা সকলের গর্ব। তরুণ মালিক বিন আউফ তার কৌশলী চালে হুনাইন ও

আউতাসে মুসলিম বাহিনীকে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলো। এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর দু'টি ইউনিট পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়।

খালিদ বিন ওয়ালিদ জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি। ক্ষতস্থান থেকে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তার শরীর অসাড় হয়ে পড়ে। রাসূল (স.) তাকে দেখে ক্ষতস্থানে ফুঁ দিলেন। এতে খালিদ চোখ মেলে তাকালেন। রাসূল (স.)-এর বরকতময় স্পর্শে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন খালিদ। এরপর মারাত্মক আঘাত নিয়েই শেষ অবধি রণাঙ্গনে অবিচল থাকলেন তিনি।

তায়েফ অবরোধ ছিলো এ যুদ্ধের শেষ ও চূড়ান্ত মহড়া। হুনাইনে রাসূলে কারীমের নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম চরম আঘাত হানলে ছাকিফ ও হাওয়াযিন গোত্র মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পশ্চাদপসারণ করে কবিলা দু'টি দুর্গসম তায়েফ শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চাদপসারণ করলেও তাদের মনোবল এতোটুকু দুর্বল হয়নি। বরঞ্চ তারা ছিলো অপরাজিতের আত্মশ্লাঘায় উৎফুল্ল। দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে মালিক বিন আউফ ঘোষণা করলো, "আমরা মুসলমানদের ভয়ে আশ্রয় নেইনি, বরং মুসলমানদেরকে আমাদের ইচ্ছে মতো যুদ্ধ করাতেই দুর্গে এসেছি।"

দীর্ঘ আঠারো দিন অবরোধ বহাল রাখা হলো। মুসলমানরা বিপুল উৎসাহে দুর্গ প্রাচীর ডিঙ্গানোর জন্যে আক্রমণ করতে গিয়ে শত্রুপক্ষের শরাঘাতে আহত ও নিহত হতে লাগলো। অবরোধ শেষে রাসূল (স.) শীর্ষস্থানীয় সাহাবী আবু বকর, ওমর, আব্বাস প্রমুখের সাথে পরামর্শ বৈঠকে বসলেন। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম অবরোধ প্রত্যাহার করে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অধিকাংশ সাহাবী দুর্গ প্রাচীর ডিঙিয়ে দুর্গ জয় করার জন্যে উদগ্রীব ছিলো। সাহাবায়ে কেরামের প্রবল আগ্রহে রাসূল (স.) আর একবার দুর্গ প্রাচীর ডিঙানোর অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম দুর্গ প্রাচীরে তীব্র আঘাত হানলেন। কিন্তু দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলো। এতে বহু সংখ্যক সাহাবী আহত ও নিহত হলেন। তাদের পক্ষে আর প্রাচীর ডিঙানো সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে তাদের পিছু হটতে হলো।

অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করা হলো। মুসলমানদের অধিকাংশ যোদ্ধাই আহত ছিলেন। তাদের হতাহতের সংখ্যাও ছিলো প্রচুর। অনেকেই শাহাদত বরণ করেন। আহতদের অনেকেই ছিলেন চলাচলে অক্ষম। পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন বহু

সাহাবী। অধিকাংশ যোদ্ধা আহত থাকার কারণে দ্রুত তাঁবু গুটিয়ে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। প্রয়োজনের তুলনায় তাঁবু গোটাতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া খুব বেশী আহতদের জন্যে প্রয়োজন ছিলো নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম। রাসূল (স.) আহতদের বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্যে দুর্গ এলাকা থেকে তাঁবু গুটিয়ে জি'রানায় পৌছে তাঁবু ফেলেন।

মুসলমানরা ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাদের প্রত্যাবর্তন শুধু ব্যর্থতার গ্লানীই বহন করছিলো না, বিপুল সংখ্যক সহযোদ্ধাকে হারানো ও আহত হওয়ার যাতনাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো প্রচণ্ড মনোকষ্ট। তায়েফ নগরী নিত্যদিনের মতোই অপরিবর্তনীয় ছিলো, অজেয় দুর্গ প্রাচীর যেন মুসলমানদের ব্যর্থতায় উপহাস করছিলো।

কিন্তু প্রচণ্ড যাতনা, ব্যর্থতার গ্লানিকে ছাপিয়ে গেলো আকস্মিক এক ঘটনায়। যেন অলৌকিক ঘটনার মতোই ঘটে গেলো ব্যাপারটি। জি'রানা থেকে মুসলমানরা তখনও তাঁবু গুটিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হননি, এমন সময় বনী ছাকিফ কবিলার শীর্ষস্থানীয় ক'জন লোক মুসলমানদের শিবিরের দিকে এগিয়ে এলো। তারা শিবিরের কাছে পৌছে প্রহরীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তাদেরকে রাসূল (স.)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন শক্তিশালী সাহাবী নাঙ্গা তরবারী ও বর্শা নিয়ে ওদের প্রতি সতর্ক প্রহরা দিতে লাগলেন। কারণ প্রবল শত্রু পক্ষের এই লোকগুলোকে কোন অবস্থাতেই মুসলমানরা নিরাপদ ভাবতে পারছিলেন না। কেননা, বেশ কয়েকটি অমুসলিম গোত্র নবীজী (স.)-কে হত্যা করার অব্যাহত চক্রান্ত করছিলো। হাওয়াযিন গোত্রের জন্যে সমুহ বিপদ সৃষ্টি করেছিলো মুসলমানদের হাতে বন্দী তাদের কিছু সংখ্যক নারী ও শিশু। দুর্গ অবরোধের আগে এক যুদ্ধে ওদের পরাজয় ঘটে। তাতে কিছু সংখ্যক হাওয়াযিন নারী ও শিশু মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তখনকার নীতিতে এরা ছিলো যুদ্ধ বন্দী। পরাজয় কিংবা বিজয় অথবা সামরিক চুক্তি ছাড়া তাদের পক্ষে মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়া নারী শিশুদের ফিরে পাওয়ার কোন পথ ছিলো না। এদিকে রাসূল (স.) ঘোষণা করে দিলেন যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও যদি শত্রু পক্ষের কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার সকল সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হবে।

হাওয়াযিন গোত্রের আগত লোকদের মধ্য থেকে নেতৃস্থানীয় এক লোক বললো—হে মুহাম্মদ! আমাদের কবিলার লোকসহ সবাই তোমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে। আমাদের কবিলার সবাই তোমার ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।

আল্লাহর কসম! তোমরা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছো। এটাই "সীরাতে মুস্তাকীম" বললেন রাসূল।

কবিলার সর্দার বললো, হে মুহাম্মদ! আপনি তো আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের নারী শিশু ও সহায়-সম্পদ ফিরিয়ে দেবেন?"

"আমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং আমাদের লোকজনকে হত্যা করে যে সব জিনিস তোমরা হারিয়েছো, সেগুলো ফিরে পাওয়ার কোন অধিকার তোমাদের নেই" বললেন রাসূল (স.)। তবে যে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্কে তোমরা মহান প্রভু ও রব হিসেবে মেনে নিয়েছো, তার সম্মানে তোমাদের আমি হতাশ করবো না। তোমাদের কাছে নারী শিশু নাকি সহায়-সম্পদ বেশী প্রিয়?

"আপনি আমাদের নারী শিশুদের অন্তত ফিরিয়ে দিন।" বললো প্রতিনিধি দলের নেতা।

রাসূল (স.) হাওয়াযিন কবিলার নারী শিশুদেরকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের নেতাদের কাছে রাসূল (সা)-এর এই উদারতা ছিলো আশাতীত। রাসূলের এই উদারতায় গোটা হাওয়াযিন গোত্রের লোক ইসলামে দীক্ষা নিলো।

এ ঘটনার দুই তিনদিন পর অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি মুসলমান শিবিরে অনুপ্রবেশ করতে চাইলো। লোকটির মাথা ও চেহারা ছিলো কাপড়ে ঢাকা। চোখ দু'টো ছাড়া তার কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। নিরাপত্তারক্ষী সাহাবায়ে কেরাম যখন তার প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন, তখন সে নিজের পরিচয় না বলেই রাসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলো।

"তুমি কি তায়েফ থেকে আসনি? জিজ্ঞেস করলেন একজন নিরাপত্তারক্ষী।

"হ্যাঁ, তায়েফের দিক থেকেই এসেছি আমি।" বললো আগন্তুক।

কিছু সংখ্যক মুসলমান যোদ্ধা ফকীর ও উট চারকের বেশে তায়েফ দুর্গের আশে পাশে বিচরণ করছিলেন, ওদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যে। কারণ

অবরোধ তুলে নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে ওরা কোন অতর্কিত হামলা করে কি-না এ বিষয়টি আগে ভাগেই জানার জন্যে রাসূল এ গোয়েন্দা ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব সাহাবীদের কয়েকজন দুর্গ ফটক পেরিয়ে এই লোকটিকে মুসলিম শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে ওর পিছু নেন। শিবিরের নিকটবর্তী হলে তার পথ রোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে নিজের পরিচয় না বলেই নবীজীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করে।

"আমরা তোমাকে তায়েফ দুর্গ থেকে বের হতে দেখেছি। বললেন এক সাহাবী। আল্লাহর কসম! তুমি সংকল্পে সফল হতে পারবে না।"

"যে সংকল্প নিয়ে এসেছি তা পূর্ণ করেই যাবো।" বললো আগন্তুক। তোমরা কি আমাকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যেতে দেবে না?"

"কিভাবে দেবো? তুমি এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে তোমার চেহারাই দেখাচ্ছো না।"

একটানে চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে ফেললো আগন্তুক। আল্লাহর কসম! আরে তুমি তো মালিক বিন আউফ। তোমার পথ রোধ করার শক্তি আমাদের নেই। দুই তিনজন সাহাবী মালিক বিন আউফকে নবীজী সকাশে নিয়ে গেলেন।

"বিন আউফ! কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছো, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?" জিজ্ঞেস করলেন রাসূল (স.)।

"আমি আপনার ধর্মে দীক্ষা নিতে এসেছি।" বললো মালিক বিন আউফ। ঠিক সেই মুহূর্তেই ছাকিফ গোত্রপতি মালিক বিন আউফ নবীজীর হাতে হাত রেখে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেন।

মালিক বিন আউফ কেন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব। মালিক বিন আউফ যখন রাসূল (স.)-এর হাতে হাত রেখে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখন তার উপর কোন ধরনের চাপ ছিলো না। দৃশ্যত সে তখন বিজয়ী গোত্রের সেনাপতি। বস্তুত মালিক বিন আউফের ইসলাম গ্রহণের কোন যৌক্তিক কারণ ছিলো না। হতে পারে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের প্রতি সদয় হয়ে রাসূল (স.) তাদের নারী শিশুদের মুক্ত করে দেয়া এবং হাওয়াযিন গোত্রের সকল লোক ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি মালিক বিন আউফকে প্রভাবিত করেছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর ছাফিক গোত্রের এই বীরযোদ্ধা ইসলামের পক্ষে অনেকগুলো যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। আজো তায়েফ ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

আজ থেকে এক হাজার পৌনে চারশ বছর আগে রাসূল (স.) তায়েফ শহর অবরোধ করেছিলেন। তায়েফবাসীদের জীবনপণ মোকাবিলার কারণে শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীকে অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসতে হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা সেই অবরোধের চৌষট্টি বছর পর তায়েফকে এমন এক সৌভাগ্যে উদ্ভাসিত করলেন যা তায়েফ ইতিহাসের পাতায় চিরকাল মাইল ফলক হয়ে থাকবে। আর সেই সৌভাগ্যের প্রথম মাইল ফলক ছিলো বনী ছাকিফ গোত্রের বীর পুরুষ মালিক বিন আউফের ইসলাম গ্রহণ।

৬৯৪ হিজরী সনের ঘটনা। তায়েফের অধিবাসী এক তরুণী বধূ সন্তান সম্ভবা হলেন। তরুণীর স্বামী ইসলামী সালতানাতের একজন তুখোর সৈনিক। সেনাবাহিনীতে সে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। ছুটির অবসরে সেই সেনা বাড়িতে এলে স্ত্রী লাজনম্রকণ্ঠে স্বামীকে জানালো অন্তঃসত্তা সে। ভাবী সন্তানের আশায় সে বুক বেঁধে রয়েছে। সেই সাথে স্ত্রী এও জানালো, ভয়ংকর একটি স্বপ্ন দেখে সে ভীত হয়ে পড়েছে। তার স্বপ্নময় প্রত্যাশ্যার আশপাশে উঁকি দিয়েছে কতগুলো ভীতিকর ভূতুরে কাণ্ড।

তরুণী স্বামীকে জানালো— আমি স্বপ্নে দেখেছি হঠাৎ আমার ঘরটি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, এমন ঘন অন্ধকার যে আমি নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখতে পারছিলাম না। ভয়ে আতঙ্কে আমি জড়সড় হয়ে গেলাম। আমার ভয় হচ্ছিলো ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি ঘরে একা ছিলাম। খুব জোরে চিৎকার করে কাউকে ডাকতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আমার মুখ থেকে একটুও শব্দ বের হচ্ছিলো না। মনে করছিলাম ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে যাই, কিন্তু তাও পারছিলাম না। শত চেষ্টা করেও আমার পা এক কদম উঠাতে পারছিলাম না। গভীরভাবে ব্যাপারটি ভাবতে চেষ্টা করি কিন্তু সব চিন্তা-ভাবনাই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলো। কোন কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না...।

কিন্তু মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছিলাম। আর নানা দু'আ-কালাম পাঠ করছিলাম। এতোটুকু বোধ আমার অক্ষুণ্ন ছিলো। এমন সময় দূর আকাশের এক কোণে একটি তারা দেখা দিলো, তারাটি প্রথমে আবছা আলো আঁধারে অস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারাটি ঝকমকে দীপ্তিমান হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে আসমানের তারাটি আমার দিকে নেমে আসলো। আঁধার ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে আলোকিত তারাটি আমার ঘরে এসে পড়লো,

এতে আমার ঘরটি আলোয় আলোয় ভরে গেলো। এ যেন যমীনের কোন আলো নয়, অন্য রকম আসমানী নূর। এ আলোয় আমার ভয় ভীতি সব দূর হয়ে গেলো। মনটা এক ধরনের প্রশান্তিতে ভরে গেলো। ঠিক এ সময়ই আমার ঘুম ভেঙে গেলো।"

"মন্দ কোনো স্বপ্ন দেখোনি। মনে তো হয় ভালোই দেখেছো।" বললো তরুণীর সৈনিক স্বামী।

"কিন্তু অন্ধকারটা কি দেখলাম?" অন্ধকারটার কথা মনে হলে আমার কেমন যেন ভয় লাগে। আচ্ছা, তুমি কি এমন কোন আলেম চেনো যে স্বপ্নের তা'বীর ভালো বলতে পারে?"

"ভাগ্যে যা লেখা রয়েছে তা কেউ বদলাতে পারে না। স্বপ্নের তা'বীর যদি ভালো না হয়, তা কি তুমি বদলাতে পারবে?" বললো স্বামী।

"মন্দের কথা মুখে এনো না। আমার বিশ্বাস ভালোই হবে। আগে তুমি জিজ্ঞেস তো করবে? জিজ্ঞেস না করে নিজে নিজেই কেন ব্যাখ্যা দিচ্ছো? স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্যে এ সেনা অফিসারের যুবতী স্ত্রী স্বামীর কাছে জিদ ধরলো। স্ত্রীর সন্তুষ্টি বিধানে অবশেষে সৈনিক স্বামী তায়েফের সমকালীন শ্রেষ্ট বুযুর্গ ইসহাক বিন মূসার শরণাপন্ন হলো। ব্যক্ত করলো স্ত্রীর স্বপ্নের আদি অন্ত ইসহাক বিন মূসার কাছে। ইসহাক বিন মূসা জ্যোতির্বিদ্যায় ও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি স্বপ্নের বর্ণনা শুনে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে সৈনিকের ডান হাত নিজ হাতে নিয়ে গভীরভাবে তার হস্তরেখা নিরীক্ষা করে বিমর্ষ হয়ে হাত ছেড়ে দিলেন। কোন কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ নীরব বসে থেকে ভাবী সন্তানের সৈনিক পিতা বললো, "বলুন ইবনে মূসা! স্বপ্নের ব্যাখ্যা যদি মন্দও হয়, তবুও আমাকে বলুন। তাতে আমি ঘাবড়ে যাবো না।"

"না না। তা'বীর মোটেও মন্দ নয়।"বললেন ইসহাক বিন মূসা। তোমার স্ত্রীর গর্ভে এমন এক ছেলে জন্ম নেবে আকাশের উজ্জ্বল তারকার মতো যার দ্যুতি সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে। সে আল্লাহর দ্বীনের আলো দুনিয়ার দিকে দিকে বহু জনপদে ছড়িয়ে দেবে। শত শত বছর পরের লোকজনও তার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তার নির্দেশে মুসলিম যোদ্ধারা বহু দূর পর্যন্ত ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়ে দেবে। কিন্তু...

ইসহাক কথা শেষ না করেই নীরব হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছিলো তিনি কোন কথা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চান।

আল্লাহর কসম! ইবনে মূসা! আপনার এই থেমে যাওয়া খুবই রহস্যজনক। আমি যে কোন মন্দ খবর শুনতেও প্রস্তুত। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন। আমাকে সংশয়ের মধ্যে না ফেলে আপনি যা বুঝতে পেরেছেন তা সরাসরি বলুন।"

"তাহলে শোন! যে তারকা সদৃশ সন্তান তোমার ঘর আলোকিত করবে, সে এমন তারকাদের অন্তর্ভুক্ত যেসব তারকা অল্প সময়ের মধ্যে হারিয়ে যায়, খসে পড়ে। অবশ্য দৃশ্যত এসব তারকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এদের আলো থাকে দীর্ঘ সময়। এ সন্তান তোমার ঘরে বেশীদিন না থাকলেও তোমার ঘর অন্ধকার হবে না। মানুষের মনে সে জীবিত থাকবে অনন্তকাল। তোমার ঘর আলোকিত থাকবে সারাজীবন। মানুষ মনের মুকুরে তার স্মৃতি ধরে রাখবে, তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।"

"তাহলে আমিও তাকে এভাবে লালন-পালন করবো, যাতে সে ইসলামের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে নিজেকে আলোকিত করতে পারে.........।" বললো ভাবী সন্তানের পিতা।

"একথাও তোমার জেনে রাখা দরকার, এ সন্তানের লালন-পালনের সুযোগ তোমার হবে না, সে বড় হবে তোমার স্ত্রীর আদর-সোহাগে।"

কেন? আমি তাকে লালন-পালন করতে পারবো না কেন?

"সে কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমার যা বলার ছিলো আমি বলে দিয়েছি।" বললেন ইসহাক বিন মূসা।

ভাবী সন্তানের সৈনিক পিতা ইসহাক বিন মূসার দরবার ত্যাগ করে স্ত্রীর কাছে ইসহাকের দেয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সবিস্তারে ব্যক্ত করলো।

স্ত্রী স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে অজানা আশাবাদে উৎফুল্ল হলো বটে, কিন্তু সন্তানের হায়াত কম হবে ভেবে দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলো।

সন্তান প্রসবের দিনক্ষণ যখন ঘনিয়ে এলো, তখন ভাবী সন্তানের সৈনিক পিতাকে সরকারীভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলো সে। পিতার মৃত্যুতে ইসহাক বিন মূসার আশংকাই বাস্তবরূপ লাভ করলো যে, ভাবী সন্তানকে তার পিতা লালন-পালন করার সুযোগ পাবে না। পরবর্তীতে ইসহাক বিন মূসা এ ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন,

ভাবী সন্তানের মা স্বপ্নের প্রথমে যে অন্ধকার দেখেছিলো, তা ছিলো ভাবী সন্তানের পিতা ও তার স্বামীর মৃত্যুজনিত অন্ধকার। যে অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হয়ে ঘর আলোকিত করবে এ সন্তান।

পিতার মৃত্যু হলো তায়েফ থেকে বহু দূরে। মৃত্যু সংবাদ স্ত্রীর কাছে পৌঁছার কিছুদিনের মধ্যেই মৃত সৈনিকের ঘর আলোকিত করে জন্ম নিলো এক দীপ্তিময় পুত্র সন্তান। নবজাত শিশু খুব নাদুস নুদুস। শিশুর চওড়া কপাল, দ্যুতিময় দুটো চোখ, উন্নত নাসিকা, কান্তিময় চেহারা প্রগাঢ় দৃষ্টি আর আকর্ষণীয় হাবভাব দেখে যে কারো মনে হতো এ শিশু সাধারণ কোন শিশু নয়, এ অন্য শিশুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অকস্মাৎ মৃত্যুবরণকারী সৈনিকের নাম ছিলো কাসিম বিন ইউসুফ। আর নবজাতক শিশুর নাম রাখা হলো মুহাম্মদ বিন কাসিম। এই মুহাম্মদ বিন কাসিমই পরবর্তীকালে জগৎ বিখ্যাত ভারত বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম হিসেবে ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বলে পরিচিত হয়েছেন।

কাসিম বিন ইউসুফ আর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন আপন ভাই। তখন খলীফা ছিলেন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। কাসিম ও হাজ্জাজ ছিলেন যুদ্ধ বিদ্যা ও রণকৌশলে খুবই পারদর্শী। খলীফার সেনাবাহিনীতে উভয়েই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। সময়টি ছিলো এমন যখন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো। ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের জন্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত ছিলো মুসলিম সম্প্রদায়। ইসলামী খেলাফতেও তখন দেখা দেয় ভাঙন। দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ইসলামী খেলাফত। ইসলামী খেলাফত সিরিয়া মিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের ইরাক ও হিজাযে স্বাধীন হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উমাইয়া খেলাফতের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে উমাইয়া শাসকদের সাথে তার দেখা দেয় সংঘাত।

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের খ্যাতিমান দৌহিত্র। তিনি ইয়াযীদ বিন আমীরে মুআবিয়ার আনুগত্য করতেও অস্বীকৃতি জানান এবং হিজায ও ইরাকের মুসলমানদের একত্রিত করে পাল্টা সরকার গড়ে তোলেন। ইয়াযীদের পুত্র মুআবিয়া বিন ইয়াযীদ যখন শাসন কাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার ঘোষণা করেন, তখনই উমাইয়া প্রশাসনের সূচনা ঘটে। সেই সাথে নবী বংশ তথা ফাতেমীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় জুলুম অত্যাচার।

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের ফাতেমীদের উপর জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো দৃঢ় মনোবল নিয়ে রুখে দাঁড়ান।

উমাইয়া শাসকরা আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের শাসনের পতন ঘটানোর জন্যে প্রথমে ইরাকে সেনাভিযান চালায়। ইরাক কব্জা করার পর পবিত্র হিজাযেও সৈন্য প্রেরণ করে। এবং আক্রমণ চালায় মক্কা শরীফে। উমাইয়া শাসকদের হয়ে উভয় অভিযানেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। মদীনা শরীফের অবরোধ ভেঙে ফেলার জন্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বাইতুল্লাহ শরীফের উপরও মিনজানিক থেকে ভারী পাথর নিক্ষেপ করেন। ফলে বাইতুল্লাহ শরীফের ইমারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফতের বিরুদ্ধবাদীদেরকে দমনে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ব্যাপক ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে মালিক বিন মারওয়ানের খেলাফত বিরোধীদের পরাস্ত করেন। নির্মম ও কঠোর দমননীতির কারণে জালেম ও অত্যাচারী শাসক হিসেবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে রয়েছেন। নিজের নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হিসেবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরকে শহীদ করে তার মৃতদেহ চৌরাস্তায় কয়েকদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অত্যাচারের ভয়ে মক্কার লোকেরা আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের মরদেহকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনার সাহস করেনি।

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের এর বৃদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তিহীনা মাতা আবু বকর তনয়া হযরত আসমা লাঠিতে ভর দিয়ে চৌরাস্তায় ঝুলন্ত তার আত্মজের মরদেহে লাঠি দিয়ে ঠোকা দিয়ে কাঁপা কণ্ঠে আবৃত্তি করেন সেই বিখ্যাত পংক্তি—"এ কোন্ অশ্বারোহী! এখনো যে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেনি।"

আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া খেলাফতের অধীনতা বরণ করেন। উমাইয়া খলীফা তাকে হেজাযের গভর্নর নিয়োগ করেন। হাজ্জাজ গভর্নর হওয়ার সাথে সাথে হিজাযের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

অপরদিকে ইরাকের অধিবাসী খারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা এই ভেবে ক্ষিপ্ত ও খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। তাদের বিরোধিতা দমনেও

খলীফা জালেম গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে দায়িত্ব দিন। এক পর্যায়ে রক্তাক্ত যুদ্ধের পর খলীফা মালিক বিন মারওয়ান খারেজীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

খারেজীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েই হাজ্জাজের আপন ভাই কাসিম মৃত্যুবরন করেন। ফলে তার ঔরষে জন্মলাভকারী ভাবী তারকার মুখ দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাই কাসিম ছিলেন হাজ্জাজের ডান হাত। বড় সহযোগী। হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম তার ঐকান্তিক সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিজয়কীর্তি দিয়ে চাচা হাজ্জাজের জুলুম অত্যাচারের উপাখ্যানকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিতে সক্ষম হন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় মুহাম্মদ বিন কাসিম এমন ইতিহাস রচনা করেন যে, অমুসলিমরা তার আদর্শিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে তাকে পূঁজা করতে শুরু করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন দুনিয়ার আলো দেখলো তখন তাদের ঘরে দুঃখের বিষাদ ছেয়ে গেছে। নবজাত শিশুর পিতার মৃত্যুশোকে তার মা ও আপনজন শোকাতুর। শিশু জন্মের খবর হাজ্জাজের কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি ছুটে এলেন। হাজ্জাজ এলে শিশুকে তার কোলে তুলে দেয়া হলো। শিশুকে দু'হাতে নিয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন।

"এ শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করেছে বটে কিন্তু একে তুমি এতীম মনে করো না। আমি যতোদিন বেঁচে আছি মনে করো ওর বাবাই বেঁচে আছে। ছোট বউ! তুমি হয়তো জানো না, আমার এই ভাইটি আমার কতো প্রিয় ছিলো। সে আমার ছোট হলেও আমরা ছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ। তোমার স্বপ্নের কথা এবং ইসহাক বিন মূসার স্বপ্নের ব্যাখ্যার কথা সে আমাকে জানিয়েছিলো। তুমি মনে রেখো, তোমার এই সন্তান শুধু তায়েফের নয় সারা আরব জাহানের তারকা হবে। তুমি কখনও নিজেকে বিধবা ও একাকী ভেবো না। এই শিশুর দাদার খুনের কসম! যে খুন এই শিশুর শরীরে প্রবাহমান। আমি একে এমন শিক্ষা ও দীক্ষা দেবো শত শত বছর পরও আরবের লোকেরা তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। সে যুগের পর যুগ বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়রাজ্যে ও অন্তরের মণিকোঠায়।"

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের এসব কথা আবেগতাড়িত বক্তব্য ছিলো না। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাজকীয় লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার জন্যে বিশেষ শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা হলো। শৈশব থেকেই মুহাম্মদকে যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলার সার্বিক ব্যবস্থা করা হলো। তার খেলার সরঞ্জাম ছিলো ছোট্ট ছোট্ট তরবারী, বর্শা, ঘোড়া। বড় হওয়ার সাথে সাথে তার

খেলার সামগ্রীও বড় হতে লাগলো। কৈশোর থেকেই অশ্বারোহণ ছিলো তার খেলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশুর পিতার ঘাটতি যথাসম্ভব মা মিটিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। মা হলেও তিনি শিশুকে কখনো নিজের বুকে কোলে জড়িয়ে রাখতেন না। নিজের আঁচলে বেঁধে রাখার বদলে তাঁকে আদর সোহাগ দিয়ে সুপুরুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি সতর্ক যত্ন নিতেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ এর মাকে বলে রেখেছিলেন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোন সাধারণ সৈনিক নয় সেনাপতি হিসেবেই গড়ে তুলতে সচেষ্ট। শুধু রণাঙ্গনের সেনাপতিই নয় তিনি তাকে গড়ে তুলতে চান একজন দক্ষ সেনাপতি ও শাসক হিসেবে।

হাজ্জাজ নিজেও ছিলেন প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বাহাদুর পুরুষ। নিজের আজ্ঞা পালনে বাধ্য করতে যে কোন ধরনের জুলুম-অত্যাচারে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না হাজ্জাজ। তার অস্বাভাবিক শাসন শোষণের কারণে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান প্রথমে তাকে হিজাযের ও পরবর্তীতে ইরাক, বেলুচিস্তান ও মাকরানের প্রধান গভর্নর নিযুক্ত করেন। একটি মাত্র ঘটনায় খলীফা হাজ্জাজের অস্বাভাবিক কঠোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঘটনাটি ছিলো এমন —

খলীফা আব্দুল মালিকের সেনাবাহিনী ছিলো বিশৃঙ্খল। শত চেষ্টা করেও আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সেনা বাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারছিলেন না। সেনাবাহিনীর সবচেয়ে ত্রুটি ছিলো, তাদেরকে কোন অভিযানের নির্দেশ দিলে অভিযানের প্রস্তুতি নিতেই তারা অনেক সময় ব্যয় করে ফেলতো। অথচ খলীফা জানতেন যে, মুসলিম বাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো অস্বাভাবিক ক্ষীপ্রগতিতে অভিযান পরিচালনা করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের ধারণাতীত কম সময়ে দুশমনদের অপ্রস্তুত অবস্থায় মুসলিম বাহিনী হামলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতো। তখন খলীফা আব্দুল মালিকের প্রধান উজির ছিলেন রুহু বিন রাবাহ।

ইবনে রাবাহ। একদিন প্রধান উজিরের উদ্দেশ্যে বললো খলীফা। আমার সেনা বাহিনীর মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে একটি কার্যকর বাহিনীতে পরিণত করবে?

"একজন লোকের প্রতি আমি দৃষ্টি রাখছি আলীজা! বললেন উজির। তাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

"কে সেই লোক?"

"ওর নাম হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তায়েফের লড়াকু বংশের ছেলে সে। সে আমাদের সেনাবাহিনীতেই আছে কিন্তু পদস্থ কোন অফিসার নয় একজন সাধারণ সৈনিক। তবে সে অন্য দশজনের মতো নয়। দেখে শুনে মনে হয় ওর মধ্যে বুদ্ধিজ্ঞান আছে।"

"ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।" নির্দেশ দিলেন খলীফা।

"নির্দেশ পালন করা হলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলীফার সামনে দণ্ডায়মান। হাজ্জাজের চেহারা ছোরত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অঙ্গ-ভঙ্গিতেই খলীফা হাজ্জাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলেন।

"বিন ইউসুফ! তুমি যদি আমার একটি নির্দেশ বাস্তবায়ন করে দেখাতে পারো তাহলে তোমাকে আমি অনেক বড় পদে পদোন্নতি দেবো।"

"জি হুকুম, আমীরুল মুমেনীন!" বললো হাজ্জাজ।

"সেনাবাহিনীকে আমি এমনভাবে প্রস্তুত দেখতে চাই যে, আমি কোন দিকে রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে তারা আমার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটাবে। আমার যেন সেনাদের প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা করতে না হয়। আমি কোথাও যাওয়ার আগে আগে তোমাকে জানাবো।"

সেকথার দু'দিন পর খলীফা মালিক বিন মারওয়ান হাজ্জাজকে ডেকে বললেন, "অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বের হবো। অমুক অমুক ইউনিট আমার সফরসঙ্গী হবে।"

উজির রূহ বিন রাবাহও তার নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে আমার সহগামী হবে। বললেন খলীফা। এটা ছিলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্যে একটা পরীক্ষা। তখন সেনারা ছিলো শিবিরে। খলীফার নির্দেশ পেয়ে হাজ্জাজ সেনা শিবিরে গিয়ে বললেন, "আমীরুল মুমেনীনের বাহন সফরের জন্যে বের হচ্ছে, অমুক অমুক সেনা ইউনিটকে অশ্বারোহণ করে আমীরুল মুমেনীনের সফরসঙ্গী হতে হবে। হাজ্জাজ দেখলেন, উজির তার সেনা শিবিরে তখনও এসে পৌঁছেনি। দু'তিনজন কমান্ডারও শিবিরে ছিলো না। সৈন্যদের কেউ গল্পগুজবে লিপ্ত। আর কেউ খানা পাকানোর কাজে ব্যস্ত। হাজ্জাজের কথা তাদের কারো কানে গেছে বলে মনে হলো না। হাজ্জাজ চিৎকার করে শিবিরময় তাড়া করছিলেন।

"এসো হাজ্জাজ! হাজ্জাজকে তাচ্ছিল্যের স্বরে আহ্বান করলো এক সিপাহী। শুধু শুধু কেন গলা ফাটিয়ে চেচাচ্ছো? এসো খানা খাও!"

হাজ্জাজ হাতের কাছে পাওয়া একটি হান্টার উঠিয়ে খাবারে আহ্বানকারী সেনাকে পেটাতে শুরু করলেন। এরপর যে সৈনিককেই বসা দেখলেন, তাকেই এই বলে হান্টার দিয়ে কয়েক ঘা পিটুনি লাগালেন এবং বললেন, আমি আমীরুল মুমেনীনের নির্দেশ শোনাচ্ছি।"

কিন্তু এরপরও সৈন্যদের মধ্যে রওয়ানা হবার কোন তৎপরতা দেখতে না পেয়ে কয়েকটি ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। অগ্নি সংযোগকৃত ছাউনীগুলোর একটি ছিলো উজিরের নিজস্ব সেনা ইউনিটের। ওদের একজন দৌড়ে গিয়ে অগ্নিসংযোগের জন্যে উজিরের কাছে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো।

হাজ্জাজের তৎপরতায় উদ্দিষ্ট সেনা ইউনিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খলীফার সহগামী হলো। কিন্তু উজির তার ইউনিট নিয়ে আসার পরিবর্তে খলীফার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উজির অভিযোগের স্বরে বললেন—

"আমীরুল মুমেনীন! হাজ্জাজ আমার ছাউনীসহ কয়েকটি সেনা ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কয়েকজন সেনাকে পিটিয়েছে। আমীরুল মুমেনীন নিশ্চয়ই তাকে এমন কোন নির্দেশ দেননি!"

খলীফা হাজ্জাজকে ডেকে পাঠালেন। "একথা কি ঠিক যে তুমি কয়েকটি সেনা ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছো?" জিজ্ঞেস করলেন খলীফা।

"আমীরুল মুমেনীন! আমার মতো গোলামের কি করে এমন দুঃসাহস হবে যে সেনা ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দেবো? আমি কোন ছাউনীতে আগুন দেইনি।

"তুমি কি কয়েকজন সেনাকে প্রহার করোনি?"

"জি-না আমীরুল মুমেনীন। আমি কাউকে প্রহার করিনি।"

খলীফাকে জ্বলন্ত ছাউনী দেখানো হলো, সেই সাথে প্রহৃত সেনাদের শরীর খুলে তাদের আঘাত দেখানো হলো।

"ইবনে ইউসুফ! তুমিই যদি না করে থাক, তাহলে কে এসব ছাউনীতে আগুন দিলো, আর কে এদের প্রহার করলো?

"আগুন আপনি দিয়েছেন আমিরুল মুমেনীন! আপনিই সেনা ছাউনীতে আগুন দিয়েছেন। আর আপনিই সেনাদের প্রহার করেছেন।"

"চুপ করো! গর্জে উঠলেন খলীফা। কিসব প্রলাপ বকছো। তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?"

"আমীরুল মুমেনীন! যা কিছু ঘটেছে, আপনার নির্দেশে ঘটেছে।" বললেন হাজ্জাজ। আপনি সেনাবাহিনীকে গতিশীল তড়িৎকর্মা দেখতে চাচ্ছিলেন। এটাই ছিলো একমাত্র পন্থা যা দিয়ে আমি আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। তখন আমার মুখের নির্দেশ ছিলো আপনার নির্দেশ, আর হাতের হান্টার ছিলো আপনার হাতের হান্টার। ছাউনীতে ধরানো আগুনও আপনার দেয়া আগুন ছিলো, এসব দিয়েই আমি আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি।"

"আল্লাহর কসম! এমন লোকেরই আমার দরকার।" আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন খলীফা। এই ঘটনার পর খলীফা হাজ্জাজকে অপ্রত্যাশিত পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীতে উর্ধতন অফিসার নিযুক্ত করে ফেললেন। সেদিন থেকেই হাজ্জাজের জুলুম ও অত্যাচারের সূচনা হলো।

* * *

এমনটিই ছিলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও তার মেজাজ। কঠোরতা, নির্মমতা ও দুঃসাহসিকতার এক জীবন্ত মূর্তি ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সেই হাজ্জাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠতে শুরু করলো তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম। হাজ্জাজ ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে বিশেষ এক সাঁচে তাকে গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞ হলেন।

৭০৫ খৃস্টাব্দে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকে মসনদে আসীন হলেন। ওয়ালিদ তার পিতার মতো বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন না। ওয়ালিদের সৌভাগ্য এই ছিলো যে, তার পিতা প্রশাসনের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠা সকল ধরনের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। মালিক বিন মারওয়ান খারেজীদের ও গলাটিপে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া মালিকের সেনাবাহিনীতে কুতাইবা বিন মুসলিম, মূসা বিন নুসাইর, মুসলিম বিন আব্দুল মালিকের মতো বিজ্ঞ ও পারদর্শী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ওয়ালিদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো দক্ষ ও অত্যাচারী গভর্নর ছিলো তার সহায়ক ও পরামর্শদাতা।

শুরুতেই হাজ্জাজ খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের দুর্বলতাগুলো আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি ওয়ালিদের দুর্বলতার সুযোগে নিজের অবস্থান আরো

শক্তিশালী করণে মনোযোগী হলেন। বহুদিন পর একবার হাজ্জাজ জন্মভূমি তায়েফে এলেন। হাজ্জাজের আগমনের সংবাদ শুনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে হাজ্জাজের বাড়ি এলেন।

"আরে তুমি এলে কেন? আমি নিজেই তো তোমার সাথে দেখা করতে যাবো। ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন হাজ্জাজ। তুমি ভেবেছিলে যে, আমি তোমার খোঁজ না নিয়ে এবং আমার ভাইয়ের আমানতের খোঁজ না নিয়েই চলে যাবো? আমি তো ভাবছি, তোমাকে বলবো, ভাইয়ের রেখে যাওয়া আমানত এখন আমার হাতে দিয়ে দাও। মুহাম্মদ কোথায়? ওকে দেখার জন্যে আরো আগেই আমার আসা উচিত ছিলো।"

"আল্লাহ্ আমার ভাইজানকে তার রহমতের ছায়ায় রাখুন।" বললেন মুহাম্মদের মা। আমি মুহাম্মদকে একটি তাজী ঘোড়া কিনে দিয়েছি। আগে সে সাধারণ ঘোড়া দৌড়াতো। এখন এমন এক ঘোড়া দিয়েছি, দক্ষ অশ্বারোহীরাই কেবল এতে আরোহণ করতে পারে। কাসিম তো এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তাকে এখন যুদ্ধের অশ্বারোহণ রপ্ত করা দরকার। কে জানে ও নতুন ঘোড়া নিয়ে কোথায় চলে গেছে। আল্লাহ্ করুন, ও যাতে ঘোড়া বাগে রাখতে পারে, খুবই তেজী ঘোড়া।

"আল্লাহ্ যাতে ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে সাহায্য করেন। কারণ তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পুনরায় উঠে সওয়ার হওয়াও রপ্ত করতে হবে, বললেন হাজ্জাজ। অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠে নয় ঘোড়ার পায়ের আঘাত খেয়েই অশ্বারোহণ রপ্ত করে। শোন বোন! ও যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে আহত হয়ে আসে, তাহলে তাকে বুকে জড়িয়ে আহ্লাদ করো না। ওর শরীর থেকে যদি রক্ত ঝরতে দেখো, তাহলে আঁচল ছিড়ে পট্টি বেঁধে দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ো না। ওকে মায়া-মমতার জালে বেঁধে ফেলো না। ওর শরীরে প্রবাহিত রক্ত ওকে দেখতে দাও, সে যাতে বুঝতে পারে কাদের রক্ত সে বংশানুক্রমে শরীরে বহন করছে।

"তুমি এখন বাড়ি যাও বোন...। আমি এখনই তোমার ঘরে আসছি...।"

কিছুক্ষণ পর হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলেন। মুহাম্মদের মা হাজ্জাজের আসার খবর শুনে তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাজ্জাজ শুধু তার মৃত স্বামীর বড় ভাই নয়, প্রায় আধা

মুসলিম জাহানের প্রধান শাসন কর্তা। হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাড়িতে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় তার কানে ভেসে এলো ধাবমান অশ্বখুড়ের আওয়াজ। তিনি পিছনে তাকিয়ে দেখলেন এক অশ্বারোহী তীব্র বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে এদিকেই আসছে। তিনি অশ্বারোহীকে দেখার জন্যে দাঁড়ালেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মা হাজ্জাজের পাশেই দাঁড়ানো।

অশ্বারোহী হাজ্জাজের পাশ দিয়েই অশ্ব হাঁকিয়ে চলে গেলো। সে না গতি হ্রাস করলো, না হাজ্জাজের দিকে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করলো। অবস্থা দৃষ্টে হাজ্জাজের চেহারায় দেখা দিলো উষ্মা। স্পষ্টই তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিলো, এভাবে তার পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়াটা তার কাছে ধৃষ্টতা মনে হয়েছে। এতে হাজ্জাজ অপমানিতবোধ করছেন। কারণ হাজ্জাজ ছিলেন বনী ছাকিফ গোত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তি। তায়েফের লোকজন তাকে খুবই সম্মান করে।

"মনে হচ্ছে আমার কবিলার ছেলেরা আমাকে ভুলে গেছে।" মুহাম্মদ বিন কাসিমের মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন হাজ্জাজ। মনে হচ্ছে, এ ছেলেটি আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে আমার পাশ দিয়ে এভাবে ঘোড়া হাঁকিয়েছে। আচ্ছা ছোট বউ! তুমি কি চেনো ছেলেটি কে?"

"এতো আপনারই ছেলে।" বললেন মুহাম্মদের মা। এই.......তো মুহাম্মদ।

"না না। আমাদের মুহাম্মদ এতো বড় হবে কি করে? এই তো সেদিন আমি ওকে এতটুকু রেখে গেলাম।"

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘোড়া ঘুরিয়ে এপথেই ফিরে এলো। ঘোড়ার গতি দেখে মনে হচ্ছিলো আরোহী থামবে না। কিন্তু মা ও তারপাশে একজন প্রবীণকে দাঁড়ানো দেখে হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নীচে নেমে এলো। সে চেহারা দেখেই বুঝে নিলো। ইনিই তার সম্মানিত চাচা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সে দৌড়ে গিয়ে হাজ্জাজকে সালাম করলো।

হাজ্জাজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ঘোড়াটা বেশ ভালো। অবশ্য আরোহী এর চেয়েও ভালো।"

চাচার মুখে প্রশংসাবাণী শুনে মুহাম্মদ বললো, "ঘোড়ার গতি আপনাকে দেখানোর জন্যেই আমি আগে থামাইনি। আমি আগেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।"

আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি। এই বলে হাজ্জাজ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন।

"এখন তোমার ছেলে বড় হয়েছে বোন।" মুহাম্মদের মাকে বললেন হাজ্জাজ। একে আমি সাথে নিয়ে যাচ্ছি।"

"একথা শুনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মায়ের চোখে অশ্রু টলমল করতে লাগলো। তখনো মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স আঠারোতে পৌঁছেনি। তার কাছে ছেলে এখনো শিশু বৈ-কি। মায়ের চোখে শিশু হলেও মুহাম্মদ অন্য কিশোরদের চেয়ে স্বাস্থ্য চেহারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ষোল, সতের বছর বয়সের মুহাম্মদকে দেখলে মনে হয় পরিপূর্ণ একজন যুবক।

"প্রিয় বোন! জানি মুহাম্মদের বিরহ তোমার জন্যে খুবই কষ্টকর। কিন্তু বুক বেঁধে তোমাকে এ আমানত জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে। মুহাম্মদ তোমার ছেলে হলেও সে ইসলামের খেদমতের জন্যে যাচ্ছে, সে শুধু তোমার সেবায় রুদ্ধ থাকবে না, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সেবায় নিজেকে নিবেদন করবে। সে এমন এক পিতার সন্তান পিতার পথ ধরে জাতির সেবায় তাকে অবশ্যই নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পিতার অবস্থানকে ডিঙিয়ে তাকে আরো বহু দূর অগ্রসর হতে হবে, তাকে হতে হবে মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রোজ্জ্বল তারকা। যে তারকার আলোয় পথ দেখবে পথহারা মুসলিম জাতি।

"জী ভাইজান! আমিও এমন স্বপ্ন দেখি।" বললেন মুহাম্মদের রত্নগর্ভা মা। আমি সন্তান পেটে ধারণ করার সময় থেকে এ আশাই পোষণ করছি। নিজেকে এজন্য তৈরী করেই রেখেছি, একদিন আমার বুকের ধন আমার কোল থেকে আকাশের তারকার মতো দুনিয়া জুড়ে দ্যুতি ছড়াবে।"

"আমি ওকে বসরা নিয়ে যাচ্ছি।" বললেন হাজ্জাজ। সাধারণ সৈনিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ সে রপ্ত করেছে বটে; কিন্তু তাকে আরো উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তাকে এখন প্রশাসনিক কাজে যোগ দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধ কৌশলের বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিখতে হবে প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন। রণাঙ্গনে গিয়ে রপ্ত করতে হবে যুদ্ধের বাস্তব জ্ঞান। এজন্য ওকে আমি সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখায় ভর্তি করে দেবো।"

হাজ্জাজের প্রশাসনিক সদর দফতর ছিলো বসরায়। তার বাসস্থান ছিলো একটি রাজপ্রাসাদের মতো। হাজ্জাজের ঔরষজাত সন্তান বলতে ছিলো মাত্র

একটি মেয়ে। তার নাম লুবনা। হাজ্জাজ যখন নিজ গ্রাম তায়েফে বেড়াতে এলেন, তখন তার একমাত্র মেয়ে বসরায়। তখন সে পূর্ণ কিশোরী। এক রাতে লুবনার কক্ষের জানালায় বাইরে থেকে হাল্কা টোকা মারার শব্দ হলো। লুবনা বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনার জন্যে উৎকর্ণ ছিলো। তাই সামান্য আওয়াজেই বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালো সে। জানালা খুলে বাইরে উঁকি দিলো। জানালা দিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য দু'পা জানালায় রেখে নিজের শরীরের ভার বাইরে অপেক্ষমাণ দু'টি হাতের উপর ছেড়ে দিলো লুবনা। হাত দু'টো ওকে ধরে মাটিতে দাঁড় করিয়ে বুকে জড়িয়ে নিলো।

"এখান থেকে চলো বেরিয়ে যাই সুলায়মান! দরজা ভিতর থেকে আটকানো। জানালাটি বন্ধ করে দাও।" বললো লুবনা।

সুলায়মান জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে লুবনার হাত ধরে প্রাসাদোপম বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়লো।

খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ছোট ভাই সুলায়মান। আঠারো বছরের টগবগে যুবক সে। হাজ্জাজ তনয়া লুবনা সুলায়মানের হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে। লুবনার বয়সও ষোল, সতেরো। শৈশবে একই পাঠশালায় লেখাপড়া করেছে। বেড়ে উঠেছে পাশাপাশি। শৈশবের সোনা ঝড়া দিনগুলো তাদের কেটেছে একসাথে খেলাধুলা করে। কিছুটা বড় হওয়ার পর ওদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত কমে যায়। অবাধ মেলামেশার সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। দেখা সাক্ষাতে বদনাম হওয়ার আশংকা তেমন ছিলো না। শাহী খান্দানের রীতিটাই এমন ছিলো। শাহী খান্দানের লোকজনদের নৈতিকতা নিয়ে কথা বলার প্রতি সাধারণদের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিলো না। তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত অবাধ মেলামেশার বড় বাধা ছিলো সামাজিক ও পারিবারিক রীতি। তারচেয়েও লুবনার জন্যে বড় সমস্যা ছিলো পিতা হাজ্জাজ। কারণ স্বভাবের দিক থেকে হাজ্জাজ ঘরে বাইরে সর্বক্ষেত্রে কঠোর ও নির্মম ছিলেন তা লুবনাকেও প্রভাবিত করেছিলো।

"এখানে লুকিয়ে ছাপিয়ে আমরা আর কতো দিন লুকোচুরি খেলবো চাঁদ!" লুবনার উদ্দেশ্যে বললো সুলায়মান। আবেগের আতিশয্যে লুবনাকে চাঁদ বলে ডাকে সে। আমি ভাইকে বলবো যাতে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।"

"তোমার ভাই হয়তো এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন; কিন্তু আমি জানিনা, আমার আব্বা এ বিয়েতে সম্মতি দিবেন কি-না!" বললো লুবনা।

"কেন সে কি আমীরুল মুমেনীনের ভাইয়ের কাছেও তার মেয়ে তুলে দিতে রাজি হবে না?" সুলায়মান জিজ্ঞাসু স্বরে বললো।

"তুমি কি তাঁর স্বভাবের কথা জানো না? তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেন। খলীফার প্রভাবে তিনি কখনও প্রভাবিত হননি।"

"তিনি যদি তোমার বিয়ের জন্যে অপর কোন লোক ঠিক করেন তাহলে তুমি কি করবে?" লুবনাকে জিজ্ঞেস করলো সুলায়মান।

"তাঁর হুকুম বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেবো।"

"আমীরুল মুমেনীনের ভাইয়ের বউ না হতে পারার জন্যে তোমার কি কোন আফসোস হবে না? আমার বউ হয়ে তুমি যে গর্ব করতে পারবে, আর কারো বউ হলে কি তুমি এতোটা গর্বিতা হবে?"

"সুলায়মান! শৈশব থেকেই তুমি আর আমি এক সাথে বড় হয়েছি। ছোট্ট বেলা থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে, তখন তুমি আমীরের পুত্র ছিলে। শাহজাদা হিসেবে আমি তোমাকে ভালোবাসিনি। তোমাকে আমার ভালো লাগে। তুমি যদি কোন ভিখারীর ছেলেও হতে, তবুও তোমাকে আমার ভালো লাগতো। তখন হয়তো তুমি একথা ভাবতে না, আমি কার মেয়ে।"

"একথা আমি এখনও ভাবি না যে, আমি শাহজাদা আর তুমি গভর্নরের মেয়ে।"

"তা হয়তো মনে করো না, তবে নিশ্চয়ই একথা ভাবো যে তুমি আমীরুল মুমেনীনের ভাই। হয়তো এটাও মনে করতে পারো, তোমার এই মর্যাদা ও সম্মানের জন্য আমার গর্ব করা উচিত।"

"একথা শুনে রাখো সুলায়মান! আমি এমন পুরুষকে নিয়েই গর্ববোধ করবো, যার মধ্যে আমার প্রতি টান থাকবে, ভালোবাসা থাকবে। সে এমনটি কখনো ভাববে না, কেমন বাবার পুত্র সে, আর আমি কেমন পিতার মেয়ে।"

"আজ তুমি এভাবে কথা বলছো কেন চাঁদ!" বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে আফসোসের স্বরে বললো সুলায়মান, আজকের মতো এমন একটি আনন্দঘন রাতে তুমি এভাবে কথা বলছো কেন?"

"আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি না সুলায়মান! তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে এভাবে রাতের আঁধারে আমি তোমার সাথে ঘরের বাইরে

বের হতাম না। দেখো তুমি কি আন্দাজ করতে পারো আমি কী ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েছি! ভেতর থেকে দরজা খিল এঁটে আমি জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি...। আজ আমি তোমাকে একথা বলতে এসেছি যে, এখন আর আমি ছোট্ট নই, আর...সুলায়মান! এ মুহূর্তে আমার মনের অবস্থা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। যে কোন মুহূর্তে আমার কারো না কারো বউ হতে হবে। তুমি জানো আমাদের রীতিনীতি!"

"আমাদের রীতি তো এটাই যে, আমরা যদি কাউকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করে ফেলি। আর যে খলীফা হয় সে একাধিক বউ রাখে।"

"আমি এই রীতিনীতির কথা বলছি না।" বললো লুবনা। আমি মুসলমানদের সামরিক রীতিনীতির কথা বলছি। যারা রোম পারস্যের শক্তিশালী সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে ইসলামের সীমানা কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা দেখো। মুসলমানরা পরস্পর বিরোধ বিবাদে জড়িয়ে পড়েছে। কোন জায়গায় দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ, কোথাও অসন্তোষ, কোথাও ষড়যন্ত্র। এর ফলে পরাজিত রোমানদের তরবারী আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে। তুমি কি একথা জানো না, রোমানদের সাথে আমাদের যে শান্তিচুক্তি করতে হয়েছে, তাতে কি পরিমাণ অর্থ দিতে হয়েছে। খুবই মোটা অংকের টাকা দিয়ে আমাদের শান্তি খরিদ করতে হয়েছে। টাকার বিনিময়ে শান্তি চুক্তি করে আমরা একথাই প্রমাণ করেছি যে, দ্বীন ও মিল্লাতের হেফাযত ও দেশের সীমানা রক্ষার ক্ষমতা এখন আর আমাদের নেই। আমরা খুবই দুর্বল অক্ষম হয়ে গেছি।"

সুলায়মান লুবনার এসব কথায় অস্থির হয়ে বললো, আহা চাঁদ! তুমি এমন মনোরম রাত আর আবেগকে গলাটিপে মেরে ফেলছো। হায়! এমন চাঁদনী রাতে চাঁদের চেয়েও সুন্দর রাতটি আর আমার ভালোবাসার স্বপ্নগুলোকে নিরস, বিষাদময় কথাবার্তার বিবর্ণ চাদরে ঢেকে দিচ্ছো। তুমি কি বলতে চাচ্ছো, যেসব কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছো, এসব আমি মোটেও জানি না? তোমার কি একথা জানা নেই যে, আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর খেলাফতের মসনদে আমাকেই বসতে হবে?"

"আমি চলে যাচ্ছি...বসা থেকে উঠতে উঠতে বললো লুবনা। আমাকে এখন চলে যেতে হবে। মা যদি টের পেয়ে যায়...।"

"তিনি তো তার ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। বললো সুলায়মান। কি হয়ে গেলো তোমার? সুলায়মানও বসা থেকে উঠতে উঠতে বললো। এর আগে তুমি কখনও এমনটি করোনি।"

লুবনা দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো। সুলায়মানও ওর পিছু পিছু রওয়ানা হলো।

"কি ব্যাপার! তুমি কি আমার ভালোবাসাকে ভেঙে চুড়ে চলে যাচ্ছো?"

"না সুলায়মান! দাঁড়িয়ে বললো লুবনা। আমি তোমার ভালোবাসাকে অপমান করছি না। আমি বিয়ের কথা বলছি, আমাকে ভাবতে দাও সুলায়মান! আমাকে ভাবতে দাও। কথা বলতে বলতে জানালার কাছে গিয়ে জানালা খুলে ঘরে প্রবেশ করলো লুবনা।

কয়েক দিন পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তায়েফ থেকে বসরায় ফিরে এলেন। তার বাহন মহলে প্রবেশ করতেই লুবনা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ঘোড়ার গাড়ি থেকে হাজ্জাজ নেমে এলেই পিতাকে জড়িয়ে ধরলো লুবনা। পিতাও পরম আদরে আদুরে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। লুবনার চেহারা ছিলো ঘোড়ার গাড়ির দিকে। সে দেখলো, গাড়ি থেকে দীর্ঘদেহী একহারা গড়নের এক যুবক বেরিয়ে এলো। পৌরুষদীপ্ত, আকর্ষণীয় যুবকের চেহারা।

লুবনা একেবারে লেপ্টে ছিলো পিতার বুকের সাথে। যুবকের দিকে নজর পড়তেই তার বাঁধন শিথিল হয়ে গেলো। যুবকের প্রতি আটকে গেলো তার দৃষ্টি।

"সামনে এসো মুহাম্মদ!" নাম ধরে যুবককে আহ্বান করলেন হাজ্জাজ। লুবনাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার মেয়ে লুবনা। লুবনা! এ তোমার চাচাতো ভাই মুহাম্মদ। তুমি একে আর দেখোনি। এই আমার ভাইয়ের একমাত্র সন্তান। সে আমাদের সাথে কিছুদিন থাকবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম, চাচা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মহলে দিন কাটাতে লাগলো। লুবনা খুব গভীরভাবে মুহাম্মদের চলাফেরা দেখতো, মাঝেমধ্যে টুকিটাকি কথাও বলতো। চাচাতো ভাইয়ের সাথে টুকটাক কথা বললেও লুবনা স্বভাবজাত লজ্জা ও পর্দা কখনো লঙ্ঘন করেনি।

এক বিকেলে মহলের বাগানে পায়চারী করছিলো মুহাম্মদ। বাগানের একটি জায়গা খুবই ভালো লাগলো তার কাছে। পাশাপাশি দু'টি ঘন গাছের ঘন ডালপালায় ঝোঁপের মতো হয়ে উঠেছে। গাছ দু'টি ছিলো ফুলধারী। বসন্তের

মৌসুম থাকায় ঘন ঝোঁপ সদৃশ্য গাছের ডালপালাগুলো ফুলে ফুলে অপরূপ সাজে সজ্জিত। ফুলের সমারোহে ছাউনীর মতো গাছের ঝোঁপের নীচে মুগ্ধ মনে বসে পড়লো মুহাম্মদ। দৃশ্যটি তার মন কেড়ে নিলো।

দূর থেকে লুবনা মুহাম্মদ এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলো। ফুলের ঝোঁপের মধ্যে বসতে দেখে লুবনাও পায়চারী করতে করতে মুহাম্মদের কাছে চলে এলো।

লুবনা কাছে এসে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবতা ভেঙে বললো, এখানে একাকী বসে বসে কি ভাবছো মুহাম্মদ ভাইয়া!

"ফুলে ফুলে সাজানো জায়গাটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এজন্য একটু বসলাম।"

"আমিও কি তোমার পাশে বসবো?"

"চমকে উঠলো মুহাম্মদ। বললো, না না!"

"কেন?"

"এটা ভালো দেখাবে না। কেউ দেখলে কিংবা চাচার চোখে পড়লে ব্যাপারটি ভালো দেখাবে না। আমি ভাই একাকী তোমার পাশে বসে থাকতে পারবো না।"

"চুপি চুপি আমিও তোমার সাথে বসতে চাই না মুহাম্মদ ভাইয়া!" কথাটি বলেই চিন্তায় হারিয়ে গেলো লুবনা।

"পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো লুবনা! সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় কোন যুবক যুবতী নিরিবিলি জায়গায় পাশপাশি অবস্থান করা মোটেও ঠিক নয়...। তুমিও কি আমার মতো হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এসেছো, নাকি আমাকে দেখে ইচ্ছা করেই এসেছো?"

"তোমাকে তো আমি প্রতিদিনই দেখি। একাকী হাঁটতে ভয় ভয় লাগছিলো এজন্য...। আচ্ছা, মুহাম্মদ ভাইয়া! একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। আমার এখানে আসায় তুমি কি বিরক্ত হয়েছো? তোমার কাছে কি আমার আসাটা খুবই বিরক্তি সৃষ্টি করেছে? আমাকে কি তোমার কাছে খারাপ লাগে?"

"শোন লুবনা! তোমার এখানে আসা অবশ্যই আমার কাছে ভালো লাগেনি। তবে এর সাথে তোমাকে খারাপ লাগার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তোমার চোখ ও তোমার মুচকি হাসি দেখেই তোমার ভিতরের অবস্থা বুঝতে পেরেছি। আমার মধ্যেও যে এমনটি নেই তা বলবো না। ঝোঁপের ভিতরে বসা থেকে উঠে বেরিয়ে

আসতে আসতে মুহাম্মদ বললো, এসো, আমরা মহলের দিকে এগুতে থাকি। যাতে কেউ দেখলেও এটা ভাবতে না পারে যে, আমরা নিরিবিলি বসে ছিলাম।"

"মুহাম্মদ ভাইয়া! তুমি এখন কি করবে?" পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললো লুবনা।

"আমি আমার ইচ্ছা ও স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে চাই। যেসব প্রশিক্ষণ আমি নিয়েছি এসব কলা-কৌশল আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না।"

"তুমি কি সেনাপতি হতে চাও?"

"আমি কোন পদ পদবীর প্রত্যাশা করি না। আমার মাথায় এখন একটাই চিন্তা, চোখের সামনে একটাই পথ, আমি ওই পথ ধরে চলতে চাই, যেপথ জীবন ও রক্তের বিনিময়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ তৈরী করে গেছেন। একটি পথ তৈরী হয়ে গেছে সে পথে হাজার কোটি মানুষ চলতে পারে। আর যারাই সে পথ অতিক্রম করে তারা কিছু না কিছু পদচিহ্ন তো রেখেই যায়। সে পথের গমনাগমনকারীরা পূর্ববর্তীদের পদচিহ্ন মুছে দিয়ে নতুন পদচিহ্ন তৈরী করে কিন্তু এমন কিছু চিহ্ন থাকে, যেগুলো কখনও মুছে ফেলা যায় না। পথভোলা পথিকরা সেই অক্ষুণ্ন পদচিহ্ন দেখে দেখে তাদের মনযিলে পৌঁছাতে পারে। আমিও সেইসব বীরপুরুষদের অমুছনীয় পদচিহ্ন দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।"

" কারা সেইসব কৃতিপুরুষ?" জিজ্ঞেস করলো লুবনা।

"খালিদ বিন ওয়ালিদ আমার সেই স্বপ্নপুরুষ।" জবাব দিলো মুহাম্মদ বিন কাসিম। বিন ওয়াক্কাস, আবু বকর, ওমরও আমার অনুস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। আমি এসব মহাপুরুষদের মিশনকে আরো এগিয়ে নিতে চাই। আমি মুসলিম শাসনের সীমানা আরো দূর দারাজ পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চাই। আমি শুধু শুধু সেনাপতির তকমা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চাই না, আমি চাই আল্লাহর সৈনিক হয়ে জীবন কাটাতে।"

মুহাম্মদের কথা শুনতে শুনতে তার দৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী সংকল্প এবং পৌরুষদীপ্ত মন-মানসিকতার প্রভাবে নিজেকে স্বপ্নময় পুরুষের বিশালতায় হারিয়ে দিলো লুবনা। মুহাম্মদ বিন কাসিম এভাবে কথা বলছিলো, মনে হয় যেন তার কথাগুলো কোন তরুণের স্বপ্ন নয় অতি বাস্তব। সে কোন কল্পনা বিলাসে নিজেকে আপ্লুত করছে না, ইচ্ছা ও সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার মতো দৃঢ়চিত্ত ও প্রত্যয়ী সে।

"লুবনা! আমি আমার মায়ের দেখা স্বপ্নের বাস্তব প্রতীক। কিন্তু সেই স্বপ্ন এখনো বাস্তবতা পায়নি। আমাকে অবশ্যই সেই তারকা হতে হবে যে তারকার স্বপ্ন আম্মু দেখেছিলেন।"

দু'জন কথা বলতে বলতে মহলের প্রবেশ পথে এসে গেলে মুহাম্মদ নীরব হয়ে গেলো এবং লুবনার উদ্দেশ্যে বললো, "লুবনা! এখন তুমি তোমার পথে যাও। আমি একাকী মহলে প্রবেশ করবো।"

মুহাম্মদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলো লুবনা। তার চোখে চোখ রেখে বললো, "মুহাম্মদ ভাইয়া! জানি না, হয়তো সেই শৈশব থেকে তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি। আবেগাপ্লুত ধরা গলায় বললো লুবনা। বললো, আমার মন চাচ্ছে তোমার সফরসঙ্গী হতে...। তুমি কি আমাকে সঙ্গে নেবে?"

"আল্লাহর যদি মর্জি থাকে তাতে আমার আপত্তি নেই।" একথা বলেই দ্রুত পায়ে মহলের পথে পা বাড়ালো মুহাম্মদ।

* * *

বসন্তকাল। এ সময়ে দারুল খেলাফত তথা রাজধানীতে সেনাবাহিনীর বাৎসরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কুশলী যোদ্ধারা নানা ধরনের নৈপুণ্য শৈল্পিক ও নান্দনিক কর্ম কৌশল প্রদর্শন করে। সামরিক ও বেসামরিক লোকজন এ কুচকাওয়াজ দেখার জন্যে উদগ্রীব থাকে। অগণিত দর্শকের সমারোহে মুখরিত হয় ময়দান। খলীফা নিজে উপস্থিত থেকে কৃতী কুশলীবদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন। খেলাধুলার মধ্যে ঘোড় দৌড়, বর্শা, তরবারী তীর ও মল্লযুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সময় প্রশাসন নানা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার কারণে বসন্তকালীন মহড়া অনুষ্ঠানের সুযোগ তেমন হয়নি। তিনি কঠোরভাবে সব ধরনের গোলযোগ দমন করায় তার ছেলে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সময় কোন গোলযোগ ছিলো না। এজন্য খলীফা প্রতি বছরের বসন্তে রাজধানীতে বিশাল আকারে সামরিক মহড়ার আয়োজন করতেন। এ উৎসবে এতো কঠিন প্রতিযোগিতা হতো যে সামরিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগীর হাতে যদি কেউ মারাও যেতো তবুও এতে কোন শাস্তি হতো না।

একদিন খলীফার বিশেষ দূত বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পয়গাম নিয়ে গেলো, বাৎসরিক সামরিক উৎসবে যোগদান করার জন্যে তিনি যেন এক্ষুণি

খলীফার সাথে দেখা করেন। তা ছাড়াও তার সাথে খলীফার জরুরী পরামর্শ রয়েছে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলীফার পয়গামে খুশী হলেন। খুশীর প্রধান কারণ তিনি ভাতিজা মুহাম্মদকে খলীফার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। খলীফার পয়গাম এ কাজটির জন্য সুন্দর সুযোগ বয়ে আনলো। বাৎসরিক সামরিক উৎসবটি তার জন্যে আরো সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি সামরিক প্রতিযোগিতায় মুহাম্মদকে অংশগ্রহণ করিয়ে খলীফা ও সেনাপতিদের এ বিষয়টি দেখিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, এতটুকু বয়সে তার ভাতিজা সমরবিদ্যায় কি পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনি চাচ্ছিলেন পরিচয়ের শুরুতেই সবার চোখে মুহাম্মদকে তার কৃতিত্বের মাধ্যমে একটা সম্মানজনক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

তিনি তখনই মুহাম্মদকে ডেকে বললেন, মুহাম্মদ! তুমি তরবারী চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড় দৌড়, ও মল্লযুদ্ধে কতটুকু পারদর্শী আমি জানি না। বসন্ত উৎসব একটা সুযোগ। আমি এ সুযোগটাকে কাজে লাগাতে তোমাকে সামরিক প্রতিযোগিতায় সম্পৃক্ত করতে চাই। আশা করি তুমি আমাকে লজ্জিত করবে না।"

"হার জিত আল্লাহর হাতে চাচাজান! আমি বড়াই করতে চাই না। তবে প্রতিযোগিতায় অবশ্যই অবতীর্ণ হবো।"

"তাহলে চলো। তুমি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।"

"কপাটের ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে লুবনা আবেদনের স্বরে বললো, এবারের প্রতিযোগিতায় আমিও যাবো আব্বু! আমাকে আপনি একবারও সামরিক প্রতিযোগিতা দেখাতে নিয়ে যাননি!"

একমাত্র কন্যার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না হাজ্জাজ। লুবনাকেও নিয়ে যেতে সম্মত হলেন।

বসরা থেকে রওয়ানা হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ ও লুবনাকে নিয়ে দারুল খেলাফত রাজধানীতে পৌঁছলেন। তিনি খলীফার সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"আল্লাহর কসম ইবনে কাসিম! তোমার বাবার অবদানকে আমাদের পরিবার কখনো বিস্মিত হবে না।" বললেন খলীফা ওয়ালিদ বিন মালিক। তিনি

আমাদের খেলাফতের মর্যাদা রক্ষায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি যেমন ছিলেন বীর বাহাদুর, তেমনি ছিলেন বিশ্বস্ত। আশা করি তুমি তোমার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলবে। ইবনে ইউসুফ! হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, আপনি কি আপনার ভাতিজাকে কারো মোকাবেলায় প্রতিযোগিতা করতে বলবেন?"

"এজন্যই তো ওকে সাথে করে এখানে নিয়ে এসেছি আমীরুল মুমেনীন! আমিও দেখতে চাই সে কতটুকু কাজের হয়েছে!"

"সে যদি তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমরা তাকে তার পিতার পদেই বরণ করবো।" বললেন খলীফা।

"হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন প্রধান প্রশাসক। তার পদমর্যাদা বর্তমানের গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী। হাজ্জাজকে বিশেষ সম্মানে শাহী মহলেই থাকার ব্যবস্থা করলেন খলীফা। মুহাম্মদ বিন কাসিমও চাচার সাথেই শাহী মেহমান হিসেবে থাকার সুযোগ পেলো। লুবনাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো অন্দর মহলে বেগমদের কাছে।

হাজ্জাজ যে মহলে অবস্থান করছিলেন, সেই মহলেই বসবাস করতো খলীফা ওয়ালিদের ছোট ভাই সুলায়মান। লুবনার শাহী মহলে আসার খবর শুনে সে ভীষণ খুশী হলো। সে তার একান্ত সেবিকাকে বললো, লুবনাকে ডেকে নিয়ে এসো। সুলায়মানের একান্ত সেবিকা এসে তাকে জানালো, লুবনা হাজ্জাজের ভাতিজা তার চাচাতো ভাইয়ের কক্ষে কথা বলছেন।"

"সে যেখানেই থাকুক তাকে নিয়ে এসো। তাকে গিয়ে বলো, সুলায়মান আপনাকে স্মরণ করছেন।"

সেবিকা লুবনার কাছ থেকে ফিরে এসে জানালো, সে এখন আসতে পারবে না।"

"কোথায় সে? কি করছে?" সেবিকাকে জিজ্ঞেস করলো সুলায়মান।

"চীফ গভর্নরের ভাতিজার পাশে বসে হেসে হেসে কি যেন গল্প করছে।"

"হাজ্জাজের ভাতিজাও কি তোমার বলার পর কোন কিছু বলেছে?"

"হ্যাঁ, সে বলেছে, পুনর্বার যেন তার কক্ষে আমি না যাই।" সুলায়মানকে জানালো সেবিকা।

একথা শুনে রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে লাগলো সুলায়মান।

* * *

সেদিন বিকেলের ঘটনা। বিকেল বেলায় শাহী মহলের বাগানে পায়চারী করতে করতে লুবনা একটি ঘন ফুল বাগানে চলে গেলো। বাহারী নানা ফুলের সমারোহে বাগানের এ অংশটিকে করে তুলেছে মোহনীয়। তাঁকে বাগানে পায়চারী করতে দেখে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে পিছন দিক থেকে এসে লুবনার দু'চোখ চেপে ধরলো সুলায়মান।

লুবনা হাতের উপর হাত বুলিয়ে হেসে বললো, "হয়েছে আমি ঠিকই চিনে ফেলেছি, মুহাম্মদ ভাইয়া!"

একথা শুনে শিথিল হয়ে এলো হাত। দ্রুত সরে গেলো দূরে। লুবনা চকিতে পিছন ফিরে তাকালো।

বললো, "ওহ্! সুলায়মান! আমি আশা করেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আসবে!"

"না, তুমি তো আশা করেছিলে বিন কাসিম আসবে! কিছুটা ক্রোধমাখা স্বরে বললো সুলায়মান। এই জন্যই তো তোমার মুখ থেকে ওর নামই বেরিয়েছে।

"হু, ওর নাম নেয়া কি অপরাধ?"

"তা জানি না, তবে কারো সাথে প্রতারণা করা নিশ্চয়ই অপরাধ! আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখো না লুবনা! বিন কাসিম ও আমার ব্যাপারে তোমার অবশ্যই চূড়ান্ত ফায়সালা করা উচিত। ফায়সালা ভেবে চিন্তে করা উচিত। কারণ আমি আগামী দিনের খলীফা আর বিন কাসিম হবে আমার অধীনস্ত একজন কর্মচারী মাত্র। আমি ইচ্ছা করলে তাকে সেনাপতি থেকে সিপাই বানাতে পারবো, ইচ্ছা করলে ভিখারীতে পরিণত করতে পারবো।...আচ্ছা...তুমি ওর মধ্যে এমন কি দেখেছো, যা আমার মধ্যে দেখতে পাওনি?"

"ওর ভালোবাসায় কোন খাদ নেই।" বললো লুবনা। আমি ওকে সেনাপতি অবস্থায় যেমন ভালোবাসবো, সিপাহী হলেও তেমনি ভালোবাসবো। তাতে আমার ভালোবাসায় কোন ভাটা পড়বে না। তুমি যদি তাকে ভিখারীতে পরিণত করো, তবুও কারো কাছে ওকে হাত পাততে দেবো না। আমার ভালোবাসা পদমর্যাদা ও ক্ষমতার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।"

লুবনা নাগাল থেকে চলে আসার জন্যে এগুতে শুরু করলে সুলায়মান আগ বেড়ে ওকে ধরে ফেললো এবং লুবনার কাছে প্রেম ভিক্ষা করতে শুরু করলো। শৈশবের স্মৃতি মন্থন করে অতীতের ভালো লাগা, এক সাথে খেলাধুলার কথা

স্মরণ করাতে লাগলো। লুবনা তার কাছ থেকে বারবার চলে আসতে চাচ্ছে আর ফিরে ফিরে সুলায়মান তার হাত ধরে আটকে রাখতে চাচ্ছে।

"সুলায়মান! ভরাট কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো দূর থেকে।"

চকিতে সুলায়মান ও লুবনা তাকিয়ে দেখতে পেলো ফুল গাছের আড়ালে হাজ্জাজ দাঁড়ানো।

"ভালো হয়েছে যে আমি নিজের চোখে দেখতে পেলাম। আরো ভালো হয়েছে, তুমি কি বলেছো, আর আমার মেয়ে কি বলেছে, তা আমি নিজের কানে শুনেছি।"

প্রিয় সুলায়মান! তোমার ধৃষ্টতাকে আমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মনে করছি না। কারণ যৌবন আসলে একটা পাগলামী। কিন্তু তোমাকে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমার হাতে আমার মেয়েকে তুলে দিতে পারি না। এ ব্যাপারে কি করবো, সেই সিদ্ধান্ত আমি নেবো, আমার মেয়ের কোন সিদ্ধান্ত এতে থাকবে না। তুমি জানো, তোমার সমবয়স্ক আমার একটি ভাতিজা আছে। এ আমার ভাইয়ের একমাত্র ছেলে...। আমার মেয়ে তারই বউ হবে।"

মাথা নীচু করে অধোবদনে দাঁড়িয়ে ছিলো লুবনা। হাজ্জাজ লুবনার হাত ধরে সাথে নিয়ে বাগান থেকে চলে এলেন। সুলায়মান ঠাঁয় দাঁড়িয়ে পিতা-কন্যার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর চেহারা তখন ক্ষোভে অপমানে বিবর্ণ হয়ে উঠলো, মাথায় যেন শুরু হলো অগ্নপাত। টগবগিয়ে ফুটতে থাকলো শরীরে রক্তকণিকা। সে ভেবে পাচ্ছিলো না হাজ্জাজ ও মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কাবু করে কিভাবে এই মেয়েকে কব্জা করবে!"

* * *

দু'দিন পরের ঘটনা। সারা আরবের মানুষ যেনো জমা হয়েছে সামরিক উৎসবে। বহু দূর দারাজ থেকে লোকজন এসে জমা হয়েছে। ময়দানে থাকার জন্যে তাঁবু ফেলেছে দলে দলে। যেদিকেই চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। সারা ময়দান ভরে গেছে তাঁবু, ঘোড়া আর উটে।

শহরের রাস্তা দিয়ে লোকের ভীড়ে পথ চলা দায়। বিশাল ময়দান। একদিক থেকে তাকালে অপর দিকে সীমানা খুঁটি দেখা যায় না। ময়দানের মাঝখানে বৃত্তাকারে চিহ্ন দেয়া। এ বৃত্তের বাইরে আগত লোকজন অবস্থান নিয়েছে। বৃত্তের এক পাশে সুদৃশ্য প্যান্ডেল। নানা রংয়ের জড়িদার ঝালর ও বাহারী শামিয়ানা

লটকানো এক মঞ্চ। মঞ্চের মাঝখানে শাহী সিংহাসন। এর পাশে দামী দামী কুরছি। এসব কুরছিতে বসবে খলীফার বেগম সাহেবাগণ। তাদের ডানে বামে উজির, সেনাপতি ও খেলাফতের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। সেই সাথে বিভিন্ন কবিলা ও গোত্রের সর্দার ও গোত্রপতিদের বসার ব্যবস্থা।

সবার সামনে খলীফা ওয়ালিদ বিন মালিকের সিংহাসন। তার একপাশে প্রধান গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বসার আসন। হাজ্জাজের সাথেই তার একমাত্র কন্যা লুবনা উপবিষ্ট।

অগণিত দর্শক ময়দানের চারপাশে। কেউ বসা, কেউ দাঁড়ানো, কেউ নিজের বাহনের পিঠে আরোহী।

খলীফার ইঙ্গিতে প্রতিক্ষার প্রহর শেষে শুরু হলো সামরিক উৎসব। বাৎসরিক প্রতিযোগিতা। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের প্রতিযোগিরা পালাক্রমে ময়দানে প্রবেশ করে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে অতিক্রম করছে। ঘোড় দৌড়, তরবারী চালনা, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা একের পর এক ঘটে চলছে। তরবারী প্রতিযোগিদের এক হাতে ছিলো চামড়ার তৈরী ঢাল, অন্য হাতে তলোয়ার। এই খেলায় বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী মারাত্মকভাবে আহত হলো। সবচেয়ে দর্শনীয় ছিলো অশ্বারোহী যোদ্ধাদের প্রতিযোগিতা। প্রথমে অশ্বচালনায় বিভিন্ন নৈপুণ্য প্রদর্শনের পর আরোহীদের মধ্যে তরবারী চালনার প্রতিযোগিতা হলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম না ছিলো প্যান্ডেলের অতিথিদের মধ্যে, না ছিলো সাধারণ দর্শক সারিতে। সুলায়মানকেও কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। দর্শনার্থীরা প্রতিযোগিদের উৎসাহিত করতে আনন্দ ধ্বনিতে ময়দান মুখরিত করে রাখছিলো। শোরগোল এতোটাই তীব্র ছিলো যে, কারো কথাই শোনা যাচ্ছিলো না। ময়দানের ধাবমান ঘোড়া ও উটগুলো এতো ধুলোবালি উড়াচ্ছিলো যে, ধুলোর অন্ধকারেই ওরা হারিয়ে যাচ্ছিলো।

"এখন ময়দান খালি করে দাও, কেউ মাঠে থাকবে না।" হঠাৎ শাহী ঘোষকের কণ্ঠে শোনা গেলো জলদগম্ভীর নির্দেশ।

কয়েকবার এ ঘোষণা দেয়ার পর মাঠ সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলো। উড়ন্ত ধুলোবালিও হ্রাস পেতে পেতে মাঠ পরিষ্কার হয়ে গেলো। হঠাৎ মাঠের এক কোণ থেকে একটি তাজি ঘোড়া মাঠে প্রবেশ করলো। দেখলেই বোঝা যায় এটি

সেনাবাহিনীর শাহী নিরাপত্তা ইউনিটের বিশেষ ঘোড়া। গলার নীচ থেকে লেজ পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠ মখমল কাপড়ে আবৃত। সুদৃশ্য ঝালর পেটের দিকে ঝুলছে। সোনালী বর্ণের ঝিকমিকে দু'টি পাদানী ঝুলছে অশ্বপিঠের দুপাশে।

এ অশ্বপৃষ্ঠে বসা এক সুদর্শন যুবক। তার মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, হাতে বর্শা। কিন্তু বর্শার মাথা চামড়া দিয়ে আবৃত। তার কোমরে ঝুলন্ত তরবারী। মাঠে প্রবেশ করে অশ্বারোহী একটা চক্কর দিলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো আরোহী শাহী খান্দানের বৈ-কি?

আরোহী হাঁক দিলো—আছে কি তায়েফের কোন আরোহী যে আমার মোকাবেলা করার সাহস রাখে? আরোহী গলা ফাটিয়ে অজ্ঞাত প্রতিপক্ষের প্রতি হুমকি ছুড়ে দিলো।

এ অশ্বারোহী আর কেউ নয়, খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ভাই শাহজাদা সুলায়মান। সে বিশেষ করে তায়েফের নাম উচ্চারণ করার দ্বারা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়ার আহ্বান করছিলো।

শাহজাদার এই হুমকিমূলক আহ্বানে ময়দান জুড়ে নেমে এলো নীরবতা। ভবিতব্য দেখার জন্যে সকল দর্শনার্থী উৎকর্ণ ও অপলক নেত্রে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এমন সময় মাঠের এক কোণ থেকে প্রবেশ করলো এক অশ্বারোহী। এটিও সেনাবাহিনীর চৌকস সওয়ারী। এর আরোহীও যুবক। হাতে বর্শা আর কোমরে ঝুলন্ত তরবারী।

"ইবনে আব্দুল মালিক! তায়েফের কাসিম বিন ইউসুফের ছেলে তোমার মোকাবেলা করতে এসেছে।"

শাহজাদার হুমকির জবাবে পাল্টা হুমকি ছেড়ে দিলো যুবক। সারা ময়দান জুড়ে তখন পিনপতন নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর মাঠের দু'প্রান্ত থেকে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ শানিয়ে ঘোড়া হাঁকালো। উভয়েই পরস্পরের প্রতি বর্শা উদ্যত করলো। উভয়েই চাচ্ছিলো বর্শার আঘাতে প্রতিপক্ষকে অশ্বপৃষ্ট থেকে ফেলে দিতে। মুখোমুখি এসে সুলায়মান বর্শা দিয়ে বিন কাসিমকে আঘাত করলো। বিন কাসিম আঘাত সামলে নিয়ে দূরে গিয়ে আবার মুখোমুখি উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকালো। দর্শনার্থীদের কারো চোখের পলক পড়ছে না। সবাই খলীফার আপন ভাই সুলায়মানকে চিনতো, প্রতিপক্ষ

যুবককে অধিকাংশ লোক চিনতে না পারলেও এ মোকাবেলা যে বিশেষ তাৎপর্যবহ তা বুঝতে কারো বাকি রইলো না।

এক পর্যায়ে পাদানীতে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম সুলায়মানের দিকে বর্শার আঘাত হানলো। সুলায়মান নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলো বটে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না। বর্শা তার পিঠে আঘাত হানলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। বহু চেষ্টা করেও ঘোড়ার পিঠে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেই লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়লো। বর্শা পিঠে আঘাত হানলেও বিদ্ধ হলো না। কারণ বর্শার মুখে চামড়ার খোল ছিলো।

অভিজাত যুবকদ্বয়ের এ যুদ্ধ এতে শেষ হয়নি। সুলায়মান ঘোড়া থেকে নেমে পড়ায় বিন কাসিমও লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো এবং উভয়েই কোষমুক্ত করলো তরবারী। এবার পরস্পরের মধ্যে শুরু হলো অসিযুদ্ধ। শুরু হলো যুবকদ্বয়ের প্রচণ্ড মোকাবেলা। তরবারীর ঝলকানি ও আঘাতের শব্দে শব্দে সারা ময়দানে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। উভয়েই সমানে সমান। আঘাতের তীব্রতা দেখে দর্শকদের মনে হচ্ছিলো হারজিত নয় একে অপরকে মৃত্যুঘাটে পৌঁছে না দিয়ে এদের কেউ ক্ষান্ত হবে না। সুলায়মান বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে বললো, "বিন কাসিম! পরাজয় মেনে নাও। নয়তো তুমি যদি পড়ে যাও, অথবা তোমার তরবারী যদি পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমি তোমার বুকে তলোয়ার বিদ্ধ করবো।"

সুলায়মান ছিলো আবেগ তাড়িত। সে লুবনাকে পাওয়ার জন্যে খেলাচ্ছলে বিন কাসিমকে হত্যা করতেই উদ্যত ছিলো। সুলায়মানের হুমকিতে মুহাম্মদ বিন কাসিম জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করলো না।

হঠাৎ মুহাম্মদ বিন কাসিম সুলায়মানের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর করে তুললো। সুলায়মান তখন প্রতিঘাতের বিপরীতে আঘাত সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সুলায়মানের বেকাবু অবস্থা। মুহাম্মদ বিন কাসিম সুলায়মানকে প্রতিঘাত করার কোন সুযোগই দিচ্ছিলো না। এক পর্যায়ে এমন এক শক্ত আঘাত হানলো বিন কাসিম সুলায়মান আঘাত ফেরাতে সক্ষম হলো বটে; কিন্তু তরবারী তার হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লো। সে তরবারীর দিকে দৌড় দিলো বটে কিন্তু বিন কাসিম তাকে আর সেই সুযোগ দিলো না।

সুলায়মান তখন খালি হাত। বিন কাসিম দু'টি আঘাত করতেই ও পিছাতে পিছাতে পড়ে গেলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম তার একটি পা বুকের উপর রেখে তরবারী সুলায়মানের ঘাড়ে চেপে ধরলো।

মঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন হাজ্জাজ—"মুহাম্মদ তরবারী উঠিয়ে নাও।"

"ঠিক আছে আমি তোমাকে জীবন ভিক্ষা দিলাম।" দৃঢ় কণ্ঠে বললো বিন কাসিম। বনী ছাকিফের কসম করে বলছি-জীবনে আর কোনদিন তুমি তায়েফবাসীদের আত্মসম্মানে আঘাত করবে না।"

"আমি জীবিত থাকলে তোর মতো হতভাগ্য আর কেউ দুনিয়াতে হবে না।" যমীন থেকে উঠতে উঠতে বললো সুলায়মান।

সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের এ কথাগুলো কোন পরাজিতের আস্ফালন ছিলো না। এ কথাগুলো ছিলো তার জীবনমরণ প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞাই শেষ পর্যন্ত ভারতের বিজয় ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিলো।

* * *

৭০০ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৮১ হিজরী সন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স তখন মাত্র সতের বছর। সিন্ধু অঞ্চলে দাহির নামের এক কট্টর হিন্দু রাজা মসনদে আসীন হলো। তখন সিন্ধু অববাহিকা ছিলো দু'টি রাজ্যে বিভক্ত। এক অংশের রাজধানী ছিলো আরুঢ় কেউ বলতো আলোড়। আর অপর অংশের রাজধানী ছিলো ব্রাহ্মণাবাদ। ব্রাহ্মণাবাদের রাজার নামই ছিলো রাজ। ক্ষমতা দখলের এক বছরের মাথায় সে মারা গেলো। রাজের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণাবাদের মসনদ অপর অংশের রাজা দাহিরের একজ্ঞাতি ভাই দখল করে নেয়। এতে রাজা দাহির খুব খুশী হয় এই ভেবে যে, তারই এক জ্ঞাতি ভাই সিন্ধু অঞ্চলের অপর অংশের ক্ষমতায় আসীন হয়েছে।

রাজা দাহির মসনদ দখল করার তিনচার বছর পরের ঘটনা। রাজা দাহিরের রাণী মায়ারাণী হরিণ শিকার করতে গেলো। তখন সিন্ধু অববাহিকা যেমন ছিলো ঘন, জঙ্গলাপূর্ণ; তদ্রূপ জংলী পশু পাখিতে ছিলো ভরা। তখনকার রাজা-রাণীদের হরিণ শিকার ছিলো একটি আভিজাত্যের প্রতীক। ছুটন্ত হরিণের পিছে তাজি ঘোড়া হাঁকিয়ে বিষাক্ত তীর ছুড়ে হরিণকে ঘায়েল করা ছিলো শাসকদের একটি অন্যতম খেলা। এ কাজে বেশীর ভাগ পুরুষরা অংশ নিলেও কোন কোন রাজ বংশের সাহসী মেয়েরাও রীতিমতো বন্যপ্রাণী শিকার করতো।

তাদের শিকার কাজে সহযোগিতা করতো অনুগত ভৃত্য ও দেহরক্ষী সৈন্যসান্ত্রী।

মাত্র এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে রাণীর। বয়স ঊনিশ কিংবা বিশের বেশী নয়। মায়ারাণী ছিলো খুবই সুন্দরী, সেই সাথে শিকার প্রেমী। বংশগতভাবে মায়ারাণী রাজবংশের মেয়ে হওয়ায় অশ্বারোহণ ও তীর নিক্ষেপে পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। সেদিন সে দু'টি ঘোড়া ও দু'চাকার রথ নিয়ে শিকার করতে বের হলো। রথ চালক ছিলো শাহী নিরাপত্তারক্ষীদের রথ চালক। সে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে বহনকারী ঘোড়ার গাড়ি চালাতো। যদ্দরুন ঘোড়ার গাড়ি চালনায় তার পারদর্শিতা ছিলো কিংবদন্তিতুল্য।

শিকারের জায়গায় পৌঁছেই চার পাঁচটি হরিণ চোখে পড়লো রাণীর। মায়ার নির্দেশে রথ চালক ঘোড়া দৌড়িয়ে দিলো। শিকারীর তাড়া খেয়ে হরিণ উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো। পলায়নরত হরিণের পিছনে ঘোড়ার গাড়িও ছুটতে লাগলো তীরবেগে। কিছুদূর গিয়ে হরিণগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এদের একটির পিছনে ছুটতে লাগলো মায়ারাণী। শাহী আস্তাবলের প্রশিক্ষিত ঘোড়াও দৌড়াতে লাগলো হরিণের পিছু পিছু। দৌড়াতে দৌড়াতে এমন জায়গায় এসে গেলো যে, যমিন কোথাও পাথুরে, টিলাময় আবার কোথাও বালুময়। হরিণ জীবন বাঁচাতে এমন জোরে জোরে লম্ফ দিচ্ছিলো যে, এক একটি লাফে ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরত্ব অতিক্রম করতো। এমতাবস্থায় মায়ারাণী চার-পাঁচটি তীর নিক্ষেপ করেছিলো কিন্তু কোনটিই লক্ষভেদ করতে পারেনি। হরিণের ডানে বামে গিয়ে পড়েছে মায়ারাণীর ছোড়া তীর। এমন সময় হরিণ দৌড়ে পৌঁছে যায় টিলাও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায়। নাগালের বাইরে চলে যায় হরিণ। তবুও দ্রুত হাঁকাতে শুরু করলো রথ চালক ঘোড়ার গাড়ি। উঁচু নীচু যমিনে আঘাত লেগে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে যাওয়ার উপক্রম। কয়েকবার এমন হয়েছে যে, পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়েছে মায়া।

হরিণ টিলার ফাঁকে ফাঁকে নীচু দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলো। আর আঁকাবাঁকা পথে এগুচ্ছিলো। রাণী এরপরও হরিণের পিছু ছাড়লো না। হরিণ যেদিকে মোড় নিতো মায়ার ঘোড়ার গাড়িও সেদিকে ঘুরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় আবারো তিনটি তীর নিক্ষেপ করলো মায়া। কিন্তু কোনটিই হরিণ স্পর্শ করলো না। এ সময় সামনে ঘন টিলাময় জায়গা এসে গেলো। হঠাৎ একটি টিলার ওপাশ থেকে এক অশ্বারোহী বেরিয়ে এলো।

আরোহীর হাতে বর্শা। আরোহী তার ঘোড়া ধাবমান হরিণের পিছনে ছুটালো। মায়ারাণীর গাড়িও ততক্ষণে খোলা জায়গায় এসে গেছে। মায়ারাণীর রথ চালক হরিণের পিছু ধাবমান অশ্বারোহীকে চিৎকার করে বললো, সামনে থেকে সরে যাও! এটা মহারাণীর শিকার। কিন্তু অশ্বারোহীর কানে রথ চালকের চিৎকার প্রবেশ করেছে বলে মনে হলো না। সে যথারীতি হরিণের পিছনে ছুটতে লাগলো।

"মহারাণী! তীর ধনুক আমার হাতে দিন! হরিণের আগে আমি এই বেকুবকেই খতম করে ফেলবো।" বললো রথ চালক।

"মনে হচ্ছে, অশ্বারোহী আমাদের দেশের নয়।" বললো মায়ারাণী।

এমন সময় হরিণ একটু ঘুরে দৌড়াতে লাগলো, অশ্বারোহীও ঘুরে গেলো সেদিকে। এখন স্পষ্টই অশ্বারোহীর চেহারা দেখা গেলো।

"দেখে মনে হচ্ছে এ কোনো আরব।" বললো রথ চালক। বুঝতে পারছি না, এদিকে আসার সাহস ও কিভাবে পেলো! রথ তখনো আগের মতোই এগুচ্ছিলো। মায়ারাণী আবারো কয়েকটি তীর ছুড়লো কিন্তু পূর্ববৎ এগুলোও লক্ষ্যভেদ করতে পারলো না। এমন সময় অশ্বারোহী পাদানীর উপর দাঁড়িয়ে তার হাতের বর্শাটি হরিণের দিকে এভাবে নিক্ষেপ করলো যে, নিক্ষিপ্ত বর্শা গিয়ে পড়লো হরিণের কাঁধে। বর্শা বিদ্ধ হওয়ায় হরিণটি লাফ দিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। অশ্বারোহী লুটিয়ে পড়া হরিণের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এদিকে ধাবমান মায়ার ঘোড়ার গাড়িও ততোক্ষণে পড়ে থাকা হরিণের পাশে গিয়ে থেমে গেলো।

অশ্বারোহী মায়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিলো। রথ চালক অশ্বারোহীর প্রতি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"তুমি সেইসব আরবদের কেউ যাদেরকে মহারাজা আশ্রয় দিয়েছেন? স্বদেশী ভাষায়ই জিজ্ঞেস করলো রথ চালক। তুমি কি জানো না, কি অপরাধ করেছো? মহারাণী ইচ্ছে করলেই তোমাকে আমার গাড়ির পিছনে বেঁধে ঘোড়া দৌড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। তুমি আরব হয়েও এতোটা বেকুব ও বেআদব হলে কি করে?"

"না, আমি মহারাজের আশ্রিত আরবদের কেউ নই। তাছাড়া আমি কোন বেআদবীও করিনি, বেকুবও নই।"

"আরে! তুমি আমাদের ভাষাও জানো! আশ্চর্যান্বিত কণ্ঠে বললো রথ চালক।

* * *

"মায়ারাণীর রাগান্বিত হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু সে রাগান্বিত হলো না। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে মায়া গিয়ে দাঁড়ালো অশ্বারোহীর সামনে। গভীরভাবে তাকালো আরোহীর চোখের দিকে।

অজ্ঞাত আরব অশ্বারোহীর বয়স ছিলো ত্রিশের কোঠায়। উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রং, একহারা শরীরের গড়ন। শক্ত গাঁথুনী শরীরের। গাঢ় কালো চোখের তারায় হাসির ঝিলিক। চেহারার মধ্যে এক ধরনের মায়া মায়া ভাব। প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ আরোহীর চেহারায়। মায়া যুবকের দিকে তাকিয়ে তার সম্মোহনীতে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো। আরব যুবকের মুচকি হাসি মায়ারাণীর প্রতি যেন এক ধরনের বিদ্রূপ করছিলো।

এমন সময় অশ্ব খুরের আওয়াজ শোনা গেলো। মুহূর্তের মধ্যে সেদিকে দৌড়ে এলো ছয়জন অশ্বারোহী। এরা ছিলো মায়ারাণীর নিরাপত্তারক্ষী।

"সংগ্রাম, নিরাপত্তা রক্ষীদের আমার কাছে আসতে দিয়ো না। ওদেরকে দূরেই থামিয়ে দাও। আর তুমিও রথ নিয়ে যাও। এর ভাগ্যের ফায়সালা আমি একাকীই করবো।"

চালক রথ নিয়ে চলে গেলো এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের দূরেই থামিয়ে দিলো।

"এখানে কেন এসেছো?" আরোহীকে জিজ্ঞেস করলো মায়ারাণী। হরিণ শিকারের জন্যে এসেছিলে? আমার অনুমতি ছাড়া তো তুমি হরিণ নিয়ে যেতে পারবে না।"

"এটা যদি আমি নিজের জন্যে শিকার করতাম, তাহলে মরে যাওয়ার আগেই আমি সেটিকে জবাই করতাম। আমি এটিকে তোমাদের জন্যই শিকার করেছি। আমি জানি তোমরা মরা জীবজন্তু খেয়ে থাকো।"

"আমাদের জন্য তুমি কেন শিকার করলে? তুমি কি আমাকে নারী মনে করে ভেবেছিলে আমি এটিকে শিকার করতে পারবো না?" জিজ্ঞেস করলো মায়া। তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করেছো? না আমাকে এর পিছনে আসতে দেখোনি?"

"আমি তোমাকে নারী হিসেবে দেখেছি ঠিক, কিন্তু শিকারের ব্যাপারে তোমাকে আমি আনাড়ী মনে করিনি। আমি এ টিলার উপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি যখন থেকে হরিণের পিছু নিয়েছো, তখন থেকেই আমি তোমাকে দেখছি বারবার তুমি হরিণের দিকে তীর নিক্ষেপ করছো, কিন্তু রথ এদিক সেদিক

হওয়ার কারণে তোমার ছোড়া তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদিকে হরিণটিও বাঁচার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। এদিকের মাটি অসমতল হওয়ার কারণে তোমার রথ যেভাবে হেলে যাচ্ছিলো এবং হোচট খাচ্ছিলো তাতে মনে হচ্ছিলো রথ না আবার উল্টে যায়। এজন্য আমি ভাবলাম তোমার জন্যে হরিণটি শিকার করে দেবো, যাতে তোমার ঝুঁকির আশংকায় পড়তে না হয়।"

সুদর্শন আরব যুবক বলে যাচ্ছিলো স্মিত হাস্যে।

মায়ারাণী মন্ত্রমুগ্ধের মতো যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন যুবক তাকে যাদু করে ফেলেছে। তার মুখ থেকে কোন কথাই আর সে বলতে পারলো না।

"তুমি কি জানতে আমি কে?" ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রাণী।"

"না আমি জানতাম না যে তুমি রাজা দাহিরের স্ত্রী। তোমার ঘোড়ার গাড়িও পিছনের নিরাপত্তা রক্ষীদের দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি শাহী খান্দানের কেউ হবে।"

"এখনতো জানলে? এখন কি আমাকে তোমার ভয় হচ্ছে না?"

"না, ভয় করছি না। তোমাদের এখানে ভয় করার অর্থ এক রকম, আর আমাদের দেশে ভয় এর অর্থ অন্যরকম।

আমরা শুধু আল্লাহ্কেই ভয় করি। আমরা মুসলমান। আমাদের দেশে কোন রাজা মহারাজা নেই। সেখানে কেউ রাজা-বাদশাহ্ হয় না।"

"তুমি এখানে কেন এসেছিলে?" যুবককে জিজ্ঞেস করলো মায়ারাণী।

"আমি একটি অপরাধ করে এসেছি। এখন যদি সেই অপরাধের কথা তোমাকে বলি, সেটি হবে আরেকটি অপরাধ। অবশ্য তোমাকে একথা বলতে পারি, আমি এখানে কোন অপরাধ করতে আসিনি। আশ্রয় নিতে এসেছি।"

মায়ারাণী রথ চালককে ইশারায় আহ্বান করলো। রথ চালক দৌড়ে এলো। রথ চালক এলে মায়া বললো, হরিণের গা থেকে বর্শাটা খুলে এখানেই রেখে দাও, আর হরিণটি গাড়িতে করে নিয়ে যাও। রথ চালক রাণীর নির্দেশ পালন করে যখন যেতে লাগলো, তখন আবার ডাকলো মায়ারাণী। রাণী এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললো, কোন আশংকা নেই সংগ্রাম। আমি এর কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করছি। এ লোক আমাদের কাজে আসতে পারে। তোমরা একটু দূরে চলে যাও।"

"মহারাণী! আপনার যে জ্ঞান আছে তাতে আমার কিছু বলার নেই। আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় না। একটু সতর্ক থাকবেন।"

"তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না। যাও। এ লোক আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

চলে গেলো রথ চালক। রাণীর নিরাপত্তা রক্ষীরাও আরো দূরে সরে গেলো। রাণী পুনর্বার আরব যুবকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

* * *

"তুমি কি নিজের সম্পর্কে আমাকে আর কিছু বলবে না?" আরব যুবককে জিজ্ঞেস করলো মায়া।

"নিজের সম্পর্কে আর কিছু বলার আগে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"ঠিক আছে, যা জিজ্ঞেস করার তা করো।"

"আমি তোমাদের দেশ সম্পর্কে জানি। এদেশের রাজা বা রাণী সাধারণ মানুষের সাথে এভাবে কথা বলে না, যেভাবে তুমি আমার সাথে বলছো। তোমাদের এখানে তো মানুষ মানুষের দেবতায় পরিণত হয়েছে।"

"আমি তোমাকে সাধারণ কোন ব্যক্তি মনে করছি না।" বললো মায়ারাণী। আমার মনে হয় তুমি কোন শাহী খান্দানের লোক। আচ্ছা, তুমি আমাদের ভাষা শিখলে কোত্থেকে?" তুমি কি আমাদের দেশ সম্পর্কে আরো বিশেষ কিছু জানো?"

রাণী কিছুক্ষণ নীরব থেকে আরব যুবকের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার সাথে আমার কঠোর স্বরে কথা বলার কোন দরকার নেই, কারণ আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, এ মুহূর্তে তুমি আমার নিরাপত্তা রক্ষীদের বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছো। আমি তোমাকে আরব গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করছি। তুমি কি আমার সন্দেহ নিরসন করতে পারবে?"

"না, তোমার এ সন্দেহ নিরসন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমি তোমাকে সন্দেহাতীতভাবে জানিয়ে দিচ্ছি আমি কারো গোয়েন্দা নই। আমার নাম বেলাল বিন উসমান। আমি আমার খেলাফতের বিদ্রোহী। আমি জানতে

পেরেছিলাম এখানে আরবের অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে, এদের সবাই ছিলো বিদ্রোহী।”

“হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।” বললো মায়ারাণী। আমরা হাজার হাজার বিদ্রোহী আরবকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি ওদের কাছে যাওনি কেন?”

“আমার কাছে তাদের কোন ঠিকানা নেই। তাছাড়া আমি একা নই, আমার সাথে আরো চারজন রয়েছে। আমরা চার পাঁচ দিন যাবত এখানে লুকিয়ে রয়েছি। আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে রাজা পর্যন্ত আশ্রয়ের জন্যে যাওয়া যাবে। তুমি জানতে চেয়েছিলে তোমাদের ভাষা আমি কি করে শিখেছি। ছোট বেলায় আমি আমার পিতার সাথে এদেশে এসেছিলাম এবং ছিলাম প্রায় পাঁচ ছয় বছর। তখনই আমি তোমাদের দেশের ভাষা শিখেছি।”

“তুমি কি তখন সিন্ধু অঞ্চলে থাকতে?”

“না, আমি প্রথমে গিয়েছিলাম সরন্দ্বীপে। তুমি কি জানো, ওখানে অনেক আগে থেকেই মুসলমানরা বসবাস করে?”

“হ্যাঁ, একথা আমি জানি। আমি জানি অনেকদিন আগে থেকেই আরব বণিকরা যাতায়াত করতো। এদের অনেকেই সেখানে বসতি গড়ে তোলে। আমি একথাও জানি যে, মালাবারে যেসব মুসলমানরা বসবাস করে, তারা ইসলামও প্রচার করে। তারা এ অঞ্চলের অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীকে মুসলমানও বানিয়েছে।”

“আমার পিতাও একজন ধর্মপ্রচারক। অবশ্য তিনি ব্যবসাও করতেন। আমি সেই সুবাদে পিতার সাথে এদেশে এসেছিলাম। আব্বার সাথে আমি হিন্দুস্তানের বহু জায়গায় গিয়েছি। তখনই আমি এদেশের ভাষা শিখেছি। আমার পিতা আমাকে একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ ছিলো সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার। আব্বু তখন আমার আগ্রহের কথা বিবেচনা করে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে অভিজ্ঞ উস্তাদের কাছে পাঠান। আমি বড় হওয়ার পর তিনি আমাকে আরব দেশে পাঠিয়ে দেন। আমি খলীফার সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম কিন্তু কিছুদিন পর সেনাবাহিনী ও খেলাফতের মধ্যে দেখা দিলো বিরোধ। যেসব সেনা সদস্য ও নাগরিক তৎকালীন খলীফার বিরোধী ছিলো তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং বিদ্রোহীরা গ্রেফতার ও মৃত্যুর সম্মুখীন হতে লাগলো।

এখানকার রাজা যাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তারা সেই খলীফা বিদ্রোহী আরব। আমি যেহেতু বিদ্রোহীরই সন্তান, তাই আমাকেও পালাতে হলো।"

"আরব বিদ্রোহীরা এদেশে এসেছিলো সে তো অনেক আগের কথা, কিন্তু এতোদিন পরে তোমাকে কেন আসতে হলো?" জিজ্ঞেস করলো মায়া।

"আমি আসলে ওইসব বিদ্রোহীদের কেউ নই, যাদের বিরুদ্ধে প্রথম ধরপাকড় হয়েছিলো— বললো বেলাল। বিদ্রোহের সময় আমিও বিদ্রোহীদের সাথে ছিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরে আমি ভাবলাম, পরস্পর যুদ্ধ করা মোটেও ঠিক নয়। এই বোধ থেকে আমি তৎকালীন খেলাফতের বিশ্বস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সংখ্যা এখনো সেদেশে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বিদ্রোহীদের পক্ষ ত্যাগ করার কারণে আমি ওদের শত্রুতে পরিণত হই, খেলাফতের পক্ষে চলে যাওয়ার কারণে বিদ্রোহীরা আমাকে হত্যার হুমকি দেয়। এদিকে বিদ্রোহীদের সঙ্গ দেয়ার জন্যে খেলাফতের মধ্যে অনেকেই আমাকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। ঘরে বাইরে আমি শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়ি, সেখানে আমার বেঁচে থাকাটাই মুশকিল হয়ে পড়ে। এ কারণে চার সাথীকে নিয়ে আমি দেশ ত্যাগ করে চলে আসি।

এখনও আমি সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে রয়েছি। আমি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। কখনও মনে হয় বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করাই হবে আমার কর্তব্য।"

বেলালের কথা শুনতে শুনতে মায়ারাণীর চেহারার রং বদলে যেতে লাগলো। কোন কিশোরী প্রেমে পড়লে প্রেমিকের সংস্পর্শে গেলে চেহারার যে অবস্থা হয় মায়ারাণীর চেহারাও তদ্রূপ। প্রেমিকা যেমন প্রত্যাশ্যা করে প্রেমিক সারা জীবন তার সামনে বসে থাকুক, আর কথা বলুক, মায়ার অবস্থাও হলো তাই।

"তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো?" রাণীকে জিজ্ঞেস করলো বেলাল। তোমাদের দুর্গে আমার কোন একটা চাকুরী হলেই হলো। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একটা নিরাপদ আশ্রয়। একটা নিশ্চিন্ত ঠিকানা পেলে আমি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারতাম আমি ভুল পথে আছি কি-না?"

"আমি তোমাদের জন্য একটা কিছু করবো।" বললো রাণী।

তুমি কি আমার উপর আস্থা রাখতে পারবে? জিজ্ঞেস করলো মায়া। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে আর একবার দেখা হওয়া উচিত।"

"তুমি যেখানকার কথা বলবে, আমি সেখানেই চলে আসবো।" বললো বেলাল।

মায়ারাণী বেলালকে রাজা দাহিরের দুর্গের পার্শ্ববর্তী একটি জায়গার কথা বললো। আগামীকাল অমুক সময় তুমি সেখানে থাকবে, আমি তোমার কাছে আসবো।" এই বলে মায়া চলে গেলো।

"বেলাল মায়ার কাছ থেকে বিদায় হয়ে একটি উঁচু টিলার উপর তার চার সঙ্গীর কাছে চলে গেলো। বেলাল সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললো, রাজা দাহিরের কাছে পৌঁছানোর জন্যে ক'দিন যাবত যে চেষ্টা করছিলাম, ঘটনাক্রমে আজ সে ব্যবস্থা আল্লাহ্ করে দিয়েছেন। বেলালের জন্যে এভাবে মায়ার মুখোমুখি হওয়া যদিও ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো, তবুও ঝুঁকি নিয়েছিলো বেলাল। কিন্তু মায়ারাণী তার কথায় এতোটা প্রভাবিত হয়ে যাবে তা ছিলো আশাতীত।

* * *

সিন্ধু অঞ্চলে দেশ ত্যাগী পাঁচ আরব মুসলমানের উপস্থিতি কোন আশ্চর্য ঘটনা ছিলো না। কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্মের বহু পূর্বেই আরবের বহু মুসলমান ভারত ভূখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অনেকেই ভারতের ভুখণ্ডে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সর্বপ্রথম মুসলমানরা মালাবার অঞ্চলে আসেন। অবশ্য ইসলামের আগে থেকেই আরব বণিকদের এ অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ছিলো। যেসব মুসলমান মালাবার অঞ্চলে এসেছিলেন, তারা ছিলেন মূলত নৌচালক ও বণিক। মুসলমানরা এখানে আসার সময় ভারতে বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃস্টান ও ইহুদী এই চার ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ ছিলো পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু।

ইতিহাস সাক্ষী দেয় রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায়ই ইসলাম ভারতের মালাবার অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিলো। হেরা গুহার অন্ধকারে যে আলোক রশ্মি উদিত হয়েছিলো, তা আরব বণিকদের মাধ্যমে উপমহাদেশের মালাবার অঞ্চলে রাসূলে আরাবী (স.)-এর জীবদ্দশাতেই পৌঁছে গিয়েছিলো। আরব বণিকদের হাতে বহু ভারতীয় ইসলাম ধর্মেও দীক্ষা নিয়েছিলো।

মালাবারের অদূরেই ছিলো সরন্দীপ যা বর্তমানে শ্রীলঙ্কা নামে পরিচিত। মুসলমান বণিকরা যখন জাহাজে করে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে এ অঞ্চলে আসতো, তারা শুধু পণ্যই নিয়ে আসতো না, সাথে নিয়ে আসতো ইসলামের পবিত্র

আলো। মুসলমান বণিকদের সাথে যখন শ্রীলংকা ও মালাবারের লোকদের সখ্যতা গড়ে উঠলো, তখন তারা মুসলমানদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সততায় আকৃষ্ট হলো। পরে যখন তারা ইসলামের তাবলীগ শুরু করলেন, তাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সততায় মুগ্ধ হয়ে বহু লোক ইসলামে দীক্ষা নিলো।

ভারতের লোকজন যখন দেখলো ইসলামে কোন রাজা প্রজার বিভেদ নেই, মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সবাই এক আল্লাহর বান্দা। আরব মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তৎকালীন শ্রীলঙ্কার উপকূল ও মালাবারের রাজাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এমন কি মালাবারের রাজা যামুরান ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর রাসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে হিজাযে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু আরব উপকূলে সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজ ডুবে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত যামুরানকে ইয়েমেনের তীরে দাফন করা হয়।

হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতের সময় সেনাপতি উসমান বিন আবু আস বোম্বাই এর নিকটবর্তী থানা বন্দরে আক্রমণ করেছিলেন। তার আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো উপমহাদেশে যেসব আরব বণিকের জাহাজ যাতায়াত করে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে একটি বন্দর কব্জায় রাখা।

এটিই ছিলো ভারতে মুসলমানদের প্রথম অভিযান। অভিযান সফল হয়। কিন্তু এ অভিযানে আমীরুল মুমেনীনের অনুমোদন ছিলো না বলে বন্দরের কব্জা বহাল রাখা হয়নি। ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন-সেনাপতি উসমান বিন আবু আস যখন মালে গনীমতের অংশ মদীনায় প্রেরণ করেন তখন ভারত অভিযানের সংবাদে হযরত ওমর সেনাপতি বরাবর অনুমতি ছাড়া অভিযান পরিচালনার জন্যে কঠোর পয়গাম পাঠান।

হযরত ওমর লিখেন—

"ভাই উসমান! তোমার এ অভিযান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। তুমি যে পরিমাণ সৈন্যবল নিয়ে অভিযান পরিচালনা করলে, এরা তো একটি কীটের চেয়ে বেশী ছিলো না, যে কীটকে তুমি একটি কাষ্ঠখণ্ডে বসিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলে। তুমি এতোদূরে গিয়ে অভিযান পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে যদি বিপদে ফেঁসে যেতে তাহলে আমার পক্ষে তোমাকে কোনই সহযোগিতা করার উপায় ছিলো না। আর যদি সেখানে সৈন্য ক্ষয় করে আসতে, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তোমার কবিলা থেকে এতো সংখ্যক লোক সেনাবাহিনীতে নিয়ে নিতাম।"

এর কিছুদিন পর আমীরুল মুমেনীনের অনুমতিক্রমে উসমান বিন আবু আস সিন্ধু অঞ্চলে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন। সেই অভিযানে তিনি তার সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করেন। এক অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সেনাপতি উসমান নিজে, আর অপর অংশের নেতৃত্ব তার ভাই মুগীরাকে দেন। উসমানের এ বাহিনী সামুদ্রিক জাহাজে করে ডাভেল অঞ্চলে সমুদ্র উপকুলে অভিযান চালায়।

সে সময় ডাভেলের রাজা ছিলো চচন্দ। ডাভেলে সামা নামের এক বীর পুরুষ ছিলো রাজা চচন্দ এর সেনাপতি। সে দুর্গের বাইরে সেনাবাহিনীকে নিয়ে এসে মুগীরার বিপরীতে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবুও মুগীরা শত্রু পক্ষের পেটে ঢুকে সামাকে হুমকি দিলেন। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের সেনাপতিদ্বয় মুখোমুখি হয়ে গেলো। মুগীরা 'বিসমিল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলে তকবীর দিয়ে সামার উপর হামলে পড়লেন। সামা আহত হলো, কিন্তু সে প্রতিপক্ষকে এমন আঘাত করলো যে, মুগীরার পক্ষে সেই আঘাত সামলানো সম্ভব হলো না। মারাত্মক আহতাবস্থায় শাহাদাত বরণ করলেন মুগীরা (রা.)।

অবশেষে বিজয়ী হলো মুসলিম বাহিনী। কিন্তু সেই বিজয়ে মূল্য দিতে হয়েছিলো খুব বেশী। শেষ পর্যন্ত নানা কারণে সেখানে আর মুসলমানরা কব্জা বহাল রাখেনি।

এ ঘটনার ছয় বছর পর সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রবিয়া ইরান জয় করেন। ইরান জয়ের পর তিনি সিস্তান আক্রমণ করেন। সিস্তানের শাসক মিরখান হাতিয়ার ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করে। সিস্তান দখল হওয়ার পর সেনাপতি আব্দুল্লাহ সেনাপতি তামিম তাগলিবীকে মাকরান অভিযানে প্রেরণ করেন, তখন মাকরানের শাসক ছিলো রাজা রাসেল। রাসেল সিন্ধের রাজা চচন্দের সাহায্য প্রার্থনা করলে চচন্দ রাসেলের সাহায্যে বিরাট সেনাবাহিনী পাঠালো। উভয় সেনাবাহিনী একত্রিত হলে মুসলিম বাহিনীর বিপরীতে হিন্দুদের সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেলো, কিন্তু তবুও মুসলমানরাই বিজয়ী হলেন। মাকরান মুসলমানদের কব্জায় নীত হলো।

অবশ্য এর আগেও একবার হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত কালে ইরাকের শাসক আবু মূসা আশআরী রবিয়া বিন যিয়াদ নামের একজন সেনাপতিকে মাকরান অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন মাকরান তাদের

অধীনে এসেছিলো। কিন্তু বিজয়ের পর মুসলিম সেনাবাহিনীকে কব্জা ত্যাগ করে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

সেই অভিযানে অর্জিত মালে গনীমতের অংশ ভিন্ন করে বাইতুল মাল মদীনায় প্রেরণ করলে সরকারী অংশ মদীনায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো অভিজ্ঞ সেনানায়ক শিহাব আবদীকে।

বাইতুল মালের অংশ নিয়ে আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমরের কাছে সমর্পণ করলে তিনি বলেন—

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বিজয়কে মোবারক করুন।" তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন। আচ্ছা শিহাব! আমাকে বলো তো মাকরানের অবস্থান কিরূপ? ওখানকার ভৌগোলিক অবস্থা কেমন?"

"আমীরুলম মুমেনীন! বললো শিহাব। মাকরানের যমীন খুবই শুষ্ক। সেখানে কোন ফল ফুল জন্মে না। ফল গাছ দু'চারটি যাও আছে, এগুলো খাওয়ার অযোগ্য। ওখানকার অধিবাসীরা লুটতরাজে অভ্যস্ত। একজন অপরজনকে লুট করেই এরা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই অপরজনকে খুন করে। আমরা যদি সেখানে অল্পসংখ্যক সেনাবাহিনী মোতায়েন করি, তাহলে তাদের ওরা লুটতরাজ করে নিঃশেষ করে দেবে, আর যদি বেশী পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করা হয়, তাহলে খাদ্যাভাবে মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে।"

"আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন।" শিহাব আবদীর কথার প্রেক্ষিতে বললেন হযরত ওমর (রা.)। তুমি তো কাব্য করছো, ওখানকার প্রকৃত অবস্থা আমাকে বলো।"

"আমীরুল মুমেনীন! আমি যা দেখেছি, হুবহু তাই আপনার কাছে ব্যক্ত করলাম। আল্লাহর কসম! আমি কেন; যেই সেখানে যাবে সে একথাই বলবে। সত্যকে ও বাস্তবতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না আমীরুল মুমেনীন!"

"না, শিহাব আবদী। তোমার ধারণা ঠিক নয়।" বললেন ওমর। ইসলামের সৈনিকদেরকে ক্ষুৎ-পিপাসা কখনো মেরে ফেলতে পারে না। কায়সার ও কিসরাকে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্যকারী মুজাহিদদের বেলায় একথা বলা যায় না যে, তারা ঘুমিয়ে থাকবে আর ডাকাতেরা সহায় সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। তাদের বেলায় একথাও বলা হবে অপমানকর যে, তারা ক্ষুধা পিপাসায় ধুকে ধুকে মারা যাবে।"

একথা বলার পর আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর মাকরান থেকে মুসলিম সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর মাকরানের কিছু অংশ কব্জায় রেখে বাকী অংশ ত্যাগ করে মুসলিম বাহিনী সেখান থেকে ফিরে আসে।

* * *

মহাভারতে মুসলমানদের অভিযান শুধু মাকরানেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ওমর ফারুকের শাহাদতের পর হযরত উসমানের সময়ও মহাভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের বিজয়াভিযান অব্যাহত ছিলো। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত কালেও যথারীতি তা অব্যাহত থাকে। তখন মুসলমানরা ক্বিলাত পর্যন্ত অগ্রাভিযান চালিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর খেলাফত বনী উমাইয়াদের হাতে চলে যায়। বনী উমাইয়ার শাসনামলেও মহাভারতের পশ্চিমাঞ্চল মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতেই দেখা দেয় গোলযোগ। ক্ষমতার লোভ খেলাফতের মধ্যে সৃষ্টি করে অস্থিরতা। সত্য আর মিথ্যা, হক ও বাতিলের মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে সংঘাত। যারা ছিলেন হক এর পক্ষে তাদের বলা হয় বিদ্রোহী। এতে করে খেলাফত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় বিজয়ী সেনাবাহিনী। জুলুম ও অত্যাচারের যুগ শুরু হয়ে যায়। শাসকদের মধ্যে জুলুম অত্যাচারে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। ক্ষমতালোভীরা ইসলামের পতাকা ও তাকবীরকে দ্বীনের পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করেন।

উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে তিনি কঠোর হস্তে সকল ধরনের বিদ্রোহ দমন করেন এবং উমাইয়া শাসনকে পাকাপোক্ত করেন। সেই বিদ্রোহের সময় অন্তত পাঁচশ প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা আরবভূমি ত্যাগ করে মহাভারতের এক অংশের পৌত্তলিক শাসক রাজা দাহিরের আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজা দাহির দেশত্যাগী এসব মুসলমানদেরকে মাকরান অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়। দাহিরের আশ্রয় প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন আলাফী বংশের। এ গোত্র যুদ্ধবাজ হিসেবে ছিলো বিখ্যাত।

বিলাল বিন উসমানও বিদ্রোহজনিত কারণে চারজন সঙ্গী নিয়ে দাহিরের কাছে আশ্রয়ের আশায় ভারতের মাটিতে পৌঁছে। কিন্তু এলাকা অপরিচিত থাকা এবং রাজা পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন মাধ্যম না পাওয়ার কারণে তারা ঠিকানাহীন ঘুরে ফিরছিলো। বিলাল এ কথাও জানতো যে, বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়ে রাজা

দাহির খেলাফতের সাথে শত্রুতা তৈরী করেছে। তাছাড়া দাহিরের পিতা মাকরান অভিযানে মুলমানদের প্রতিপক্ষ রাজা চচন্দকে সামরিক সহযোগিতা করাও ছিলো শত্রুতার অন্য কারণ। এজন্য বেলাল ভয় করছিলো রাজা দাহির তাদের গ্রেফতার করে কয়েদখানায় বন্দী করতে পারে।

* * *

দুর্গ থেকে কিছুটা দূরের একটি জায়গায় পরদিন মায়ারাণী বেলালকে সাক্ষাত করতে বলেছিলো। পরদিন বেলাল যখন মায়ারাণীর সাথে সাক্ষাত করতে যাবে, তখন তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিলো। রাতে এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিস্তর কথাবার্তা হলো। বেলালের সঙ্গীরা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো, মায়া তোমাকে ধোঁকা দিতে পারে, তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। বেলালের মনেও এ আশংকা ছিলো। কারণ মায়া তাকে বলেছিলো, তোমাকে আমার গোয়েন্দা মনে হয়। বেলাল সাথীদের এ কথা বলার পর সাথীরা তাকে মায়ারাণীর সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে জোরালো বাঁধা দেয়। কিন্তু বেলালের মনে দৃঢ় আস্থা জন্মে মায়া তাকে গ্রেফতার করবে না, তার সাথে প্রতারণা করবে না।

"তোমরা কি করবে? সবাইকে আমার সাথে দেখলে মায়া আমার সাথে সাক্ষাত করবে না। তা ছাড়া ওর মনে যদি কোন দূরভিসন্ধি থাকে তাহলে একসাথে গেলে সবারই গ্রেফতার হওয়ার আশংকা রয়েছে। এরচেয়ে বরং এটাই ভালো হবে, তোমরা এখানে থাকো, আমাকে ঝুঁকি নিতে দাও। তাতে গ্রেফতার হলে আমি একাই হবো। যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ফিরে না আসি, তাহলে বুঝবে আমি কোন বিপদে পড়ে গেছি, তোমরা তখন এখান থেকে পালিয়ে যাবে।"

বেলালের পরামর্শ সঙ্গীরা মেনে নিলো না। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিলো সবাই যাবে। তবে বেলাল যাবে অশ্বারোহণ করে, যাতে কোন বিপদের আশংকা দেখলে পালাতে পারে। আর তার সাথীরা বেলাল ও মায়ার সাক্ষাত স্থল থেকে দূরে লুকিয়ে থাকবে। কোন বিপদ দেখলে তারা বেলালের সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে হাতে বর্শাটি নিয়ে রওয়ানা হলো বেলাল। মায়ারাণী যে জায়গায় তাকে সাক্ষাত করতে বলেছিলো, জায়গাটি তাদের অবস্থান স্থল থেকে দুই আড়াই মাইল দূরে। কিভাবে যাবে কখন যাবে সবই মায়া বেলালকে বলে দিয়েছিলো।

* * *

টিলা, পাহাড়ী উপত্যকা ও গিরিখাদ পেরিয়ে বেলাল যখন খোলা জায়গায় পৌঁছলো, তখন বেলালের চোখে পড়লো ঘন সবুজ একটি ময়দান। ঘন উঁচু ঘাসে ভরা জায়গাটি, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। মাঝে মধ্যে কিছু গাছও রয়েছে। গাছগুলো খুবই তরতাজা, সবুজ পত্রপল্লব ও ফলফুলে ভরা। বেলাল এই ঘন ঘাসপূর্ণ মাঠ পেরিয়ে যখন সামনে অগ্রসর হলো, তখন দেখতে পেলো একজন অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসছে। কালো বর্ণের ঘোড়াটিকে দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় শাহী আস্তাবলের বিশেষ ঘোড়া সেটি।

দূর থেকেই বেলালের বুঝতে অসুবিধা হলো না, অশ্বারোহী কোন পুরুষ নয়, নারী। কিন্তু বেলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। বেলাল পাকা যোদ্ধা। মায়ারাণীর দেহ সৌন্দর্যে নিজেকে মোটেও আকৃষ্ট করেনি বেলাল। সে জানে নারী সব সময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে হিন্দুস্তানের হিন্দুরা নারীকে শত্রুদের ঘায়েল করতে ব্যবহার করে এ ব্যাপারটি সে পূর্বেই অবগত ছিলো। সে তার ঘোড়াকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলো, উড়ে চললো ঘোড়া। কিন্তু মায়ার দিকে নয়। মায়া যে জায়গার কথা বলেছিলো বেলাল চললো সেদিকে। রাণী পৌঁছার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় বেলাল পৌঁছে গেলো। জায়গাটি খুবই সুন্দর। চতুর্দিকে ছোট বড় গাছপালা। থোকা থোকা লতাগুল্মে জংলী ফুলের সমারোহ। বিশাল ময়দানের মাঝখানে একটি ছোট ঝিলের মতো। স্বচ্ছ স্ফটিক পানির মধ্যে শাপলা, পদ্মফুল ফুটে একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গাছে গাছে অসংখ্য নাম না জানা পাখির কলকাকলী। অসংখ্য ঝোপ ঝাড়ের পিছনে দু'দশজন মানুষ লুকিয়ে থাকা কোন ব্যাপারই নয়।

বেলাল ঘোড়া দৌড়িয়ে পুরো এলাকাটি একটু দেখে নিলো। সে বুঝতে চাইলো রাণীর কোন লোক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে কি-না। কিন্তু অশ্বখুড়ের শব্দে পাক পাখালীর ছুটাছুটি ছাড়া কোথাও কোন জনমানুষের চিহ্ন সে খুঁজে পেলো না। গোটা এলাকাটি পর্যবেক্ষণ শেষ করে বেলাল ঝিলের পাড়ে পৌঁছলে মায়ারাণীকেও আসতে দেখা গেলো। মায়া বেলালকে দেখেই এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে বেলালের প্রতি একটা মুচকি হাসি দিলো। বেলালও ঘোড়া থেকে নেমে ধীরে ধীরে নির্মোহভাবেই মায়ার দিকে অগ্রসর হলো।

বেলাল কাছে পৌঁছলেই হঠাৎ করে মায়া বেলালের একটি হাত তার দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে চুমু দিলো এবং বেলালের হাতটি তার কাঁধে নিয়ে বেলালের শরীরের সাথে নিজের শরীর মিশিয়ে দিলো। বেলালের পাঁজর তার

পাঁজরকে স্পর্শ করছে। বেলাল নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে মায়ার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো।

"নিজেকে সরিয়ে নিলে কেন? আমাকে কি তোমার ভালো লাগেনি?" বেলালকে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো মায়া। তুমি কি আমাকে এদেশের রাণী ভেবে ভয় পাচ্ছো? না, কোন ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি ভালো করেই বুঝতে পেরেছি, তুমি আরবের কোন বেদুঈন নও, তুমি কোন না কোন বাহাদুর সর্দারের ছেলে। আমি জানি, আরব দেশ থেকে পালিয়ে যারা এসেছে তারা সাধারণ নাগরিক নয়, সবাই ওখানকার নেতৃস্থানীয় লোক, নয়তো নেতৃস্থানীয় লোকজনের সন্তান। তুমি তাদের মতোই একজন।"

"আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি না রাণী। আমি এটা দেখে অবাক হচ্ছি যে, তুমি এদেশের রাণী হয়েও একাকী দুর্গের বাইরে এতোদূর এসেছো? না-কি তোমার দেহরক্ষীরা তোমার পিছনে পিছনে আসছে?"

"না, এখানে আমার কোন দেহরক্ষী আসবে না। আমি অন্য দশজন রাণীর মতো নই। অন্যসব রাণী তো প্রজাদের মধ্যে সমীহ সৃষ্টি করার জন্যে বিশাল নিরাপত্তা প্রহরী বেষ্টিত হয়ে প্রাসাদের বাইরে বের হয়।"

"রাজা একাকী তোমাকে দুর্গের বাইরে বের হতে বাধা দেয়নি?"

"না। তুমি জেনে আশ্চার্যান্বিত হবে যে, মহা ভারতের কোন রাণী সাধারণত দুর্গের বাইরে যায় না, কিন্তু আমার ব্যাপারটি ভিন্ন।"

"এটা আবার কেমন ব্যাপার?"

"এটা পরে বলবো। আমি আগে বুঝতে চাই, তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি কোন ভালোবাসার উদ্রেক হয়েছে কি-না। তোমার প্রতি ভালোবাসা-ই আমাকে একাকী এখানে টেনে এনেছে। আচ্ছা! তুমি কি আমাকে ভালোবাসার যোগ্য মনে করো না?"

"অবশ্যই যোগ্য মনে করি। কিন্তু সেই সাথে আরো অনেক কিছুই মনে করছি আমি। আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার জন্যে একটি মায়াবী ফাঁদ তৈরী করছো!"

"আমি জানতাম, আরবের লোকেরা না-কি আমাদের দেশের লোকদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমানও দূরদর্শী হয়। কিন্তু তোমার মধ্যে তো কোন বুদ্ধি বিবেক দেখছি না। তুমি এটা কি করে ভাবতে পারলে যে, আমাদের সেনাবাহিনী

তোমাদের মতো পাঁচজন ভবঘুরেকে গ্রেফতার করতেও অক্ষম। তোমাকে যদি গ্রেফতার করারই ইচ্ছা থাকতো, তাহলে রাতে কয়েকজন সেনা পাঠিয়ে দিলেই তো তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারতো।"

"তুমি আমার মধ্যে ভালোবাসার কি দেখলে রাণী?" এদেশে কি আমার চেয়ে কোন ভালো মানুষ তুমি পাওনি?"

"বেলাল! আমি এদেশের রাণী। এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমার চেয়েও আরো সুশ্রী সুন্দর টগবগে যুবক আমাকে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। কিন্তু ভালোবাসার কথা মুখে উচ্চারণ করার দুঃসাহস পাচ্ছে না। কারণ দেশের রাণীকে সাধারণ প্রজারা দেবীতুল্য মনে করে। রাণীকে সাধারণ প্রজারা পূঁজা করে...। কিন্তু তোমার সৌভাগ্য বেলাল! এদেশের রাণী আজ তোমার মতো এক অজ্ঞাত বিদেশী যুবকের কাছে প্রেম নিবেদন করছে, ভালোবাসার ভিখারী সেজে একটু মমতা ভিক্ষা করছে। বেলাল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস পূর্বজন্মে অবশ্যই আমরা একসাথে ছিলাম।"

"মৃত্যুর পর মানুষ আবার দুনিয়ায় পুনর্জন্ম লাভ করে, এ বিশ্বাস আমার ধর্মে নেই।"

"ভালোবাসার মধ্যে ধর্ম বিশ্বাস টেনে এনে দেয়াল সৃষ্টি করোনা বেলাল। একটু সময় আমার পাশে বসো, আমার হৃদয় ভেঙে দিয়ে তুমি চলে যেয়ো না।"

"নিজের একান্ত পাশে বেলালকে বসালো রাণী। বেলাল ছিলো একজন সুদর্শন সাহসী যোদ্ধা। প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন সুদর্শন যুবক। হিন্দুস্তানের যে কোন রাণীই এই যুবককে দেখলে আকৃষ্ট হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মায়ারাণীও ছিলো রূপবতী, সুন্দরী। যে কোন যুবকের পক্ষে মায়ার রূপ লাবণ্যও সৌন্দর্য এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিলো না। তাছাড়া মায়ার তীক্ষ্ণ ধী, প্রখর দৃষ্টি ও বাচনভঙ্গী যে কোন সুপুরুষকেই মায়ার বাঁধনে জড়ানোর জন্যে যথেষ্ট। যে কোন যুবককেই প্রেমের বাঁধনে নিজের গোলামে পরিণত করার মতো গুণের অধিকারী ছিলো মায়া।

* * *

দীর্ঘ সময় একান্তে কাটিয়ে বেলাল ও রাণী যখন সবুজশ্যামল নৈসর্গিক বেলাভূমি থেকে বেরিয়ে এলো, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। জঙ্গলের বৃক্ষগুলো বিকেলের আলোয় দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। বেলালের সঙ্গীরা

দূরের একটি উঁচু জায়গায় বসে এদিকে দৃষ্টি রাখছিলো। তারা ভাবছিলো অবশ্যই দুর্গ থেকে সেনাবাহিনী এসে জায়গাটিকে ঘিরে ফেলবে এবং বেলালকে ধরে হত্যা করবে নয়তো গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলেও এমন কোন দৃশ্য তাদের চোখে পড়লো না।

অনেকক্ষণ পর বেলাল যখন তার সঙ্গীদের কাছে এলো তখন সে নেশাগ্রস্তের মতো। সে এসে সঙ্গীদের সাথে এমনভাবে কথা বলছিলো। দেখে তাকে নেশাগ্রস্তের মতো মনে হচ্ছিলো। তার সঙ্গীরা তাকে যা জিজ্ঞেস করছিলো সে জবাব দিচ্ছিলো তার উল্টো। সে শুধু রাণীর প্রশংসা করছিলো। সঙ্গীরা ওকে গালমন্দ করার পর চৈতন্যোদয় হলো।

"আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সবার জন্যেই ঠিকানার ব্যবস্থা করতে পারবো।" বললো বেলাল। রাণী আমাদেরকে মর্যাদার সাথেই তার দুর্গে রাখবে। আগামীকাল আবার আসবে রাণী।

পরদিন আগের জায়গায় আবার রাণীর সাথে দেখা করতে গেলো বেলাল। রাণী ও বেলাল পাশাপাশি এভাবে বসলো যে, একজন অপরজনের মধ্যে হারিয়ে যাবে। রাণী ও বেলাল বৃক্ষশাখায় লীলারত কপোত কপোতির মতো একজন অপরজনের প্রেমে হারিয়ে যাচ্ছিলো।

"এখনও কি তুমি আমাকে সন্দেহ কর?" বেলালকে জিজ্ঞেস করলো রাণী। নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করো, এখনও কি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে ধরিয়ে দেবো?"

"এ সন্দেহ এখন আর আমার নেই। তবে আমি এ প্রশ্নের কোন জবাব পাচ্ছি না, তুমি এভাবে আমার সাথে প্রেম করে তোমার স্বামীকে কেন ধোঁকা দিচ্ছো? কেন তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করছো?" সে এতো বিশাল রাজ্যের রাজা। তাছাড়া যতোটুকু শুনেছি, সে একজন সুস্থ সবল মানুষ। দেখতেও বিশ্রী নয়। বয়স্কও নয়। তারপরও তুমি তাকে ভালোবাসার অযোগ্য মনে করছো কেন?"

"তাকে আমি ভালোবাসি না একথা ঠিক নয়। এতোটাই আমি তাকে ভালোবাসি যে, তার জন্যে আমি আমার জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তার শরীরে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক তাও আমি সহ্য করতে পারি না"— বলে নীরব হয়ে গেলো রাণী। দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে রাণী বেলালের উদ্দেশ্যে বললো, তুমি হয়তো

বিশ্বাস করবে না বেলাল! আমি তোমাকে এমন কথা শোনাবো যা কখনো তুমি শোননি।

"বেলাল! রাজা দাহির আমার স্বামী বটে; কিন্তু আমি তার সহোদর বোন!"

একথা শুনে আঁৎকে উঠলো বেলাল। "বলো কি? এমনটি কি করে সম্ভব?"

"তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো, আমি যা বলছি তাই সত্য। আমি রাজা দাহিরের সহোদর বোন, তবুও সে আমার স্বামী। অন্য দশটি হিন্দু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা যেভাবে হয়ে থাকে সে ধরনের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়েই আমাদের বিয়ে হয়েছে। মন্দিরের বড় পণ্ডিতই আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়িয়েছে। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামী স্ত্রী কিন্তু শারীরিকভাবে ভাই-বোন। আমাদের কোন সন্তান হবে না। রাজা দাহির নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে আমাকেও জীবন্ত তার চিতায় মৃত্যুবরণ করতে হবে।"

"এ বিয়ে কিভাবে সম্ভব হলো?" জিজ্ঞেস করলো বেলাল। কেন তোমাদেরকে এমন বিয়ে করতে হলো?"

"তাহলে শোন বলছি, বলে মায়ারাণী রাজা দাহিরের সাথে তার বিয়ের কারণ সবিস্তারে জানালো।

* * *

মায়া বেলালকে বিয়ের যে কাহিনী শোনালো তা ভারতের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। পুরনো ইতিহাস ঘাটাঘাটি করলে এই বিয়ের সত্যতা পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দাহির সিন্ধু অঞ্চলে রাজা হওয়ার পর সারা দেশের প্রজাদের অবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখে। সেই সাথে নিজ দেশের সীমান্ত এলাকা সম্পর্কেও সে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে। কয়েক মাসের পর্যবেক্ষণ শেষে রাজা দাহির যখন রাজধানী আরুরে ফিরে এলো তখন রাজধানীর প্রজারা তার গমন পথে ফুল বিছিয়ে দিলো এবং তার উপর ছিটিয়ে দিলো ফুলের পাপড়ী। রাস্তার দু'পাশে নারী পুরুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাজাকে রাজধানীতে স্বাগত জানালো।

রাজা দাহির রাজধানীবাসীর আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে সেদিনই বিকেলে রাজপ্রাসাদে সাধারণ সভা আহ্বান করলো। তাতে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করলো এবং অভ্যাগত সবাইকে ভূড়িভোজনে আপ্যায়িত করলো। সভা ভেঙ্গে যাওয়ার পর শহরের বড় দুই পণ্ডিত তার কাছে

গিয়ে তার খুবই প্রশংসা করলো এবং রাজাকে দেবতার আসনে সমাসীন করলো।

"আমরা মহারাজ ও মহারাজের বোন মায়াদেবীর ভাগ্য গণনা করিয়েছি-জ্যোতিষীদের হয়ে বললো এক ঋষি। মহারাজের ভবিষ্যত আমরা যা দেখেছি তাতে কোন অসুবিধা নেই, সব ঠিকই আছে তবে একটু...। মায়ার ভাগ্য গণনা করতে গিয়ে আমরা পেয়েছি, যে ব্যক্তির সাথে মায়ার বিয়ে হবে সেই সিন্ধু অঞ্চলের রাজা হবে।"

"নিশ্চয়ই তা হবে আমার মৃত্যুর পর?" জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললো রাজা দাহির।

"না, মহারাজ! এবার এগিয়ে এসে বললো জ্যোতিষী। মহারাজের জীবদ্দশাতেই সে রাজা হবে।"

"কে হবে সেই রাজা? কোত্থেকে আসবে সে?" জিজ্ঞেস করলো দাহির।

"এ বিষয়টি অস্পষ্ট মহারাজ! বললো জ্যোতিষী। ভাগ্য যেক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে জ্যোতিষী ও গণকরাও অক্ষম। তারাও কিছু বলতে পারে না।"

"অবশ্য এটা পরিষ্কার বোঝা যায় মহারাজ, মায়ার স্বামী বাইরে থেকে আসবে না, সে হবে স্থানীয়।" বললো অপর এক গণক।

"এমন তো নয়, যে আমার বোনের স্বামী হবে সে আমাকে হত্যা করবে?" জানতে চাইলো রাজা।

"এ ব্যাপারটিও পরিষ্কার নয় মহারাজ! বললো প্রধান গণক। এটা পরিষ্কার যে-ই হবে মায়ার স্বামী সেই হবে সিন্ধু অঞ্চলের রাজা।"

"আমরা এটা কর্তব্য মনে করেছি মহারাজ! মহারাজের যে কোন সমস্যা সংকট সম্পর্কে আগে ভাগেই আপনাকে অবগত করানো।" বললো প্রধান ঋষি। যাতে মহারাজ বিপদ আসার আগেই প্রতিকার ব্যবস্থা নিতে পারেন।"

রাজা দাহির পণ্ডিত ও গণকদের পেট থেকে একথা বের করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করলো, বোনের বিয়ের পর তার ভাগ্যে কি ঘটবে। কিন্তু পণ্ডিত ও গণকরা এ ব্যাপারে তাকে স্পষ্ট কিছুই বললো না। পূর্বে দেয়া বক্তব্যের বাইরে আর কোন কথাই বললো না পণ্ডিত ও গণকদল। রাজা দাহির পণ্ডিত ও গণকদের কথা শতভাগ সত্য বলে বিশ্বাস করতো। তাই চিন্তায় পড়ে গেলো রাজা। রাজা দাহির ছিলো কট্টর ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। গণক ও পণ্ডিতদের কথার বাইরে কোনকিছু চিন্তা তার দেমাগে মোটেও প্রবেশ করেনি।"

রাজাকে চিন্তার সাগরে ভাসিয়ে বিদায় নিলো পণ্ডিত ও গণকদল। পণ্ডিত ও গণকদল চলে যাওয়ার সাথে সাথে রাজার স্বস্তি ও সুখ বিদায় নিলো। আকাশ পাতাল চিন্তা করে রাতে একরতিও ঘুমাতে পারলো না রাজা। অগত্যায় সে তলব করলো তার প্রধান উজির বুদ্ধিমানকে।

"প্রধান উজির শুধু নামেই বুদ্ধিমান ছিলো না। তার জ্ঞান বুদ্ধির উপর রাজা দাহিরের ছিলো অগাধ আস্থা। প্রকৃত পক্ষেও যে কোন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিমানের কোন জুড়ি ছিলো না। রাজার নির্দেশ পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো উজির। রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে নমস্কার ও কুর্নিশ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বললো, এতো রাতে কেন অধমকে তলব করেছেন মহারাজ?"

রাজা দাহির উজির বুদ্ধিমানকে পণ্ডিত ও গণকদের সবকথা জানালো এবং বললো, "উজির! ব্যাপারটি তুমি গভীরভাবে চিন্তা করো তারপর আমাকে বলো, আমি কি করতে পারি?" অচিরেই আমার বোনের বিয়ে হচ্ছে। তাহলে কি আমি নিজে থেকেই এই রাজ্যপাট ভগ্নিপতিকে দিয়ে দেবো? এতে অন্তত আমি বেঁচে থাকতে পারবো-তাছাড়া আর কি করার আছে আমার?"

"মহারাজ! দেশের প্রজা, সেনাবাহিনী ও দেশের শাসনক্ষমতা থেকে স্বেচ্ছায় রাজার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মোটেও ঠিক হবে না। জগতের পাঁচটি জিনিস এমন রয়েছে যেগুলো পাঁচটি জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পরিণতি ভালো হয় না। রাজা রাজ্য ত্যাগ করলে, উজির উজারতি ছেড়ে দিলে, পীর মুরীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে, শিশু মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, আর দাঁত মুখের পাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোনটারই কোন মূল্য থাকে না। আপনিই একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন মহারাজ! আমি আপনাকে রাজ্যপাট ত্যাগ করার কথা কোন্ মুখে বলবো!"

"আমি তোমার কাছে কোন ব্যাখ্যা চাচ্ছি না। আমি তোমার কাছে জানতে চাই এখন আমাকে কি করতে হবে?"

"মহারাজ! এমনটিই আপনাকে করতে হবে যেমনটি কোনদিন কেউ করেনি।" বললো উজির। মায়াকেই আপনি বিয়ে করে নিন এবং তাকে রাণী করে ফেলুন। তবে বিয়ে হলেও তার সাথে আপনার ভাই-বোনের সম্পর্কই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে, নয়তো তা হবে মহাপাপ। এতে রাজত্বে কোন ঝুঁকি থাকবে না।

"বুদ্ধিমান! তোমাকে ধন্যবাদ। বড় দামী পরামর্শ দিয়েছো তুমি, বললো রাজা। এ ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। কিন্তু এতে যে লোকজন খুবই সমালোচনা করবে। মানুষ আমার বদনাম করবে এবং নানা কল্পকাহিনী তৈরী করবে।"

"মহারাজ! বদনামের ব্যাপার ও লোকজনের সমালোচনার ব্যাপারটি বেশীদিন থাকবে না। কারণ কোন ব্যাপারেই লোকজনের আগ্রহ বেশীদিন থাকে না। কিছুদিন আগের ঘটনা। একলোক তার একটি ভেড়ার পশমের উপর কিছু মাটি ঢেলে দিয়ে মাটিতে পানি ঢেলে ভিজিয়ে দিলো। পানিতে ভিজে মাটি ভেড়ার গায়ে লেপ্টে যায়। মালিক এতে কিছু কলাই বীজ ছিটিয়ে দিয়ে পানি দিতে থাকে। কিছুদিন পর কলাই অংকুরোদগম হয়ে ভেড়ার গায়ে কলাই গাছ জন্ম নেয়। অতঃপর মালিক সেটিকে বাজারে নিয়ে গেলে ভেড়াটি দেখার জন্যে লোকজনের ভীড় লেগে যায়। এ ভীড় থাকে কয়েকদিন। সপ্তাহান্তে দেখা গেলো আর কেউ ভেড়া দেখার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এর সপ্তাহখানিক পর ভেড়ার পাশ দিয়ে হেটে গেলেও ভেড়ার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখেনি...।

মহারাজকেও এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, মানুষ কিছু দিন এ নিয়ে কানাঘুষা করবে ঠিক, তবে তা বেশী দিন নয়। তাছাড়া মহারাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করার দুঃসাহস কার আছে?"

* * *

রাজা দাহিরের মাথায় ক্ষমতার মোহ চেপে বসলো। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে উজির বুদ্ধিমানের দেয়া পরামর্শেই আপন বোনকে বিয়ে করলো রাজা। অবশ্য বিয়ের আগেই উজির বুদ্ধিমানকে বললো, রাজার কাজকর্ম দেশের প্রজারা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেটি নীতিতে পরিণত হয়। রাজা দাহির ছিলো প্রজা বৎসল। এ কারণে সে দেশের নেতৃস্থানীয় পাঁচশ প্রজাকে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করে এনে গণকদের গণনা ও উজিরের পরামর্শ সম্পর্কে জানিয়ে তাদের মতামত চাইলো। হঠাৎ এক কোণ থেকে মৃদু কণ্ঠে শোনা গেলো, "না মহারাজ! এমনটি হতে পারে না।" এরপর অপর একজন, তারপর আরো কয়েকজন রাজার এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে শুরু হয়ে গেলো তুমুল প্রতিবাদ। সবাই একবাক্যে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠলো।

"শোন! তোমরা সমর্থন না করলেও আমি মায়াকেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।" গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলো রাজা। তোমরা কি চাও, আমি রাজ্যপাট ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাবো, বাকী জীবন বনবাসে কাটিয়ে দেবো? তোমরা যদি আমার রাজত্বে কোন কষ্ট করে থাকো, আমি যদি তোমাদের কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে বলো আমি কাকে কি কষ্ট দিয়েছি।"

সভা নীরব হয়ে গেলো। সবার দিকে চোখ বুলিয়ে রাজা বললো, "আমার শাসনকালে আমি কি কারো উপর কোন জুলুম করেছি? করে থাকলে বলো।"

সবাই মাথা নীচু করে ফেললো।

"আমি মায়ার সাথে শুধু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাই পালন করবো, কখনো আমাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হবে না।" বললো রাজা।

"তাহলে কোন অসুবিধা নেই মহারাজ! আওয়াজ এলো এক কোণ থেকে। দেখাদেখি সবাই এ কথায় সায় দিলো।"

এ ঘটনার তিনদিন পর রাজা দাহির সহোদর বোন মায়ারাণীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করলো। নেতৃস্থানীয় প্রজা ও সভাসদদের উপস্থিতিতে আবেগ উত্তেজনা ও আমোদ প্রমোদহীন অনাড়ম্বর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো রাজা দাহিরের সাথে সহোদর বোন মায়ারাণীর বিয়ের পর্ব। লোকজন এই বিয়ের কথা শুনে নাক ছিটকালো, কানে আঙুল দিলো। কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলার সাহস ছিলো না কারো।

* * *

এভাবে ঘটে গেলো আমার বিয়ে অনুষ্ঠান। বেলালকে বললো রাণী। আপন ভাইয়ের জন্যে আমি নিজ আগ্রহেই এ ত্যাগ স্বীকার করেছি। কারণ সিংহাসন থেকে ভাইকে বঞ্চিত করতে চাই না আমি। তাছাড়া আমার কানে যখন একথাগুলো এলো যে আমার ভাবী স্বামী আমার ভাইকে খুন করে মসনদ দখল করবে, তখন আর বিয়ের প্রতি আমার কোন আগ্রহ থাকেনি।

"তোমার হয়তো জানাই ছিলো না, কার সাথে তোমার বিয়ে হচ্ছে?" বেলাল জানতে চাইলো।

"জানা ছিলো।" সেও রাজা ছিলো। 'ভাটি' নামের এক রাজ্যের রাজা ছিলো সে। তার নাম ছিলো সোহান রায়।

আমি তখন ব্রাহ্মণাবাদে আমার অপর ভাই মিহির সেনের এখানে। সেই ভাই আমাকে রাজা দাহিরের কাছে এ পয়গাম দিয়ে পাঠালো যে, আমাকে যেনো অতি তাড়াতাড়ি রাজা সোহান রায়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আমার ভাই মিহির সেন আমার বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাঁচশ ঘোড়া ও পাঁচশ মটকি ভর্তি মাল-সামানও দিয়েছিলো। তাছাড়া একটি দুর্গও দিয়েছিলো যৌতুক হিসেবে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজা দাহিরের অপর ভাই মিহির সেন যখন জানতে পারে রাজা দাহির বোন মায়াকেই বিয়ে করেছে তখন সে দাহিরের প্রতি রেগে আগুন হয়ে গেলো। জরুরী পয়গাম পাঠালো পয়গাম পাওয়া মাত্র মায়াকে সোহান রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু রাজা দাহির তার বিয়ে করার কারণ, গণকদের গণনা ও উজিরের পরামর্শ এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার সমস্যা জানিয়ে ফেরত পয়গাম পাঠালো কিন্তু তাতে মিহির সেনের ক্ষোভ প্রশমিত হলো না। সে রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে সেনাভিযান করলো। অবরোধ করলো রাজা দাহিরের দুর্গ। কয়েকদিন অবরোধের মধ্য থেকে রাজা দাহির তার সৈন্যদের অবরোধ ভাঙার নির্দেশ দিলো। রাজার হুকুম পেয়ে দাহিরের সেনারা অবরোধ ভাঙতে যখন দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এলো তখন মিহির সেন বুঝতে পারলো দাহিরের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী তাই মোকাবেলায় প্রবৃত্ত না হয়ে রাজা দাহিরের কাছে পয়গাম পাঠালো, তুমি দুর্গের বাইরে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করো। তোমার ও আমার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে।

রাজা দাহির উল্টো খবর পাঠালো আমার তো যাবার প্রয়োজন নেই। তুমিই তো আসতে পারো, আমি তোমাকে স্বাগত জানাবো। অবশেষে মিহির সেন নিজেই হাতি সাজিয়ে তাতে আরোহণ করে দাহিরের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে বললো, দুর্গের বাইরে চলো, তোমার সাথে আমার একান্ত কথা আছে। ভাই মিহির সেনের প্ররোচনায় দুর্গের বাইরে যেতে রাজি হয়ে গেলো রাজা দাহির। দাহির সেনের হাতিতে সাজানো হলো হাওদা। দাহির বসলো হাওদায় আর মিহির বসলো হাতির সামনে মাথার কাছে। রাজা দাহিরের উজির বুদ্ধিমান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাজার হাতির পিছু পিছু যেতে লাগলো। হাতি যখন দুর্গ ফটকের কাছাকাছি পৌছলো তখন উজিরের কানে কানে কে যেনো এসে ফিস ফিস করে কি কথা বললো আর অমনি উজির রাজাকে ইশারা করে বুঝালো, আপনি দুর্গের বাইরে যাবেন না বিপদ আছে। অনন্যোপায় হয়ে দুর্গের প্রধান ফটক দিয়ে হাতি বের হওয়ার সময় রাজা দাহির হাওদায় দাঁড়িয়ে গেটের নীচে

ঝুলে থাকা গাছের ডালে ঝুলে পড়লো। হাতি প্রধান ফটক পেরিয়ে গেলে সৈন্যসামন্ত এসে রাজাকে নামালো। দুর্গ ফটক পেরিয়ে রাজা মিহির সেন পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো রাজা দাহির হাওদাতে নেই। হতাশ সে। তার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেলো। রাজা দাহির অনিবার্য বিপদ থেকে রক্ষা পেলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজা উজিরকে জিজ্ঞেস করলো, উজির! তুমি আমাকে ফেরালে কেন? উজির বললো মহারাজ! আমার গোয়েন্দারা একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাকে খবর দেয়, আপনার ভাই আলোচনার নামে চক্রান্ত করে দুর্গের বাইরে নিয়ে আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাজা মিহির সেন রাজা দাহিরকে হত্যা করার জন্যেই দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু যখন দেখলো দাহির তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে আর তার সৈন্যবাহিনীও দাহিরের বিপুল সৈন্য সংখ্যার সাথে মোকাবেলায় পেরে উঠতে পারবে না, তখন অবরোধ তুলে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু অত্যধিক মনোকষ্ট ও গরমে রাজা সেন জ্বরে আক্রান্ত হলো। গরমে সারা শরীরে ফুস্কা পড়ে গেলো। কয়েকদিন জ্বরে ভুগে দাহিরের দুর্গের বাইরেই সে মারা গেলো। ৬৭২ খৃস্টাব্দের ঘটনা সেটি। তখন রাজা মিহির সেনের বয়স ছিলো মাত্র বত্রিশ বছর।

* * *

বিয়ের ঘটনা সবিস্তারে বলার পর মায়ারাণী বেলালের উদ্দেশ্যে বললো, কি ভাবছো বেলাল? মনে রেখো, রাজা দাহির আমার জীবনে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবে না। সে আমাকে বিয়ে করেছে সত্য কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন দাম্পত্য সম্পর্ক হয়নি। আমরা সেই ভাই-বোনের পবিত্রতা বজায় রেখেছি। তবে রাজা দাহির জানে আমি যুবতী। এ সময়ে আমার স্বামীর ঘরে থাকার কথা ছিলো। সে আলবৎ জানে, যৌবনের চাহিদা কি? যুবতীর মন কিসে তৃপ্তি পায়। যে তার মসনদ রক্ষা করতে গিয়ে আমার জীবন যৌবনকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

"আমি শুনেছি, তোমাদের দেশে নাকি-তরুণী মেয়েদেরকে দেবতার নামে জবাই করে দেয়া হয়?"

"তুমি ঠিকই শুনেছো। কেবল পণ্ডিত বা গণক যদি একবার বলে দেয় যে, বিপদ আসন্ন। কোন কুমারীকে দেবতার নামে বলি দিলে এই মুসীবত থেকে

পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তাহলে রাজার তত্ত্বাবধানেই কুমারী বলি দেয়া হয়। বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পালন করা হয় পণ্ডিতদের নির্দেশ।"

"আমাদের দৃষ্টিতে এসব কর্মকাণ্ড হারাম এবং এক আল্লাহর সাথে শরীক করার পর্যায়ে পড়ে। অথচ তোমাদের প্রভু নিজের বান্দাদের প্রাণ হরণ করে আনন্দিত হয়?"

"বেলাল! আমি তোমাকে আগেই অনুরোধ করেছি, আমার সাথে ধর্ম সম্পর্কে কথা বলবে না। আমি যখন তোমার কাছে আসি তখন আমি নিজেকে হিন্দু ধর্মের অনুসারী মনে করি না, আর তোমাকেও মুসলমান বলে ভাবি না। আমি নারী আর তুমি পুরুষ আমার কাছে এ সত্যটাই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। নারী সেই পুরুষকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে যে পুরুষ তার চোখে ভালো লাগে। দেখো, আমি এ দেশের ঘোষিত রাণী। ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে শিকলে বেঁধে আমার গোলাম বানিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু তা না করে তোমার প্রেমে পড়ে আমি নিজেকে তোমার বাঁদীতে পরিণত করেছি। আমি কি তোমার সেই সংশয় ও প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছি, কেন আমি আমার স্বামীকে ধোঁকা দিচ্ছি এবং কেন তাকে আমি প্রেমিক হিসেবে নিজের জীবন যৌবন উৎসর্গ করতে পারছি না?"

"আমার ভাই রাজা দাহির জানে, সে আমার যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্নগুলোকে মরুভূমিতে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। এতে আমি জীবন তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে ধুকে ধুকে মরছি। আমার সারা অস্তিত্বে আমার স্বপ্নগুলো সারাক্ষণ জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে। সে পুরুষ। দেশের রাজা। রাজমহলে রয়েছে অসংখ্য সেবিকা দাসী। সে যে কোনভাবে তার দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে। বিশেষ কোন নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোন বাধ্যবাধকতা তার নেই। কিন্তু আমি রাণী। আমার জন্যে এ ব্যবস্থা নেই। এ জন্য সে আমাকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে। তবুও আমি আমার মর্যাদাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু এমনটিও সম্ভব নয় যে, আমি স্বামী হিসেবে কাউকে ভালোবাসবো, তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকবো। স্বামীর কদমে নিজের ভালোবাসার অর্ঘ দেবো।"

"আমি তোমার অবস্থা বুঝেছি রাণী। কিন্তু আমি তো বিদেশ বিভূয়ে এক পলাতক। তোমার দেশে আমি পরবাসী। এখানে আমার কোন ঠিকানা নেই। নেই ঘরবাড়ি। তুমি কতোদিন এভাবে চুপি চুপি আমার সাথে মিলিত হবে? তুমি এখন আমার মধ্যে তোমার প্রতি মায়ামমতা তৈরী করে ফেলেছো।"

"চুপি চুপি মিলবো কেন? আমি তোমাকে আমার সাথেই রাখবো।" বললো মায়া।

"রাণী! রাণীকে নিজের বুকে টেনে বললো বেলাল। আমি যদি এখানে পরবাসী না হতাম, তাহলে তোমাকে মুসলমান বানিয়ে আমার বিবি করে নিতাম।"

"তুমি আবার ধর্মের কথা বলছো। উষ্মা মাখা কণ্ঠে বললো রাণী। আমি নিজেও ধর্মান্তরিত হতে চাই না, তোমাকেও আমার ধর্মে টেনে আনতে চাই না। আমরা একজন অপরজনের ভালোবাসায় সিক্ত হতে চাই, আজীবন ভালোবেসে যেতে চাই। বলো বেলাল! তুমি কি আজীবন আমাকে ভালোবেসে যাবে?"

* * *

এ ঘটনার ছয় বছর পর রমলের রাজা রাজা দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করে কিছু এলাকা দখল করে নিলো এবং আরো সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। রমলের রাজা ছিলো হস্তিবাহিনী সজ্জিত। তার প্রায় সব হাতিই ছিলো মাদা হাতি। হাতিগুলো ছিলো খুবই তাজা তাগড়া আর অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারী ও ভয়ংকর। তদুপরি রমল বাহিনী যুদ্ধের সময় এসব হাতিকে মদ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে ফেলতো, তখন এগুলোর ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলার সামনে কারো দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকতো না। এছাড়া রমলের সৈন্যসংখ্যাও ছিলো বিপুল। রমলের আগ্রাসী ক্ষমতার বর্ণনা শুনে ভড়কে গেলো রাজা দাহির। সে উজির বুদ্ধিমানকে ডেকে ভীত শংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এই অবস্থায় কি করা যায় উজির?"

"মোকাবেলা ছাড়া আর কি করার আছে মহারাজ! বললো উজির বুদ্ধিমান। সৈন্যবাহিনী কম তাতে কি হয়েছে? খাজাঞ্চীখানার দরজা খুলে দিন। প্রজাদের বলুন, যারা বাহাদুরের মতো লড়াই করবে, তাদের দেয়া হবে এসব ধনরত্ন।"

"সাধারণ প্রজাদের তো লড়াই করার ট্রেনিং নেই, তারা কিভাবে একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করবে?"

"তাহলে শত্রুদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নিন।" বললো উজির।

"সন্ধি করার মানে হলো পরাজয় বরণ করা। এরচেয়ে তো মৃত্যুও ভালো। জানা নেই, শত্রু পক্ষ সন্ধি প্রস্তাব দিলে কি পরিমাণ টাকার বিনিময়ে সন্ধি করার

শর্ত দেয়। আমি সন্ধি প্রস্তাব করতে চাই না, পরাজয়ও বরণ করতে চাইনা।” বললো রাজা দাহির।

“তাহলে একটাই পথ আছে মহারাজ! আপনি যেসব আরবদেরকে এখানে আশ্রয় দিয়েছেন এদেরকে আপনার দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে রাজি করুন।”

“কিন্তু এরাও তো সংখ্যায় বেশী নয়। মাত্র পাঁচশ বা এর কিছু বেশী হবে। এতো অল্প মানুষ কিভাবে বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করবে?” বললো রাজা।

“মহারাজ! আপনি কি জানেন না, এরা সেই জাতি যারা রোম ও পারস্যের বিশাল সমরশক্তিকে গুড়িয়ে দিয়ে বিজয় অর্জন করেছে। এরা লড়াকু জাতি। হাতে গোনা সৈন্য নিয়ে বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় বিজয় অর্জনের অভিজ্ঞতা এদের আছে।” বললো উজির।

তারিখে মা'সুমীতে বর্ণিত হয়েছে—রাজা দাহির তার দেশ রক্ষার জন্যে তার আশ্রিত আরবদের কাছে নিজে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলার অনুরোধ করলো। আশ্রিত মুসলমানের সংখ্যা ছিলো পাঁচশ। এদের অধিকাংশই ছিলো প্রথম সারির যোদ্ধা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সন্তান। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে সাঈদ বিন আসলাম নামের মাকরানের গভর্নরকে এরা হত্যা করে বিদ্রোহ করেছিলো। এই অপরাধে খলীফার রোষের শিকার হয়ে এরা সিন্ধুতে এসে রাজা দাহিরের কাছে আশ্রয় নেয়। আশ্রিতরা সবাই মিলে হারেস বিন আলাফীকে তাদের নেতা ঘোষণা করে।

রাজার আগমন সংবাদ শুনে আশ্রিত আরবদের সর্দার হারেস আলাফী রাজাকে স্বাগত জানিয়ে বললো— “মহারাজ! আজ আপনাকে অন্যদিনের মতো দেখাচ্ছে না। এমন ব্যতিক্রম দেখছি কেন মহারাজ!”

“আমার মর্যাদা এখন প্রশ্নের মুখোমুখি। তোমাদের তরবারীই পারে সম্মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে। আমি তোমাদের উপকারের প্রতিদান নিতে আসিনি, উপকারের ডংকা বাজাতে আসিনি। আমি বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে এসেছি।”

হারেস আলাফী তাকে বসিয়ে আরব আশ্রিতদের আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালো।

“মহারাজ! বলুন, আমাদের তরবারীর এমন কি প্রয়োজন পড়েছে আপনার? আমরা অবশ্যই আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করতে প্রস্তুত।”

“রাজা দাহির আশ্রিত আরব সর্দার হারেসকে জানালো, তার বিরুদ্ধে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে এক শক্তিশালী বাহিনী আক্রমণ করতে আসছে। রাজধানী থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে তাঁবু গেড়েছে শত্রুবাহিনী।

“একথা শুনে হারেস আলাফী বললো, “আল্লাহর কসম! মুসলমানরা বন্ধুত্বের দাবী আদায়ে কখনো পিছপা হয় না। আমরা অবশ্যই আপনার বন্ধুত্বের হক আদায় করবো। প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবো না।”

“তাহলে এখনই কোন পরিকল্পনা তৈরী করে নাও, দয়া করে শত্রুদের হাত থেকে আমার দেশকে রক্ষা করো। রাজা দাহির হতাশ ও পরাজিতের স্বরে বললো। শুনেছি শত্রুদের হাতে পাগলা হাতি রয়েছে। হস্তিবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কোন বাহিনীই রুখতে পারে না, ওদের চিৎকারেই সৈন্যরা ভয় পেয়ে যায়। তোমরা কি এসব হাতির মোকাবেলা করার ব্যবস্থা করতে পারবে?”

“মহারাজ! কিছুটা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো, এক আরব বৃদ্ধ। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের ঘটনা স্মরণ করো। তখন তুমি খুবই ছোট ছিলে। পারস্যের অগ্নি পূজারীরা আমাদের কাছে পরাজিত হয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ঘটালো যে, এর আগে কোন যুদ্ধে এতো অধিক পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ কোথাও ঘটেনি। অগ্নি পূজারীরা মনে করেছিলো, এটাই হবে ওদের সাথে আমাদের শেষ লড়াই, এরপর আমাদের আর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। ওরা বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে এলো। আমরা অনেকেই জীবনেও হাতি দেখিনি। হাতি ছিলো আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমি তখন যুবক। সে লড়াইতে ছিলাম আমি। হে রাজা! তুমি হয়তো জেনে থাকবে, পারস্য সম্রাটকে জঙ্গী হাতি সরবরাহ করেছিলো তৎকালীন সিন্ধু অঞ্চলের রাজা....। আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও সেইসব হাতির চিৎকার আমার কানে বাজে। এসব হাতি আমাদের ভয়ানক ক্ষতি করেছিলো। তবে আমরা হাতির সুড় কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম। কি মনে করো রাজা! কাজটি খুব সহজ ছিলো?”

“অবশ্যই নয়, দোস্ত!” বললো রাজা দাহির। হ্যাঁ, আমি বড় হয়ে শুনেছি। কাদেসিয়ার যুদ্ধে হস্তিবাহিনী মুসলমানদের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও মুসলমানরা যখন হাতিগুলোর সুড় কাটতে শুরু করে তখন আহত হাতিগুলোই পারসিকদের জন্যে হয়ে উঠে বিপদ। হাতির পায়ে পিষ্ট হয়েই মারা পড়ে বহু পারসিক সৈন্য। ফলে শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।”

৬৩৫ খৃস্টাব্দে কাদেসিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। তখন পারস্যের রাজা ছিলেন ইয়াজদেগির্দ। তিনি পূর্বাঞ্চলের সকল অমুসলিম রাজাদের কাছ থেকে এই বলে সাহায্য নিয়েছিলেন যে, যদি মুসলমানদের এখনই প্রতিরোধ না করা যায়, তাহলে দুনিয়াতে কোন ধর্মই আর থাকবে না। মুসলমানরা সবাইকে গোলাম বাঁদীতে পরিণত করবে। পারস্যের রাজা ইয়াজদেগির্দ সিন্ধু রাজার কাছেও সাহায্যের আবেদন করেছিলো। সিন্ধু রাজা তার কিছু সৈন্যসহ এই ভয়ানক জঙ্গী হাতি উপহার দেয়। কতগুলো হাতি সিন্ধু রাজা পারস্য সম্রাটকে দিয়েছিলো তা আমরা জানতে পারিনি। তবে এতটুকু জানতে পেরেছিলাম যে, সম্রাটের জন্য রাজা নিজের ব্যবহৃত সাদা কালো মিশ্রিত কাজলা রঙের হাতিটিও দিয়েছিলো। কাদেসিয়া যুদ্ধে সেই হাতিতে সওয়ার ছিলো পারস্যের বিখ্যাত সেনাপতি রুস্তম। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি রুস্তমের। কাদেসিয়া যুদ্ধেই আমাদের সৈন্যদের হাতে রুস্তম নিহত হয়।"

"এ জন্যই তো আমি তোমাদের কাছে এসেছি। হস্তিবাহিনীর মোকাবেলা করা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব। আমি তোমাদের উপকার করেছি, আশা করি এই বিপদে তোমরাও আমার উপকার করবে।"

"যাও রাজা! আমরা ইনশাআল্লাহ্ তোমার সাহায্যের জন্যে পৌঁছে যাবো। দেখবে হাতি ময়দানেই আসবে না। আমাদের মধ্যে লড়াই করার মতো যতোজন রয়েছে সবাই যুদ্ধ করবে। তুমি আমাদেরকে কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করো। আর বাকী সৈন্যদেরকে তুমি শত্রুবাহিনীর দিকে পাঠিয়ে দাও। ওদের থেকে মাইল খানিক দূরে তাঁবু ফেলে ওদের বলো প্রতিরক্ষা খাল খনন করতে। তুমি আমাকে পাঁচশ সৈন্য আমার অধীনে পাঠিয়ে দিও। আর বাকীদের তোমার সাথে রাখো। এরপর যা ঘটবে তা তোমার শত্রুবাহিনী যেমন টের পাবে তুমিও নিজের চোখেই দেখতে পাবে।" বললো আরব সর্দার আলাফী।

অতঃপর যা ঘটলো, তা আরব মুসলমান যোদ্ধাদের ইতিহাসের স্বাভাবিক ঘটনা। অবশ্য তাদের বাহাদুরী শুধু সিন্ধু রাজা দাহির আর তার শত্রুরাই দেখেনি। আজো ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে সেই আরব সর্দার হারেস আলাফীর সাথীদের শৌর্য বীর্যের কাহিনী কথা বলে। ইতিহাসের পাতায় সারা জগতের মানুষ সেই কাহিনী দেখে নিতে পারে।

“হারেসের কথা মতো রাজা দাহির পাঁচশ অশ্বারোহী তার অধীনে পাঠিয়ে দিলো। অপরদিকে রাজা দাহিরের সেনাবাহিনী রাজধানী ত্যাগ করে রমলের রাজার অবস্থানের তিন মাইল দূরে তাঁবু ফেলে দ্রুত প্রতিরক্ষা খাল খনন করে ফেললো। এর মধ্যে আলাফী বেশ বদল করে রাজা দাহিরের শত্রুবাহিনীর মধ্যে ঢুকে ওদের সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখে বুঝতে পারলো—এই বাহিনীর মোকাবেলায় রাজা দাহিরের অস্ত্র সমর্পণের কোন বিকল্প নেই। বিশাল সেই বাহিনী আর বহুশক্তির অধিকারী শত্রু সৈন্য। এক্ষেত্রে শত্রুদের শর্ত মেনে সন্ধিচুক্তি করে প্রাণ রক্ষা ছাড়া রাজা দাহিরের বাঁচার কোন পথ নেই।

রমলের রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীর তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করছিলো এবং আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। রমলের রাজা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো রাজা দাহিরের বাহিনী তার বাহিনীর মোকাবেলায় একেবারেই নগণ্য। তাই সে চিন্তামুক্ত হয়ে গেলো। ভাবলো, বিজয় তার অবশ্যম্ভাবী। সে ভাবতেই পারলো না নগণ্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজা দাহিরের বাহিনী তার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাতে পারে।

দু'দিন পরের ঘটনা। রমলের বাহিনী রাতের দ্বিপ্রহরের সময় গভীর ঘুমে অচেতন। এমন সময় আরব সর্দার হারেস তার আরব সাথী ও রাজার দেয়া পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে রমলের বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা চালালো। সে রমলের শিবিরে ঢুকে তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলো। সারা শিবির জুড়ে ভয় আতংকে সেনারা পালাতে শুরু করলো। জীবন নিয়ে পালানো ছাড়া প্রতিরোধের কোন চিন্তাই করতে পারলো না। কিন্তু আলাফীর গুপ্ত হামলা এতোটাই তীব্র ছিলো যে, রমলের বাহিনী পালানোর অবকাশও পেলো না। প্রায় হাজারের উপরে সৈন্য মারা গেলো। বন্দীও করে ফেললো বহু সৈন্য। আর পঞ্চাশটি হাতি ধরে নিয়ে এলো। এতে রমল রাজার কোমর ভেঙে গেলো।

অভাবিত এ সাফল্যে রাজা দাহির আরবদের অপরিমেয় পুরস্কারে ভূষিত করলো। তাছাড়া মাকরান অঞ্চলে বিশাল এলাকা তাদেরকে বসতি স্থাপনের জন্যে লা-খিরাজী দান করলো। এখানেই পরবর্তীতে এই আরব আশ্রয় প্রার্থীরা বসতি স্থাপন করে।

রাজা দাহিরের আশ্রিত আরবরা যখন রমলের রাজার আক্রমণ থেকে রক্ষা করলো দাহিরের রাজত্ব, তখন বেলাল ও তার সাথীরা রাণী মায়ার একান্ত কর্মচারী হিসেবে রাজ প্রাসাদে নিরাপদ জীবন যাপন করছে। রাণী

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাহিরের বিবাহিতা হলেও বেলালকেই সে মনে প্রাণে প্রাণ পুরুষ হিসেবে স্থান দিয়ে রেখেছে এবং তার চার সাথীকে একান্ত নিরাপত্তারক্ষীর মর্যাদা দিয়ে রাজ মহলেই বিশেষ মর্যাদায় রেখেছে। রাণী বাইরে গেলে এরাই থাকে তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে। ঘরে বাইরে সবখানে বেলাল ও তার সাথীরাই মায়ারাণীর সেবক, কর্মচারী, পাহারাদার, নিরাপত্তারক্ষী সেই সাথে জীবন ও প্রাণের আত্মীয়।

এক পর্যায়ে রাজা দাহিরের সেই দুরবস্থা আর থাকলো না। রাজা দাহির তার দুর্বলতা কাটিয়ে রাজত্বকে মজবুত করতে সক্ষম হলো। দেখতে দেখতে রাজা দাহিরের রাজ্য মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। উত্তরে সীস্তান ও মকরানের কিছু অঞ্চলও রাজা দাহিরের দখলে চলে এলো। দক্ষিণে গুজরাট ও মালো পর্যন্ত বিস্তৃত হলো রাজা দাহিরের রাজত্ব।

এতো দিনে মায়ারাণীর শরীরেও ভাটার টান দেখা দিয়েছে। আর যোদ্ধা বেলালও পৌঢ়ত্বের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। এরা একজন অপরজনকে দেখে ও কথা বলেই জীবন কাটাতো।

রাজা দাহিরের রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধি পেলো ঠিক, তবে শেষ পর্যায়ে এসে দাহিরের মধ্যে দেখা দিলো রূঢ়তা। সে প্রজাদের উপর শুরু করলো অত্যাচার উৎপীড়ন। তখন দাহিরের রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক ছিলো বেশী। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের অধিকাংশই ছিলো জাট। রাজা দাহির বৌদ্ধদের জীবনকে সংকীর্ণ করে ফেললো, তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্রবোধকে নস্যাৎ করে দিতে গুড়িয়ে দিলো তাদের উপাসনালয়গুলো।

আরব দেশের সাথেও দাহির শত্রুতা সৃষ্টি করেছিলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের শাসক থাকাকালে রাজা দাহিরের আক্রমণাত্মক ভূমিকা ছিলো সবচেয়ে বেশী। তখন যেসব বিদ্রোহী আরব হাজ্জাজ ও আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের অত্যাচারের ভয়ে দেশত্যাগ করেছিলো, রাজা দাহির তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে আরব শাসকদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছিলো। এসব খবর হাজ্জাজের কানে পৌঁছলে হাজ্জাজ এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সে সময় হাজ্জাজ ছিলেন অর্ধেক আরবের শাসক। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও যুদ্ধবাজ হিসেবে তার জুড়ি ছিলো না। হাজ্জাজের অত্যাচারের ভয়েও কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী দেশত্যাগ করে রাজা দাহিরের রাজ্য সিন্ধুতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজা দাহির এসব

বিদ্রোহী মুসলমানকে আরব শাসকদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ চালানোর জন্যে নানাভাবে উত্তেজিত করছিলো।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আপন ভাতিজা ও হাতে গড়া সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন পারস্যের গভর্নর, তখন পারস্যের রাজধানী ছিলো সিরাজ শহরে। সে সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স মাত্র সতেরো বছর। কিন্তু বয়স কম হলে কি হবে, মেধা মনন ও অভিজ্ঞতায় সে যেকোন পৌঢ় ব্যক্তির চেয়েও ছিলো বেশী দক্ষ। মুহাম্মদ বিন কাসিমের এই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও শক্তি ছিলো তার মা ও চাচা হাজ্জাজের দেয়া প্রশিক্ষণের ফসল। সামরিক রণকৌশলে সে ছিলো একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি। পারস্যের কুর্দিরা ছিলো বিদ্রোহী ও লড়াকু। পারস্যের সম্রাটও কুর্দিদের বিদ্রোহ এবং চক্রান্তে অসহায় হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম তার অস্বাভাবিক মেধা ও প্রজ্ঞার দ্বারা কুর্দিদের এমনভাবে আয়ত্বে এনেছিলেন যে, তার আঙুলের ইশারায় কুর্দিরা উঠতো বসতো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম গভর্নরের দায়িত্ব নেয়ার আগে সিরাজের তেমন গুরুত্ব ছিলো না। বিন কাসিম সিরাজের আশে পাশের আরো কিছু পারসিক অঞ্চল জয় করে মুসলিম সালতানাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই সাথে কুর্দিদের বিদ্রোহ ও চক্রান্ত দমন করতে সক্ষম হন। তিনিই সিরাজকে রাজধানী ঘোষণা করে এখানে একটি আধুনিক শহরের গোড়াপত্তন করেন। তার জীবদ্দশাতেই সিরাজ নগরীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আশৈশব এতীম ও ক্ষুধে এই শাসক ও সেনাপতির তখনও প্রোজ্জ্বল তারকা খ্যাতি অর্জন হয়তো বাকী ছিলো। অবশ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্থান সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিলো, যেদিন তিনি খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ভাই সুলায়মানকে বাৎসরিক সামরিক প্রদর্শনীতে পরাজিত করেছিলেন। সুলায়মান ভেবেছিলো তার ভাই হয়তো এটাকে নিছক একটা খেলার জয় পরাজয় হিসেবেই মূল্যায়ন করবেন। কিন্তু খলীফা সেইদিনের খেলার মধ্যেই মুহাম্মদ বিন কাসিম যে অন্য দশজনের চেয়ে ভিন্ন, তা বুঝতে পেরেছিলেন।

খলীফা সেদিন রাতেই মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ডেকে এনে তার সাথে কথা বলেন। এতোটুকু তরুণের মধ্যে অস্বাভাবিক মেধা ও প্রজ্ঞা দেখে তিনি বিস্মিত হন। সেই বয়সেই মুহাম্মদ বিন কাসিম দক্ষ সেনাপতিদের মতো সামরিক বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারতেন এবং যে কোন বিষয়ে তার মন্তব্য হতো অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

ইবনে ইউসুফ! হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে বললেন খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক। এই ছেলে একজন প্রতিভাধর সেনাপতি হবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। দেখবে আগামী প্রজন্ম অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। এই ছেলে আরব জাতির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার বড় নিয়ামত। একে ব্যারাকে নিয়ে যান ইবনে ইউসুফ! তাকে সেনাপতির পদমর্যাদা দিয়ে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিন।"

ঐতিহাসিকরা তৎকালীন লেখকদের কথা উদ্ধৃত করে লিখেন, মুহাম্মদ বিন কাসিমের গায়ের রং ছিলো গোলাপী, চোখ দুটো ছিলো বড় বড়, কপাল চওড়া, হাত দুটো শক্ত, সুঠৌল ও দীর্ঘ, শরীর ছিলো পুষ্ট এবং আওয়াজ ছিলো ভারী। চেহারা ছিলো চমকানো। মুখের ভাষা ছিলো খুবই মিষ্ট, বলার ভঙ্গি ধীর ও সরল। পুরো অবয়বে মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন একজন মূর্তিমান সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী। যে তাকে দেখতো মুগ্ধ ও প্রভাবিত না হয়ে পারতো না। তার ঠোটে কথা বলার সময় ঈষৎ হাসি লেগে থাকতো। মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতো কিন্তু প্রয়োজনের কথা বলতে পারতো নির্দ্বিধায়। তিনি সবার সাথে খুব সহজে কথা বলতেন এবং শুনতেন। কিন্তু প্রশাসনিক কাজে ছিলেন খুবই নীতিবান। কেউ তার কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে এমনটি কল্পনাও করতে পারতো না। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর ও আপোসহীন।

* * *

একদিন মুহাম্মদ বিন কাসিম তার চাচার রাজধানী বসরায় এলেন।

"মুহাম্মদ! মৃত্যুর আগে আমি একটি অপূর্ণ আশা পূরণ করে যেতে চাই!" বললেন হাজ্জাজ।

"কি সেই অপূর্ণ আশা চাচাজান?"

"এটা এমন একটা আশা যা পূর্ণ করাটা এখন আমার কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আমি সিন্ধু রাজ্যের প্রতিটি ইমারতের ইট খুলে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমার মনে হয়, তুমি আমার এই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবে এবং সিন্ধু রাজ্যকে ইসলামী সালতানাতের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে।"

"এজন্য তো আমীরুল মুমেনীনের অনুমতির প্রয়োজন হবে। আপনি অনুমোদন এনে দিন। আমি আপনার প্রত্যাশা পূরণ করে দেবো। ইনশাআল্লাহ।"

"এটা একটা সমস্যা বটে। আমীরুল মুমেনীন এখনো অনুমতি দিচ্ছেন না। আমি এমন একটা অজুহাতের চেষ্টা করছি, যাতে তিনি অনুমতি দিতে বাধ্য হন। সিন্ধু দেশ ও হিন্দুস্তান থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বড় ধরনের চক্রান্তের পাঁয়তারা চলছে। তোমার দস্তাবিজ রক্ষক হয়তো তোমাকে বলে থাকবে কাদেসিয়ার যুদ্ধে সিন্ধু রাজা বহু জঙ্গী হাতি দিয়ে পারস্য সম্রাটকে সহযোগিতা করেছিলো। ওরা পারসিকদেরকে সেনাবাহিনী দিয়েও আমাদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলো।"

"হ্যাঁ, চাচাজান! আমি একথাও শুনেছি যে, কাদেসিয়া যুদ্ধের দু'বছর আগে জঙ্গে সালাসিলে হিন্দু মারাঠা ও জাটরা অংশগ্রহণ করেছিলো এবং তারা নিজেদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়েছিলো।"

পারসিকদেরকে যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন সেনাপতি হরমুজ তৎকালীন সিন্ধু রাজার কাছে সাহায্যের আবেদন করে এবং সিন্ধু রাজার সাথে মৈত্রী চুক্তি করে। অপরদিকে যেসব হিন্দু জাট তাদের দেশে গোলামী ও মানবেতর জীবন যাপন করছিলো, এদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মোটা অংকের ভাতা বরাদ্দ দিয়ে তার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলো। হিন্দু জাটরা ছিলো জাতিগতভাবে লড়াকু ও সাহসী। হরমুজের হাতে বন্দী জাটদের অধিকাংশই ছিলো অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও প্রথম শ্রেণীর প্রশিক্ষিত সৈন্য। হরমুজ এদেরকে নিজ দেশের সেনাবাহিনীর মতো সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে সেনাবাহিনীতে পদায়ন করে নেয়। সেই সাথে এদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ঢুকিয়ে দেয়।

এইসব জাট (অনেকে এদেরকেই গোর্কা বলেন) সৈন্যরাই পাঁচ, সাতজনের একেকটি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদেরকে শিকলে বেঁধে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলো। এতে করে কেউ পালিয়ে যেতে চাইলেও পালাতে পারতো না এবং প্রতিপক্ষ অগ্রসর হতে চাইলে শিকলে পেঁচিয়ে বাধাগ্রস্ত হতো।"

এসব আমি আমার উস্তাদের কাছে শুনেছি চাচাজান। উস্তাদের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, সবই আমি হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি। শিকলে বেঁধে যুদ্ধ করেছিলো বলেই এই যুদ্ধকে "জঙ্গে সালাসিল" বলা হয়। পারসিক সেনাপতি হরমুজ খালিদ বিন ওয়ালিদের মুখোমুখি যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। এরপর পারসিকদেরকে মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।"

"আমার গোয়েন্দা সিন্ধু দেশের খবরাখবর আমাকে নিয়মিত পাঠাচ্ছে। আমার গোয়েন্দারাও বিদ্রোহীদের বেশ ধারণ করে ওদের সাথে রয়েছে। রাজা দাহির এতোটাই বদমাশ হয়ে পড়েছে যে, সমুদ্রের ডাকাতদেরও সে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এসব ডাকাত দল সরন্দ্বীপ ও মালাবার অঞ্চল থেকে যেসব মুসলমান হজ্জ্ব করতে আসে এবং যেসব আরব মুসলমান ব্যবসায়িক মালপত্র নিয়ে ওদের সমুদ্রকূল দিয়ে যাতায়াত করে, এসব ডাকাতেরা তাদের সবকিছু লুটে নেয়। এরই মধ্যে কয়েকটি মুসলিম জাহাজ এরা লুট করেছে।

"আমাদেরকে অবশ্যই মুসলমানদের যাতায়াত ব্যবস্থা এবং জাহাজ চলাচলের নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে।" বললেন মুহাম্মদ বিন কাসিম।"

"আমি ব্যবস্থা বলতে একটাই বুঝি, সিন্ধু অঞ্চল আমরা দখল করতে না পারলেও অন্তত সিন্ধু অববাহিকার সমুদ্র অঞ্চল ও উপকূলের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই আমাদের কব্জায় আনতে হবে।" বললেন হাজ্জাজ। সিন্ধু অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দর হলো ডাভেল। এটিকে দখলে নিতে পারলেই সমুদ্র পথ আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।"

"আমীরুল মুমেনীন থেকে যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে দিন। পরে একটু সময় দিন আমি ডাভেল বন্দরের নিয়ন্ত্রণ আপনার অধীনে এনে দেবো।" বললেন মুহাম্মদ।

"খলীফার অনুমতি নেয়ার চেষ্টা আমি অনেকদিন থেকেই করছি।" বললেন হাজ্জাজ। কিন্তু তিনি অনুমতি দিচ্ছেন না। হয়তো অনুমতি তিনি দেবেনই না। রাজা দাহির। নিজের বোনের স্বামী। আমি ওর দেহকে আরবদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হতে দেখতে চাই, ওকে আমি তুলাধুনা করতে চাই...।"

"এর পরদিন মুহাম্মদ বিন কাসিম চাচা হাজ্জাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিরাজ নগরে চলে গেলেন।

* * *

এর প্রায় দু'মাস পরের ঘটনা। বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দুপুরের আহারের পর আরাম করছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন তার নিরাপত্তারক্ষী কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে, আর লোকটি ভিতরে প্রবেশে দ্বাররক্ষীর বাধা মানতে চাচ্ছে না। এ নিয়ে দ্বাররক্ষী ও আগন্তুকের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে। এরই মধ্যে কারো কণ্ঠে শোনা গেলো—হে হাজ্জাজ সাহায্য করো! হে হাজ্জাজ সাহায্য করো! হাজ্জাজ আমাদের সাহায্য করো...।

হাজ্জাজ দ্বাররক্ষীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “বাইরে কি হচ্ছে?”

“বাইরে এক ক্লান্ত-শ্রান্ত লোক এসেছে। সে সরন্দ্বীপ থেকে এসেছে বলে দাবী করছে। বলছে তাদের জাহাজ ডাকাতরা লুটে নিয়েছে এবং আরোহী সবাইকে ডাকাত দল বন্দী করে নিয়ে গেছে...।

“তাকে এক্ষুণি ভিতরে নিয়ে এসো। জলদি যাও! আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকো না।”

“হাজ্জাজ দ্বাররক্ষীকে বিদায় করে সাহায্যপ্রার্থীকে নিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি নিজেই দ্রুত দ্বাররক্ষীর পিছনে পিছনে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি বাইরে এসে দেখতে পেলেন, একজন অশ্বারোহী লোক ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে রয়েছে, আর ঘোড়াটি অত্যধিক খাটুনীর কারণে ঘেমে নেয়ে গেছে এবং হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ধুকছে ঘোড়াটি। আরোহীর মাথা বুকের সাথে মিশে গেছে। লোকটি হাজ্জাজের আগমন টের পেয়ে মাথা উঁচু করলে হাজ্জাজ দেখতে পেলেন, তার মুখ ব্যাদান হয়ে রয়েছে এবং চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ঠোঁট দুটো সাদা হয়ে শুকিয়ে গেছে। শরীরে ধুলোবালির আস্তরণ পড়ে গেছে।

লোকটি হাজ্জাজকে দেখে বলে উঠলো, “হে হাজ্জাজ! আমাদের জাহাজ হিন্দুস্তানের ডাকাতরা লুটে নিয়েছে এবং আরোহী সবাইকে ধরে রাজা দাহিরের রাজমহলে নিয়ে গেছে।

“তাড়াতাড়ি আরোহীকে পানি পান করানো হলো। হাজ্জাজের নির্দেশে তাকে মেহমানখানায় নিয়ে যেতে চাইলে লোকটি বললো, আগে আমার কথা শুনে নাও। পরে শোনার কথা বললে আরোহী বললো, এক্ষুণি আমার কথা শুনে নাও। আমার প্রাণ বায়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। হায়াত আমাকে বেশী সময় দেবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি এক নির্যাতিতা আরব কন্যার ফরিয়াদ বার্তা নিয়ে এসেছি।”

আগন্তুক বললো, সরন্দ্বীপে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। মুসলমানদের জীবনযাত্রা ও তাদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সেখানকার শাসক মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

তিনি মুসলিম খলীফার কাছে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আটটি জাহাজ বোঝাই করে উপহার উপঢৌকন পাঠালেন। এসব উপহার উপঢৌকনের মধ্যে দামী

তৈজসপত্র ছাড়াও ছিলো কিছু হিন্দুস্থানী উন্নত ঘোড়া অন্যান্য গৃহপালিত ও বন্য পশু, কিছু সংখ্যক হাবশী দাস দাসী।

এসব উপহার সরন্দ্বীপের রাজা পাঠিয়েছিলেন সরন্দ্বীপে বসবাসকারী মুসলমানদের দিয়ে। তাদের জাহাজে ছিলো কিছু সংখ্যক আরব ব্যবসায়ী যারা আরব ও হিন্দুস্তানে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যাতায়াত করতেন। তাছাড়া কিছু সংখ্যক মুসলমান পরিবার আরব ভূখণ্ডে তাদের আপনজনদের সাথে সাক্ষাতের জন্যেও রওয়ানা হয়েছিলো। এই নৌকাফেলায় আরো ছিলেন কিছু সংখ্যক উমরার উদ্দেশ্যে সফরকারী মুসলমান। এদের সাথে এমন কিছু যুবক তরুণ-তরুণী ছিলো যারা ভারতে আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে তবে তাদের পিতা-মাতার মূল জন্মভূমি আরব দেশ দেখতে তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলো আরব ভূ-খণ্ডে।

সরন্দ্বীপ ও মালাবার থেকে যেসব মুসলমান আরব দেশে সফর করতো, তাদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো, তারা যেন সিন্ধু এলাকা থেকে অনেক দূর দিয়ে যাতায়াত করে। যাতে তারা সিন্ধু এলাকার নৌ-ডাকাতদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কিন্তু এই আটটি জাহাজ সিন্ধু উপকূলে পৌঁছার আগেই সাগরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলো। বইতে শুরু করলো উল্টো বাতাস। মাল্লারা জাহাজকে আটকাতে বহু চেষ্টা করলো কিন্তু ঝড়ো বাতাসের কারণে আটকানো সম্ভব হলো না। জাহাজকে বাতাসের ধাক্কা সিন্ধু উপকূলে নিয়ে গেলো।

এমতাবস্থায় হঠাৎ সামুদ্রিক তুফানের চেয়ে এসব আরব যাত্রীদের জাহাজকে আক্রমণ করলো আরেক মনুষ্য তুফান। বহুসংখ্যক নৌকায় সওয়ার হয়ে আরব মুসাফিরদের জাহাজে হানা দিলো সিন্ধু অঞ্চলের নৌ-ডাকাতেরা। এরা অনেকগুলো নৌকা নিয়ে চতুর্দিক থেকে আরব জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেললো এবং তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে লম্বা রশি ফেলে আরবদের জাহাজে চড়তে শুরু করলো। এদিকে আরব বনিকদের অধিকাংশেরই কোন অস্ত্র চালনার ট্রেনিং ছিলো না। জনাকয়েক যুবকের হাতে মামুলী অস্ত্র ছিলো, তাই তারা প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হলো ডাকাতের হাতে।

জাহাজের সব ধন-দৌলত ডাকাতরা লুটে নিলো, আরোহীদেরকেও বন্দী করে ফেললো। জাহাজে সফরকারী নারী-পুরুষ, শিশু সহ সবাইকে বন্দী করে ডাভেলের কারাগারে নিয়ে বন্দী করে ফেললো।

হাজ্জাজকে জাহাজ লুটের বিস্তারিত ঘটনা শোনাতে শোনাতে মুসাফিরের আওয়াজ রুদ্ধ হয়ে এলো। কণ্ঠ হয়ে এলো অস্পষ্ট। হাজ্জাজ তার সামনে খাবার ও পানীয় রেখে দিলেন; কিন্তু মুসাফির এই বলে খেতে অস্বীকার জানালো যে, আমি এক আরব কন্যার ফরিয়াদ শোনানো পর্যন্ত বেঁচে থাকবো, এরপর আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

ক্ষীণ কণ্ঠে খুবই কষ্টে মুসাফির বললো, ডাকাতরা আমাদেরকে যখন ডাভেলের উপকূলে নামালো, তখন ওরা আমাদের সবাইকে নির্বিচারে চাবুক মারতে শুরু করে। ওরা আমাদেরকে চাবুক মেরে মেরে তাড়িয়ে নিচ্ছিলো। কিন্তু বনী রাবিয়ার এক তরুণী ডাকাতদের এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পশ্চিম দিকে মুখ করে হাত তুলে চিৎকার করে বললো, হে হাজ্জাজ! আমাদের সাহায্য করো, হে হাজ্জাজ! আমাদের সাহায্য করো।"

"হাজ্জাজ মৃত্যু পথযাত্রী আগন্তুকের কথা শুনে আবেগতাড়িত হয়ে বলে উঠেন— লাব্বাইক ইয়া বিনতি! লাব্বাইক ইয়া বিনতি! হে কন্যা আমি আসছি! হে আত্মজা, আমি অচিরেই তোমার পাশে উপস্থিত হচ্ছি।"

আগন্তুক আরো জানালো, গভর্নর হাজ্জাজ! আপনি জেনে রাখুন, ওখান থেকে কোন বন্দীর বের হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ডাকাতরা যখন দল বেঁধে তাড়িয়ে নিচ্ছিলো, তখন বেলাভূমিতে যাওয়ার পথে অসংখ্য পুরনো নৌকা ছিলো পথিমধ্যে। আমি ছিলাম পিছনের সারিতে। হঠাৎ একলোক আমাকে আরবী ভাষায় ইঙ্গিত করে বললো, এদিকে এসো, লুকিয়ে পড়ো এ ভাঙা নৌকার আড়ালে। আমি এক সাথীর হাত ধরে টেনে নিয়ে একটি বড় ধরনের নৌকার আড়ালে হঠাৎ করে লুকিয়ে পড়লাম। ডাকাত দল অন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। সেই আরব লোকটি মধ্য বয়সী ছিলো।

ডাকাত দল যখন অনেক দূরে চলে গেলো, তখন আরব লোকটি আমাকে জানালো, "আমার নাম বেলাল বিন উসমান। বিদ্রোহী হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আমি স্বেচ্ছায় এ দেশে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি ডাভেলে থাকি না। আমি থাকি এখান থেকে অনেক দূরে রাজা দাহিরের রাজ্যে। আমি রাজা দাহিরের স্ত্রী রাণীর একান্ত প্রহরী। সমুদ্র সফরের জন্যে রাণী এখানে এসেছে। আমি যখন দেখলাম, ডাকাতরা আমার দেশের লোকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাই আমি এদিকে এসেছিলাম। আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না। আমি

তোমাদেরকে দুটো ঘোড়া দিচ্ছি। এতে সওয়ার হয়ে সোজা বসরার শাসকের কাছে পৌঁছে যাবে। হাজ্জাজকে গিয়ে বলবে, এসব ডাকাত রাজা দাহিরের লোক। রাজা দাহির যাকে ডাভেলের শাসক নিযুক্ত করেছে, সে নিজেই ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ডাকাতদের আস্তানা থেকে কোন বন্দীর মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। বেলাল দু'টি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে সন্ধ্যার আগেই আমাকে ডাভেল থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

আমার সঙ্গীর ঘোড়া বিরামহীনভাবে দৌড়ে ক্ষুৎ-পিপাসায় রাস্তায় পড়ে যায়। আমি পিছনে ফিরে দেখলাম, আমার সাথী ঘোড়ার নীচে পড়ে গেছে, আর ঘোড়াটি হাঁপাতে হাঁপাতে মরে গেলো। কিন্তু আমার থেমে গিয়ে ওকে সাহায্য করার সুযোগ ছিলো না। আমি আমার ঘোড়াকে চাবুক মারলাম। যখন আমার ঘোড়াটিও ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে এলো তখন আমি একটি সৈন্য শিবির দেখে ওখানে ঘোড়া বদল করলাম। এরপর পথের আরেকটি সেনা ছাউনী থেকে এ ঘোড়াটিও বদল করে নিলাম। রাস্তায় আমি এক ঢোক পানি পানের জন্যেও থামিনি...। একথা বলেই আগন্তুকের যবান বন্ধ হয়ে গেলো এবং থেমে গেলো ঠোঁটের নড়াচড়া। চোখ দুটো বুজে এলো। দেখতে দেখতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যুর কোলে হারিয়ে গেলো।

অবস্থা দৃষ্টে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মধ্যে এমনই অস্থিরতা সৃষ্টি হলো যে, তিনি অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন এবং রাগে ক্ষোভে দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু করলেন।

তখন আরব সাগরের কুলে অবস্থিত মাকরান ইসলামী শাসনের অধীনস্থ ছিলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন হারুন নাসিরীকে মাকরানের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। রাজা দাহিরের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় খলীফার জন্যে প্রেরিত উপহার উপঢৌকন জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও আরব বংশোদ্ভূত মুসলমান নারী শিশুসহ জাহাজের সকল মুসলমান আরোহীকে জলদস্যুরা রাজা দাহিরের রাজ্যে বন্দী করে রাখার সংবাদ এবং একজন আরব কন্যার ফরিয়াদ ও উদ্ধার অভিযানের আহ্বানের দাস্তান হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জাতিত্ববোধ প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দেয়, চরম প্রতিশোধের আক্রোশে তার দেমাগে আগুন ধরে যায়। তিনি তখনি রাজা দাহিরের নামে একটি চরমপত্র লিখে দূতের মাধ্যমে দাহিরের কাছে পাঠিয়ে দেন।

হাজ্জাজ লিখেন, রাজা দাহির! তুমি তোমার রাজ্যে যেসব আরব মুসলমানকে বন্দী করে রেখেছো, তাদেরকে এই পত্র পৌঁছামাত্র সসম্মানে তাদের জাহাজে সওয়ার করে আরবে ফেরত পাঠাবে। সেই সাথে লুণ্ঠিত মালপত্র, ধন-দৌলত সব একটি জাহাজে দিয়ে দেবে। তাছাড়া যাদের বন্দী করে ক্ষতি করেছো এর ভর্তুকিও দিতে ভুল করবে না।"

হাজ্জাজ তার লিখিত পত্রে খলীফার সীল না লাগিয়ে নিজের সীলমোহর লাগিয়ে পত্রটি দূতের মাধ্যমে রাজা দাহিরের কাছে না পাঠিয়ে মাকরানের শাসক মুহাম্মদ বিন হারুনের কাছে পাঠিয়ে তাকে লিখে দিলেন—তুমি তোমার কোন উর্ধ্বতন অফিসারকে দূতের সাথে পাঠাবে এবং সিন্ধু রাজা দাহিরকে বন্দীদের মুক্তির জন্যে আবেদন করবে না। বরং বলবে আমার পত্র পাওয়া মাত্রই কথা মতো কাজ করলেই তার জন্যে ভালো হবে। হাজ্জাজ একথাও মাকরানের শাসককে লিখে দিলেন, তিনি যেনো মাকরানে গোয়েন্দা ব্যবস্থা আরো তীব্রতর করেন এবং আরো দক্ষ গোয়েন্দা নিয়োগ করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দীর্ঘদিন ধরে রাজা দাহিরের উপর বজ্র হয়ে আঘাত হানার জন্যে একটা উপায় তালাশ করছিলেন। মুসলমানদের জাহাজ লুণ্ঠন হাজ্জাজের হাতে সেই সুযোগ এনে দিলো। জাহাজ লুটের ঘটনা শোনার পর থেকে হাজ্জাজের নাওয়া-খাওয়া, আরাম-আয়েশ নিঃশেষ হয়ে গেলো। প্রতিশোধের অগ্নিস্পৃহা তার হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। তিনি রাজা দাহিরের জবাবের অপেক্ষা না করেই সিন্ধু রাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই রাজা দাহিরের জবাব পৌঁছে গেলো হাজ্জাজের কাছে। দূত জানালো, সে মাকরানের শাসকের দেয়া একজন অফিসারকে নিয়ে রাজা দাহিরের রাজধানী ব্রাহ্মণাবাদে গিয়ে রাজা দাহিরের সাথে সাক্ষাত করে হাজ্জাজের দেয়া পয়গাম পৌঁছায়। রাজা দাহিরের এক দুভাষী তাকে আরবী পয়গাম ভাষান্তরিত করে শোনাচ্ছিলো। পয়গাম শোনার সময় রাজা দাহিরকে দেখে মেনে হচ্ছিলো, সে হাজ্জাজের দেয়া কোন পয়গাম নয় তার কোন বিপন্ন প্রজার আবেদন শুনছে মাত্র। রাজা দাহির পয়গাম শুনে দূতের দিকে তাকিয়ে বললো, আরবদের জাহাজ রাজার লোকেরা লুট করেনি। লুট করেছে জলদস্যুরা, এদের উপর সিন্ধু রাজ্যের শাসন চলে না।

বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফেরেশ্‌তা লিখেছেন-রাজা দাহির হাজ্জাজের পয়গামের জবাবে লিখেছিলো-তোমাদের জাহাজ যারা লুট করেছে এবং লোকজনকে কয়েদ করেছে এরা খুবই লড়াকু দুর্ধর্ষ জাতি। তোমরা এদের কাছ থেকে তোমাদের বন্দী ও মালপত্র ফেরত নিতে পারবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না।" ফেরেশ্‌তা লিখেন, রাজা দাহির প্রকারান্তরে এ কথাই বললো যে, তোমাদের জাহাজ আসলে আমাদের লোকেরাই লুট করেছে। কিন্তু তোমরা এ জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না।

* * *

তখনও পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিককে জাহাজ লুট ও নাগরিকদের বন্দী করার ঘটনা অবহিত করেননি। কিন্তু রাজা দাহিরের জবাব আসার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে দীর্ঘ পয়গাম পাঠালেন, সেই পয়গামে রাজা দাহিরের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাবও গেথে দিলেন। তা ছাড়া তিনি সিন্ধু রাজ্য আক্রমণের জন্যে খলীফার অনুমতি চাইলেন।

খলীফার দরবার থেকে সিন্ধু আক্রমণের অনুমতি দেয়া হলো না। কেন সিন্ধু আক্রমণ করা যাবে না এর পক্ষে কোন কারণ উল্লেখ করেননি খলীফা।

খলীফার নেতিবাচক জবাব পেয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অনুমতির প্রত্যাশায় খলীফার কাছে দীর্ঘ একটি পত্র লিখলেন। এ পত্রে তিনি খলীফাকে উজ্জীবিত এবং তার মধ্যে ইসলামী জাতীয়তাবোধও জাত্যাভিমান জাগিয়ে তোলার জন্যে জাহাজে পাঠানো উপহার উপঢৌকন এবং আরোহীদের মধ্যে থাকা নারী শিশু ও হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সফরকারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। শেষ পর্যায়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খলীফা ওয়ালীদকে লিখলেন—

"আমীরুল মুমেনীন! আপনি হয়তো ভাবছেন, দূরবর্তী এলাকায় নতুন একটি যুদ্ধ শুরু করার কারণে বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে হবে। আমি আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এ যুদ্ধ শুরুর আগে ও পরে যতো ব্যয় হবে আমি এরচেয়ে দ্বিগুণ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবো।"

হাজ্জাজের পীড়াপীড়িতে অবশেষে খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক যুদ্ধের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন।

খলীফার অনুমতি পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে সিন্ধুরাজ্যের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত রাখা সেনা ইউনিটকে। এ অভিযানে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নাবহানকে। আব্দুল্লাহ ইবনে নাবহান সেনাদের নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ধারণাতীত কম সময়ের মধ্যে ডাভেল পৌঁছে গেলেন।

এ অভিযানে হাজ্জাজ একটি মারাত্মক ভুল করলেন। গোয়েন্দারা তাকে রাজা দাহিরের সমরশক্তি ও সেনাদের যুদ্ধ ক্ষমতার সঠিক তথ্য চিত্র দিয়েছিলো কিন্তু অত্যধিক ক্ষুব্ধ থাকার কারণে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের বাহিনীর লড়াই ক্ষমতার সঠিক আন্দাজ করেননি। তিনি তার সেনাদের লড়াই ক্ষমতার উপর বেশী আশ্বস্ত ছিলেন। ভেবেছিলেন ডাভেলেররা পৌত্তলিক এদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোরই সাহস পাবে না। কিন্তু ঘটনা হাজ্জাজের ধারণার বিপরীত ঘটে গেলো।

রাজা দাহির অসতর্ক ছিলো না। সে বুঝতে পেরেছিলো তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আরবরা যে কোন মূল্যে কয়েদীদের মুক্ত করতে তার দেশে আক্রমণ চালাবে। এজন্য সে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রেখেছিলো। মুসলিম বাহিনী পৌঁছার খবর পেয়ে সে সকল সেনাদেরকে দুর্গ বন্দী করে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তুললো। দাহিরের সেনাদের মধ্যে বিচক্ষণ কমান্ডারের অভাব ছিলো না। এরা দুর্গের বাইরে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে রাজাকে রাজী করালো এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু করলো শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়লো মুসলিম বাহিনী। সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে নাবহান প্রথম দিনের যুদ্ধেই আচমকা এক আঘাতে নিহত হলেন ফলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

সেনাপতির অবর্তমানে সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে নাবহান শত্রুদের মোকাবেলায় কোন ত্রুটি করেননি কিন্তু তার মৃত্যুটা ছিলো একটা দুর্ঘটনা। সেনাপতির মৃত্যুর ফলশ্রুতিতে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যখন হতাশা ছড়িয়ে পড়লো এর পূর্ণ সুযোগ নিলো দাহিরের বাহিনী। তারা আরো প্রবল বিক্রমে আঘাত হানলো। সেনাপতি হারা বাহিনী আঘাতের তীব্রতা সামলাতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হলো। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয় হাজ্জাজের জন্যে বয়ে আনলো মারাত্মক বিপর্যয়।

অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয়ের দুঃখ গ্লানি হাজ্জাজ হজম করে নিলেন বটে কিন্তু এ পরাজয় তার ঘুম, নাওয়া-খাওয়া, আরাম স্বস্তি সবই দূর করে দিলো। স্বভাবতই

হাজ্জাজ ছিলেন কঠিন হৃদয়ের মানুষ। সেই সাথে আগ্রাসী। তার স্বভাব চরিত্রে ক্ষোভ ও গযব ছিলো রক্তের শিরায় শিরায় মেশানো। হাজ্জাজ যখন কারো বিরুদ্ধে ক্ষেপে যেতেন তখন মনে হতো তার হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশমাত্র নেই। মায়া মমতা কি জিনিস এটা বোধ হয় হাজ্জাজ কখনও বুঝেননি। খেলাফতের যেসব বিদ্রোহী ভয়ে আরব দেশ ত্যাগ করে আরব সাগরের এপারে এসে মাকরানে বসতি স্থাপন করেছিলো, তারা কোন না কোন শর্তে খলীফার আনুকূল্যে দেশে ফিরে যেতে পারতো। কিন্তু তাদের কেউ হাজ্জাজের ভয়ে বাগদাদে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করারও সাহস করতো না। কারণ তারা জানতো খলীফা তাদের বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেও হাজ্জাজ তাদের কখনও ক্ষমা করবে না।

যে হাজ্জাজের নির্মমতা ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে খলীফা নিজেও গুণে গুণে তার সাথে কথা বলতেন, সেই হাজ্জাজের পক্ষে এতো বড় পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করা ছিলো খুবই দুরূহ ব্যাপার। হাজ্জাজ যখন খবর পেলেন, তার পাঠানো সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে দাহির বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে এবং সেনাপতি নাবহান মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তিনি সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলকে ডেকে তাকে ডাভেল আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে বললেন—

"তোমাকেও যদি রণাঙ্গন থেকে পিছপা হতে হয়, তাহলে এদিকে আর ফিরে এসো না। যেসব বিদ্রোহী মাকরানে বসতি গড়েছে, ওদের ওখানে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিও। কারণ ওদের জন্যে আরবের দরজা বন্ধ। ওখানে গিয়ে মরে যেয়ো। আমি যে কোন মূল্যে রাজা দাহিরের কব্জা থেকে ডাভেলের দুর্গ ছিনিয়ে আনতে চাই, সেই সাথে চাই দাহিরের মৃত কিংবা জীবিত দেহ। এর বিকল্প অন্য কিছু আমার দরকার নেই।"

"আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হোক ইবনে ইউসুফ! বললেন সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল। আমি ডাভেল ফেরত সৈন্যদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সেনাপতি আব্দুল্লাহ রণাঙ্গনে পিঠ দেখায়নি। সাহসিকতার সাথে সে শত্রুদের মোকাবেলা করেছে। সে দাহির বাহিনীর মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে ওদের মধ্যভাগে ঢুকে পড়েছিলো। কিন্তু রাজা দাহিরের ছিলো হস্তি বাহিনী। ওরা হাতির উপর থেকে অসংখ্য তীর বৃষ্টি ছুড়ে তাকে ঘায়েল করে ফেলে।

মুহতারাম ইবনে ইউসুফ! আপনি ইরাকের শাসক। আব্দুল্লাহ্‌র বাহাদুরী ও মৃত্যুকে কাপুরুষতার ভারতীয় আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দিবেন না। মৃত্যু যে কোন

মানুষের জীবনে যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। আল্লাহর কুদরতকে নিজের কব্জায় নেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হোন সম্মানিত আমীর!"

"আল্লাহর কসম করে বলছি ইবনে তোফায়েল! তোমার এই সাহসিকতার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আসলে পরাজয়ের গ্লানি ও প্রতিশোধের আগুন আমাকে এমন ভয়ানক কুফরী কথার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন।"

বুদাইল! তুমি একটু ভেবে দেখো। আমার সিন্ধু অভিযানে খলীফা মোটেও রাজি ছিলেন না। তাকে অনেক ফুসলিয়ে রাজি করিয়েছি। এই ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয়ের খবর পেয়ে তিনি আমাকে যে পয়গাম পাঠিয়েছেন, তা আমার মাথাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, "ইবনে ইউসুফ! আমি সিন্ধু অভিযানে সম্মতি না দেয়ার কোন কারণ উল্লেখ না করায় আপনি রুষ্ট হয়েছিলেন। এখন বুঝলেন তো কেন আমি এতোদিন আপনাকে সিন্ধু অভিযানের অনুমতি দেইনি?" পুনর্বার আমাদের অভিযানের জন্যে কি খলীফার অনুমতি পাওয়া যাবে? হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করলো সেনাপতি বুদাইল।

"কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই আমার। এটা আমার পরাজয়, এটা ইসলামের পরাজয়। এ পরাজয়কে অবশ্যই বিজয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। আমি আমীরুল মুমেনীনকে বুঝাতে চাচ্ছি, সিন্ধু এলাকার অধিকার কেন আমাদের জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে।

বুদাইল! তুমি নিজেও বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করো। আমি এখন দু'জনের পরাজয়ের শিকার। রাজা দাহিরের কাছেই শুধু আমি পরাজিত হইনি, খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের দৃষ্টিতেও আমি পরাজিত। তুমিও যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, তাহলে জীবনের জন্যে আমার হাতপা অকার্যকর হয়ে যাবে, আর আরব সাগরের ওপারে সরন্দীপ (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) ও মাকরানে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে আরো অসহায় করে তুলবে। এরপর দেখবে হিন্দুস্থানের জলদস্যুরা কোনকিছুর তোয়াক্কা না করে অবাধে তাদের জাহাজ ও ঘরবাড়ি লুটতরাজ করে তাদের ধরে ধরে গোলাম বাঁদী বানাবে, তাদেরকে করতে থাকবে বন্দীশালায় বন্দী।"

"না, এমনটি হবে না, ইবনে ইউসুফ!" বললো বুদাইল বিন তোফায়েল।

এ কথা একটু চিন্তা করো বুদাইল! আমার ধর্মের এক নির্যাতিতা কন্যা আমাকে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছে। বন্দীদশা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার

জন্যে ডাক দিয়েছে। সেই নির্যাতিতা আরব কন্যার ফরিয়াদ এখানে নিয়ে আসা লোকটি আমার সামনে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা গেছে। সে আমার কাছে খবর পৌঁছানোর দায়িত্ব জীবন দিয়ে পালন করেছে। কিন্তু আমি যদি এর পরও স্বজাতির এসব নির্যাতিতা নারী শিশুদের উদ্ধারে তৎপরতা না চালাই, কেয়ামতের দিন আমি ওদের সামনে কোন্ মুখে দাঁড়াবো!"

* * *

বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলকে পুনরায় আক্রমণের জন্যে ব্রিফিং দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজা দাহির তার রাজধানী অরুঢ় এ তার খাস কামরায় উপবিষ্ট। তার সামনে মাকরানে বসতি স্থাপনকারী আশ্রিত মুসলিম নেতা হারেস আলাফীকে ডেকে এনেছিলো। দাহির বাহিনীর হাতে সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন নাবহানের মৃত্যু ও মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের পর এটাই দাহির ও আলাফীর প্রথম সাক্ষাত।

"শাইখ আলাফী! তোমাদের শত্রুকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, এতে তুমি কী খুশী হওনি?"

"না মহারাজ! এ পরাজয়ে আমরা খুশী হতে পারি না। এটা শুধু শাসকগোষ্ঠী বনি উমাইয়ার পরাজয় নয়। এটা মুসলমানদের পরাজয়। ইসলামের পরাজয়।" বললো আলাফী।

"তাহলে তো আমাদের বিজয়েও তোমরা খুশী হতে পারোনি।" বললো রাজা দাহির।

"মহারাজ! আপনার চেহারা ছবি, আপনার দৃষ্টি অভিব্যক্তি বলছে, আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চান। এসব উপকথার চেয়ে কি এটা ভালো হয় না, যে কথা বলার জন্যে আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে আলোচনা শুরু হোক।"

"ঠিকই বলেছো আলাফী! বললো রাজা দাহির। আমি একটা জরুরী কথা বলার জন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি আমাকে পরামর্শ দাও, আরবরা কি পুনর্বার আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে?"

"আরববাসীর আত্মমর্যাদাবোধ যদি মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে পুনর্বার হামলা করাটা নিশ্চিত বলা যায়। খলীফা হয়তো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কট্টরপন্থী ও নির্মমতার জীবন্ত মূর্তি। সে অতো সহজে এ

লজ্জাজনক পরাজয় হজম করে নেবে না। এবারের যুদ্ধে সে আপনার সমরশক্তির একটা সঠিক আন্দাজ করে নিতে পারবে। পুনর্বার আক্রমণ করলে সে কোন মতেই পরাজয় বরণ করতে আসবে না।"

"তখন কি তোমরা আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না?"

"না, মহারাজ! আমরা যেখানেই থাকি না কেনো, আমাদের ঠিকানা আরব দেশ। আমরা এখানে আশ্রিত হলেও স্বজাতি ও স্বদেশীদের বিরুদ্ধে আমরা তরবারী ধরতে পারবো না।"

"আরব বাহিনী যদি পুনর্বার আক্রমণ করে, তাহলে তোমাদের সহযোগিতা আমাদের খুব প্রয়োজন হবে। এ সহযোগিতার জন্যে তোমরা যে প্রতিদান চাও, আমি তাই তোমাদের দেবো। তোমরা যদি চাও, তাহলে যে এলাকায় তোমরা থাকো সেটি তোমাদের জন্যে স্বাধীন করে দিতে পারি। তখন সেটি হবে একান্তই তোমাদের রাজ্য।"

"আমরা আপনাকে এতটুকু সহযোগিতা করতে পারি যে, আমরা আপনার বিরুদ্ধে তরবারি ধরবো না। আমরা নিরপেক্ষ থাকবো।" বললেন আলাফী।

"একটু ভেবে চিন্তে বলো আলাফী! ধমকির স্বরে বললো রাজা দাহির। আমি তোমাদেরকে এখানে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের আবার ঠিকানা ছাড়া করতে পারি। যেভাবে আবাদ করেছি, সেইভাবে বরবাদও করতে পারি। তোমাদেরকে আমরা দেশ থেকে বের করে দিতে পারি, কয়েদখানায় বন্দী করতে পারি।"

"মহারাজ! আমাদের ব্যাপারে কোনকিছু করার আগে আপনার উজির বুদ্ধিমানের সাথে পরামর্শ করে নিন।" বললেন আলাফী। আমি আবারো আপনাকে বলছি, আমরা আপনাকে এ সহযোগিতা করতে পারি যে, আপনার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে শরীক হবো না আর আপনার পক্ষেও যুদ্ধ করবো না। আমরা থাকবো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আপনার একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আপনি যাদের লুট করেছেন, এদের সাথে আমাদের লোকজনও রয়েছে। রয়েছে নারী শিশু বৃদ্ধ ও অসহায় লোক। আপনি আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। এর বিপরীতে আমরা আমাদের লোকজনকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে পারি। আপনি তো শুধু হুমকি দিয়েছেন। আমরা বাস্তবে ঘটিয়ে দেখাতে পারি।"

"আমি তোমাদেরকে একথা কিভাবে বিশ্বাস করাবো, বন্দীরা কোথায় রয়েছে আমি তা জানি না। আমি কাউকেই জাহাজ লুট করার নির্দেশ দেইনি। জাহাজ লুণ্ঠনকারীরা অত্যন্ত লড়াকু জাতির লোক। তোমরাও জাহাজ লুটের জন্যে আমাকে অভিযুক্ত করলে? এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের উপর আর আমার ভরসা করা ঠিক হবে না।"

আলাফী দাঁড়িয়ে গেলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "মহারাজ! আমরা আপনার সবচেয়ে প্রতাপশালী শত্রুকে যেভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম এরা পুনর্বার আপনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করতেও ভয় পাবে। হিন্দুস্তান থেকে যদি আপনার বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে আমরা তাদেরকে চিরদিনের জন্যে খতম করে দিতে পারবো। কিন্তু আমরা আরব আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবো না। আপনাকে বুঝতে হবে, আমাদের বিরোধ শাসকদের সাথে; ধর্ম জাতি ও সালতানাতের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই।"

"এতে পার্থক্য আর কি রইলো?" বললো দাহির। রাজা আর রাজ্যের মধ্যে তো কোন তফাত নেই। যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাকে আমি রাজ্যের দুশমন, দেশ জাতির শত্রু ও বিদ্রোহী মনে করবো।"

"ইসলামী শাসনে কোন রাজা থাকে না।" বললেন আলাফী। এখানকার খলীফাকে কখনো রাজা মনে করা হয় না আর নাগরিকদেরকে কখনও প্রজা ভাবা হয় না। কেউ যদি খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাকে খলীফা খেলাফত ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে অভিহিত করতে পারে না। এসব কথা থাক মহারাজ! আমি আপনাকে আবারো বলছি, আমরা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবো না।"

কথা শেষ করে হারেস আলাফী রাজার কোন কথা শোনার অপেক্ষা না করেই সেখান থেকে চলে এলেন। রাজমহলের বাইরে তার ঘোড়া অপেক্ষমান। তিনি অশ্বারোহণ করে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর এক লোক হঠাৎ তার পথ আগলে 'আসসালামু আলাইকুম' বললে আলাফী ঘোড়া থামিয়ে দিলেন।

"কে তুমি?" স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন আলাফী।

"আপনার স্বদেশী। আরবী ভাষায় জবাব দিলো লোকটি। আমার নাম বেলাল বিন উসমান।"

"আল্লাহর কসম! তোমার চোখের দৃষ্টিতে আমি মরুভূমির ঝিলিক দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি এখানে কিভাবে এলে? কি করছো?"

"আমি রাজমহলের নিরাপত্তা রক্ষী।" বললো বেলাল। বনী উসমান কবিলার ছেলে আমি। আপনি কি আমার বাবা উসমান বিন হিশামকে চিনতেন?"

"এসো বেটা, এসো। আমরা যখন দেশ ছেড়েছি, তখন তুমি হয়তো খুবই ছোট ছিলে...। তোমার বাবাতো পাহাড় চিড়ে কলিজা বের করে আনতে পারতেন। একমাত্র আল্লাহ্কে ভয়কারী এই মানুষটিকে সমীহ্ করতো না এমন মানুষ তখন আরবে ছিলো না। তিনি বিশেষ কোন নেতা ছিলেন না বটে; কিন্তু নেতারাও তার সামনে মাথা হেট করে দিতো।...যাক সেসব কথা। এখন বলো তো! এখানে কিভাবে এলে? আর আমাদের কাছে এলে না কেন?"

বেলালের ইঙ্গিতে দিলে আলাফী ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। এবং উভয়েই একত্রে হেঁটে এগুতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে বেলাল আলাফীকে জানালো, কিভাবে সে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কেমন করে রাজমহলের নিরাপত্তারক্ষী নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু মায়ারাণীর সাথে একান্ত সম্পর্কে কথা আলাফীর সাথে চেপে গেলো বেলাল।

"যাক, আমি যে জন্যে পথ রোধ করে আপনাকে থামিয়েছি, সে কথা বলছি। কিন্তু ভয় করছি, আপনি রাজার উপকার ভোগী। রাজা দাহির আপনাদের উপর এতো বেশী অনুগ্রহ করেছে, যার ফলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, রাজ আনুকুল্যের চাপে আপনারা তলিয়ে গেছেন কি-না!"

"এমন আশংকা কেনো করছো ইবনে উসমান!"

"আমি দেখেছি, কাফেরদের অনুগ্রহে অনেকের ঈমান চাপা পড়ে যায়।...আমি আপনার উদ্দেশ্যে এসব কথা এ জন্যে বলছি, রাজা দাহির আরবদের জাহাজ লুট করিয়েছে এবং আরব শিশু কন্যাসহ মুসলমান হজ্জ যাত্রীদেরকে বন্দী করে রেখেছে। আরব সৈন্যদের আক্রমণে আশা করেছিলাম বন্দীরা মুক্তি পাবে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা গুঁড়িয়ে দিয়ে আরব বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।"

"আরে বাবা! তুমি আসলে কি বলতে চাও, সে কথা বলো। যেসব বিষয় আমি তোমার চেয়েও ভালো জানি, সেসব কথা আমাকে বলার দরকার কি?"

"হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি, বন্দীদের উদ্ধারের জন্যে আপনি কি কিছু করবেন? বনী উমাইয়ার প্রতি আপনার ক্ষোভ ও ঘৃণা কি নির্যাতিত নিরপরাধ লোকগুলোর সাহায্য করতে বাধা দিচ্ছে?"

বেলালের সংশয় ও শংকা দূর করতে আলাফী রাজা দাহিরের সাথে তার কথোপকথন ও তার সর্বশেষ অবস্থানের কথা জানালেন।

"আমার মনে হয় খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক একটি পরাজয়েই এখানকার বন্দী মুসলমানদের কথা ভুলে গেছে।"

"খলীফা ভুলে যেতে পারে; কিন্তু হাজ্জাজ ভুলবে না। আমি তাকে ভালোভাবে চিনি। সে খুনের বদলা খুনের বিনিময়েই নিয়ে থাকে।"

"কিন্তু আমি হাজ্জাজের আক্রমণের অপেক্ষা করবো না। আপনি তো জানেন, কেমন বাবার রক্ত শরীরে বহন করছি। এতোদিন পরামর্শ নেয়ার মতো কাউকে পাইনি আমি। আজ রাজমহলে আপনার আসার কথা শুনে পূর্ব থেকেই অপেক্ষায় ছিলাম। রাজমহল থেকে আপনাকে বের হতে দেখেই আমি আপনার সাথে কথা বলার জন্যে পথ আগলে দাঁড়িয়েছি।"

"তা তো বুঝলাম! কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি কি করতে চাও?"

"আমি বন্দীদেরকে মুক্ত করতে চাই।" বললো বেলাল। কিন্তু কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে তারা যাবে কোথায়? আপনি কি তাদের আশ্রয় দিতে পারবেন?

"ইবনে উসমান! তুমি যদি বন্দীদের মুক্ত করতে পারো, তাহলে তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি তাদেরকে জায়গা করে দেবো এবং সুযোগ মতো তাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো-তুমি এদেরকে মুক্ত করবে কিভাবে?

"এজন্যে আমাকে রাতের বেলায় কয়েদখানায় প্রবেশ করতে হবে। হয়তো জীবনবাজী রাখতে হবে। এমনও হতে পারে যে, আমরা কয়েদখানায় প্রবেশ করে আর কোনদিনই বাইরে আসার সুযোগ পাবো না।"

"তোমরা কতোজন?"

"তিন চার জনের বেশী নয়।" বললো বেলাল।

বেলাল ও আলাফী হাটতে হাটতে কথায় কথায় বন্দীদের মুক্ত করার পরিকল্পনা তৈরী করলো। এমতাবস্থায় দুর্গের প্রধান ফটক এসে গেলো। আলাফী

বেলালকে বললেন—এখন আর আমার সাথে যাওয়া তোমার ঠিক হবে না, দুর্গের ভিতরেই তুমি থেকে যাও।"

বেলাল যখন প্রাসাদে ফিরে আসছিলো, তখন তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো দাহিরের বন্দীশালা থেকে বন্দীদের মুক্ত করার পরিকল্পনা। কারণ আলাফী তাকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই সাথে সুন্দর পরিকল্পনাও দিয়েছেন। মায়ারাণীর প্রতি বেলালের মনে খুবই ক্ষোভের সঞ্চার হলো। বেলাল অনেকবার মুসলিম বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে মায়ারাণীকে রাজা দাহিরের কাছে প্রস্তাব করার কথা বলেছে। কিন্তু প্রতিবারই মায়ারাণী তাকে একথা বলে নাকচ করে দিয়েছে যে, রাজা দাহিরের উপর তার কোনই প্রভাব নেই। রাজা এ ব্যাপারে কারো কথা শুনবে না। রাজ কাজে নাক গলানো রাজা মোটেও পছন্দ করে না।"

মায়ারাণীর আগের সেই রূপ সৌন্দর্য নেই। এতোদিনে সে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মায়রাণীর বয়স বাড়লেও বুড়িয়ে যায়নি। রাজকীয় আরাম আয়েশে থাকার কারণে শরীরের কাঠামো একটুও ভাঙেনি। এখনও প্রায়ই মায়ারাণী বেলালকে একান্তে ডেকে নিয়ে বহুক্ষণ কাছে রাখে। কিন্তু বেলালের এই অনুরোধ না রাখায় বেলাল মায়ারাণীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বেলাল মায়ারাণীকে তাদের ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলেছিলো, বিষয়টি রাজার কাছে উত্থাপনের জন্যে। কিন্তু বেলাল বুঝতে পারলো মায়ারাণী আসলেই রাজার কাছে অসহায়। একদিকে বেলাল ও আলাফী বন্দীদের মুক্ত করার জন্যে পরিকল্পনা করেছে, আর অপর দিকে বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার সেনাপতি বুদাইলকে অভিযানের শেষ দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। হাজ্জাজ বলছিলেন-বুদাইল! তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছো, সিন্ধু অভিযানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কতখানি? আমি অনেক আগেই সিন্ধু অঞ্চলের উপকূল দখল করতে চেয়েছিলাম। আশা করি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছো তুমি।"

"হ্যাঁ ইবনে ইউসুফ! আমি বুঝতে পেরেছি, সিন্ধু উপকূলে আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেই শ্রীলংকা ও মাকরানে আমাদের জাহাজ নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে।" বললেন সেনাপতি বুদাইল।

"আল্লাহর কসম! তুমি আমার মনের কথাই বলেছো বুদাইল! তুমি হয়তো জানো, আমীরুল মুমিনীন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি সিন্ধু আক্রমণের ঘোর বিরোধী। তিনি নির্বিবাদে হুকুমত করতে চান। আসলে অত্যধিক শান্তিকামিতা

দুশমনকেও দোস্ত বানিয়ে ফেলে। অত্যধিক শান্তিপ্রিয় মানুষ এটা বুঝতেই চায় না আদর্শিক দুশমন কখনো বন্ধু হতে পারে না। দুশমনই থেকে যায়। তুমি তো জানো, আমীরুল মুমেনীন আমাকে সিন্ধু অভিযান থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, আমি এখন তার অনুমতি ছাড়াই পুনর্বার অভিযান চালাবো।"

"এতে আমীরুল মুমেনীন বিগড়ে যাবেন না তো?" জিজ্ঞেস করলেন সেনাপতি বুদাইল।

"বিগড়ে গেলে যাক। আমিরুল মুমেনীনের সন্তুষ্টির চেয়ে আমার কাছে জাতির সম্মান বেশী গুরুত্বপূর্ণ। খেলাফতের মসনদে বসে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বুঝতেই পারছেন না, আজ যদি আমরা এক ব্রাহ্মণ রাজার দাপটে এভাবে চুপসে যাই, তাহলে দু'দিন পরেই সে আমাদের সাথে টোকাটুকি শুরু করে দেবে। ব্রাহ্মণদের মেজাজ আমি জানি। যে নিজের সহোদর বোনকে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্যে নিজের বউ বানিয়ে রাখতে পারে, ওর উপর কিভাবে আস্থা রাখা যায়?"

"একটি বিষয় তো আপনি ভাবেননি ইবনে ইউসুফ।" বললেন সেনাপতি বুদাইল। সিন্ধু রাজা দাহির তার দেশে পাঁচশ বিদ্রোহী মুসলমানকেও আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। শুনলাম ওইসব আরবরা তার পক্ষে একটি যুদ্ধও করেছে এবং রাজা দাহিরের প্রবল শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। এমন আশংকা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না, খেলাফতের শত্রু এসব বিদ্রোহী মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধেও হাতিয়ার তুলে নেবে?"

"তা হতে পারে।" বললেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আমি ওদের খবর নেয়ার জন্যে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছি। এখনও পর্যন্ত এমন কোন খবর আসেনি যে, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেবে। এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও আমাদের এজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ এরা আমাদের বিদ্রোহী, আমাদের বিরুদ্ধে দুশমনদের পক্ষ নেয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে আমরা দ্বীপান্তর করেছি। আর কিছু স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করেছে। এদের মনে উমাইয়ার শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে। এই ঘৃণা ও ক্ষোভ তাদেরকে বিরোধিতার প্ররোচনা দিতে পারে। এটা মনে রেখেই আমাদের অভিযান পরিচালনা করতে হবে।"

"হ্যাঁ ইবনে ইউসুফ। আমি এ পরিস্থিতির জন্যে তৈরী। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। যেদিন থেকে মুসলমানদের তলোয়ার পারস্পরিক সংঘাতে

ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে, উম্মতের অধঃপতন সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে। যেই আমার সামনে আসুক না কেন, আমি তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে কসুর করবো না। কিন্তু আমার ভয় হয়, মুসলমান ভাইদের শিরে তরবারী চালাতে আমার হাত কাঁপে কি-না।"

"তার মানে হলো, তখন তোমার প্রতিপক্ষ মুসলমান ভাই তোমার শরীর থেকে তোমার মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাই না?" বললেন হাজ্জাজ। শোন বুদাইল! খলীফার অনুমতি না নিয়েই এতো দূরের ঝুঁকিপূর্ণ একটি অভিযান চালাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি নিছক আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়; মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত স্বার্থে। মুসলমানদের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে।

বুদাইল! তোমার মনে রাখতে হবে, মসনদ টিকিয়ে রাখতে খলীফা ওয়ালিদ যদি তার সহোদর ভাইকে গলাটিপে হত্যা করতে পারে। মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে আমি কিছু লোকের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবো না। আমি খেলাফতের বিশ্বস্ত তা ঠিক, তবে নিজের অবস্থানকে আমি অবশ্যই এতোটুকু মজবুত করতে চাই যাতে খলীফা আমার ব্যাপারে নাক গলাতে চিন্তা-ভাবনা করে।...একথাও মনে রাখবে ইবনে তোফায়েল! তোমার ভাগ্য এখন আমার হাতে। তুমি যদি সিন্ধু জয় করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করবো।"

"হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তৎকালীন খলীফার সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কিন্তু খলীফার মতো তিনি দোস্ত-দুশমন চিনতে ভুল করতেন না। কারা তার শত্রু, তা তিনি চিহ্নিত করতে ভুল করতেন না। অনুরূপ মুসলমানদের জাহাজ লুণ্ঠনকারী রাজা দাহিরকে চরম শিক্ষা দিতে তিনি চরম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে পাগলপ্রায় করে তুলেছিলো।

"ইবনে তোফায়েল! সেনাপতি বুদাইলের উদ্দেশ্যে বললেন হাজ্জাজ। তুমি আর আম্মান ফিরে যাবে না। তোমাকে মাত্র তিনশ অশ্বারোহী দিচ্ছি। আমি মাকরানের শাসক মুহাম্মদ বিন হারুনকে পয়গাম পাঠিয়েছি, সে তোমাকে তিন হাজার সৈন্য দেবে। তুমি সোজা মাকরানে চলে যাবে। সেখানে গেলে মুহাম্মদ বিন হারুন তোমার ওখানে করণীয় কি তা বলে দেবে। আমার সকল গোয়েন্দা কর্মীরা তার সাথে যোগাযোগ রাখে সে।

রাজা দাহির তার উজির বুদ্ধিমানকে ডেকে পাঠালো।

"বিজ্ঞ উজির কি ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?" উজিরকে জিজ্ঞেস করলো রাজা দাহির। উজির কি মনে করেন, আরব দেশের দিক থেকে আরেকটা তুফান আসবে?"

"তুফান আসাটা তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা মহারাজ! তুফান কখনো পূর্বদিক থেকে আসে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আসে। তুফান যেদিক থেকেই আসুক না কেন, সেটা লক্ষণীয় বিষয় নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমরা সেই তুফান মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি কতটুকু নিয়েছি। আমি একথা বলতে পারি, আরব দেশ থেকে একটা ঝড় অবশ্যই আমাদের দিকে আসবে, এজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে মহারাজ!"

"রমলের রাজার আক্রমণ প্রতিরোধে তুমি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলে আশ্রিত আরব মুসলমানদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য। তোমার পরামর্শে আমি তাদের সহযোগিতা চাইলে তারা রমলের বাহিনীকে শোনচীয়ভাবে পরাজিত করেছিলো। এবার সম্ভাব্য আরব আক্রমণে আমি আরব সর্দারকে ডেকে এনে সহযোগিতা চেয়েছিলাম। আরব সর্দার আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সে আমাকে উল্টো আরব বন্দীদের মুক্ত করে দিতে বলেছে। আরো জানিয়েছে, মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। এখন তুমিই বলো, এদের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? আমি কি এদের অকৃতজ্ঞতার স্বাদ বুঝিয়ে দেবো?"

"না মহারাজ! বললো উজির। শত্রু সংখ্যা বাড়াবেন না। এদেরকে শত্রু বানালে এরাও সুযোগ বুঝে পিছন দিক থেকে আঘাত হানবে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব আরো মজবুত করুন, আর গোয়েন্দা লাগিয়ে ওদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করুন। অবশ্য এদেরকে বন্ধু মনে করে কখনো বিশ্বাস করবেন না। মুসলানদেরকে সব সময় শত্রু ভাবতে হবে। সেই সাথে ওদেরকে মাকরানেই সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ করুন। তাদেরকে যদি অবাধ যাতায়াতের অনুমতি দেন, তাহলে তারা ইসলামের প্রচার করতে শুরু করবে। আসলে এরা এমন শত্রু যে শত্রু মহারাজের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠছে। আর এটি এমন অন্ধকার যে অন্ধকার মহারাজের প্রদীপের নীচেই বিরাজ করছে।"

"এরা যদি আরব আক্রমণকারীদেরকে গোপনেও কোন সহযোগিতা করে, তাহলে আমি ওদের সবাইকে খুন করে ফেলবো। সিন্ধু ও সারা ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু ধর্ম থাকবে, আর কোন ধর্ম থাকবে না।" বললো রাজা দাহির।

“বন্দীদের ছেড়ে দিলে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে এ নিয়ে কি মহারাজ কোন চিন্তা ভাবনা করেছেন?” বললো উজির।

“না উজির! এ নিয়ে আমি কোন চিন্তা-ভাবনা করিনি।” বললো রাজা দাহির। বন্দীদেরকে আমি মুক্ত করে দিলে আরব শাসকরা আমাকে দুর্বল ভাবতে থাকবে। তাছাড়া আমি আরব দূতের কাছে তো অস্বীকার করেছি বন্দীরা আমার নাগালের ভিতরে নেই, আমি তাদের বন্দী করিনি। এখন আমি কোন মুখে ওদের মুক্ত করে ওরা আমার কাছেই বন্দী ছিলো একথা প্রমাণ করতে পারি। না, এটা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বন্দীদের বাকী জীবন বন্দীশালাতেই কাটাতে হবে।”

* * *

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আরব মুসাফিরদেরকে অরুঢ়ো এক দুর্গসম বন্দীশালায় বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। বন্দীশালার প্রশাসকের নাম ছিলো কুবলা। সে মুসলমান ছিলো না। রাজা দাহিরের সময় অরুঢ়ের জেলখানা ছিলো খুবই বিখ্যাত। বন্দীশালার ভিতরটি ছিলো বিশাল। এতে কোন মানুষকে ঢুকানো হতো, তখন সে আর সভ্য জগতের বাসিন্দার মধ্যে গণ্য হতো না। বন্দীশালায় কয়েদীদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হতো যা সভ্য জগতের মানুষ ভাবতেও শিউরে উঠতো।

বন্দীশালার একটি গারদখানায় ছিলো অনেক কক্ষ। আরব বন্দীদেরকে এসব কক্ষে রাখা হয়। একেকটি কক্ষে এক একটি রাখা হয়েছিলো কবিলা।

সে রাত ছিলো বন্দীদের প্রথম রাত। মধ্য রাতের পর বন্দীশালার দারোগা বন্দীদের দেখতে এলো। বন্দীদের যখন কয়েদখানায় ঢুকানো হচ্ছিলো কয়েদখানার দারোগা কুবলা তাদের দেখেছিলো। বন্দীদের মধ্যে ছিলো যুবতী সুন্দরী তরুণী। এদের দেখার উদ্দেশ্যেই রাতের দ্বিপ্রহরে দারোগা কুবলা বন্দীশালায় নতুন বন্দীদের দেখতে এসেছিলো। কুবলা বন্দীশালার বন্দীদেরকে নিজের কেনা গোলাম বাঁদী ভাবতো। কোন বন্দী কোনদিন কুবলার কাছ থেকে কোন মানবিক আচরণের প্রত্যাশা করতো না। আরব মুসাফির বন্দীরা মুসলমান হওয়ার কারণে অমুসলিম কুবলার কাছ থেকে সদাচারের প্রত্যাশা করার কোনই অবকাশ ছিলো না।

মাটির নীচের বন্দীশালার সিঁড়িতে পৌছলে কুবলার কানে ভেসে এলো ক্ষীণ আওয়াজের গণসঙ্গীতের মতো আওয়াজ। কুবলা আওয়াজ শুনে থেমে গেলো এবং আওয়াজটি বুঝার চেষ্টা করলো। সমবেত কণ্ঠের এ আওয়াজ তার ভালো লাগলো। সাধারণ বন্দীদের শিকলের আওয়াজ, চাবুক পেটানোর শব্দ ও বন্দীদের চিৎকার শুনতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু জাহান্নাম সদৃশ এই জিন্দানখানায় সঙ্গীতের মতো মিষ্টি মধুর আওয়াজ নির্মম নিষ্ঠুর কুবলার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো।

তখন কুবলার সাথে বন্দীশালার কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলো। কুবলাকে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো।

"এরা আজকের আনা নতুন কয়েদী। যখন থেকে এদেরকে এখানে আনা হয়েছে তখন থেকেই ইবাদত করছে।" বললো এক কর্মকর্তা।

কুবলা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামতে লাগলো। যতোই এগুতে লাগলো তার কানে গুঞ্জন আরো বেশী পরিষ্কার হয়ে উঠলো। আরো বেশী আকর্ষণীয় মনে হতে থাকলো। জেলখানার ছোট্ট কক্ষগুলোর সামনে দিয়ে কুবলা পায়চারী করতে থাকে। কোন কক্ষে ছিলো দু'জন বন্দী, কোন কক্ষে তিনজন আবার কোন কক্ষে গোটা একটি দল। বন্দীরা সবাই কিবলামুখী হয়ে কলেমা তাইয়্যেবা জপছে। তাদের কেউ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজনবোধ করেনি, কে এসেছে?

কুবলা শেষ কক্ষের পাশে গিয়ে এক প্রহরীর কানে কানে কি যেন বললো। প্রহরী চেচিয়ে বললো, "সকল বন্দী খামোশ হয়ে যাও। জেলার সাহেব সবার উদ্দেশ্যে কথা বলবেন।"

বন্দীরা নীরব হয়ে গেলো। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কেউ কেউ। ক্ষোভ, ঘৃণা ও নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠলো কয়েকজন। তাতে এতোটাই শোরগোল শুরু হয়ে গেলো যে কে কি বলছে কিছুই বোঝা গেলো না। কক্ষগুলোর দরজা ছিলো তালাবদ্ধ, প্রহরীরা লোহার ডান্ডা পেটাতে লাগলো। কিন্তু চেচামেচি নিয়ন্ত্রণে আনার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিলো না।

"সবাই একসাথে চেচামেচি করলে তো কিছুই শোনা যাবে না। তোমাদের একজন কথা বলো।" গম্ভীর কণ্ঠে বললো কুবলা। আমি তোমাদের কাছে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"এদিকে এসো।" কুবলাকে নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন এক আরব বৃদ্ধ। কে তুমি? কথা যা বলার আমার কাছে বলো।"

কুবলা বৃদ্ধের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো বৃদ্ধ বললো, "তুমি কি এই কয়েদখানার জেলর? এটা কেমন জুলুম বলো, আমাদের কেন কয়েদখানায় বন্দী করা হলো?"

"আমি কাউকে কয়েদখানায় বন্দী করতে পারি না, আর ইচ্ছে করলেই কাউকে এখান থেকে ছেড়ে দিতেও পারি না।" বললো কুবলা। আমি নিছক হুকুমের তাবেদার। তোমরা আমাকে গালিগালাজ করলে লাভ হবে না। আমি তোমাদের কাছে কিছু কথা জানতে চাই। আচ্ছা, তোমরা সবাই মিলে কি গাইছিলে? এ আওয়াজ আমার খুব ভালো লেগেছে।"

"এ আওয়াজ কি তোমার অন্তরকে মোমের মতো নরম করে দেয়নি?" জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধ।

"হ্যাঁ, অবশ্যই আমি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছি। আমাকে বলো তো তোমরা কি বলছিলে?"

"এ আরব বৃদ্ধ মালাবার অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে। ভারতীয় অঞ্চলে তার ব্যবসাও দীর্ঘদিনের। এজন্য সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা তার জানা ছিলো। তিনি সিন্ধি ভাষা যেমন বুঝতে পারেন অনুরূপ বলতেও পারেন। এটা কোন সঙ্গীত নয়। এটা আমাদের কলেমা। এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, ইবাদত করার যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাছাড়া আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কুরআন শরীফের কিছু আয়াত সবাই মিলে পড়ছিলাম।"

"এর দ্বারা তোমাদের কি উপকার হবে?" জানতে চাইলো কুবলা।

"সবচেয়ে বড় কথা হলো বিপদে এ কলেমা পাঠ করলে অন্তরে প্রশান্তি আসে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। তাছাড়া এর বরকতে এই জাহান্নাম থেকেও মুক্তির ব্যবস্থা হবে।" বললেন আরব বৃদ্ধ।

"তোমরা কি বিশ্বাস করো, তোমাদের সবাইকে এখান থেকে ছেড়ে দেয়া হবে? জিজ্ঞেস করলো কুবলা।

"আমরা যদি অপরাধী হতাম, তাহলে এই বন্দীদশা থেকে আর মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করতাম না, তখন আল্লাহর কাছে কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা

চাইতাম। আমরা নিরপরাধ। অন্যায়ভাবে আমাদেরকে বন্দী করা হয়েছে। আমাদের সহায়-সম্পদ লুটে নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের কাছে এবং তোমাদের রাজার কাছে আমরা কোন সাহায্যই চাইবো না। তোমাদের রাজার ধ্বংস লিখা হয়ে গেছে।" বললেন বৃদ্ধ।

"তোমরা কি মহারাজের ধ্বংসের জন্যে তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছো?" জিজ্ঞেস করলো কুবলা।

"না, আমরা কারো অমঙ্গল কামনা করি না। শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তুমি যদি নেক কাজ করো তার পুরস্কার পাবে আর জুলুম অত্যাচার করলে তোমার উপরও জুলুম করা হবে।"

আরব বৃদ্ধের এ কথা শুনে কুবলা যে অসৎ ইচ্ছা নিয়ে বন্দী পরিদর্শনে এসেছিলো তার মন থেকে সব কুচিন্তা দূর হয়ে গেলো। রাজা দাহিরের নির্দেশ ছাড়া সে কোন কয়েদীকে মুক্তি দিতে পারতো না ঠিক; তবে কুবলা কুরআন শরীফের তেলাওয়াত ও আরব বন্দীর কথা শুনে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো তা বন্দীদের জন্যে খুবই ইতিবাচক প্রমাণিত হলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাজা দাহিরের প্রধান জেলখানার দারোগা কুবলা ছিলো জ্ঞানী, বিদ্বান ও একজন লেখক ব্যক্তি। জেলখানার প্রশাসনে সাধারণত এমন লোকেরাই নিযুক্ত হয়ে থাকে, যারা নিরীহ বন্দীদের উপর অমানবিক অত্যাচার করে নির্দোষ মানুষের হাড় গুড়ো করে প্রশান্তি লাভ করে থাকে। কিন্তু কুবলার মতো পণ্ডিত মানুষকে রাজা দাহির জেলখানার দারোগা নিযুক্ত করেছিলো কেন তা বলা মুশকিল।

* * *

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল যেদিন মাত্র তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে বসরা থেকে রওয়ানা হলেন, সেদিন রাতে মায়ারাণীর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী বেলাল বিন উসমান তার তিনসাথীকে নিয়ে আরব মুসাফিরদের বন্দী করে রাখা জেলখানার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো। জায়গাটি ছিলো অন্ধকার। সেখানে ছিলো কয়েকটি জানালা। দিনের বেলায়ই বেলাল জায়গাটি দেখে গিয়েছিলো। কয়েদখানার দেয়ালে মাঝে মাঝে বুরুজ। চার কোণের চারটি বুরুজের উপর পাহারারত সশস্ত্র প্রহরী।

বেলাল তার সাথীদেরকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে গেলো যেটি ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। বেলাল দেয়ালের নীচে দাঁড়িয়ে হুঁক লাগানো রশি দেয়ালের উপরে ছুড়ে মারলে হুঁক দেয়ালের উপরে আটকে গেল। রাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় দেয়ালের উপরে লোহার হুঁক নিক্ষিপ্ত হওয়ার আওয়াজটি হয়তো প্রহরীরাও শুনতে পেয়েছিলো। বেলাল ও সাথীরা দেয়ালের সাথে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হুঁকের ঝংকার ধ্বনীতে প্রহরীদের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

দীর্ঘক্ষণ তারা উৎকর্ণ থেকেও উপরে কোন শব্দ পেলো না। সবার আগে বেলাল রশিটা শক্তভাবে ধরে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে রশি বেয়ে দেয়ালের উপরে উঠে পড়লো।

দেয়ালের উপরের অংশটি ছিলো যথেষ্ট চওড়া। অনায়াসে দেয়ালের উপর দিয়ে কেউ ঘোড়া হাঁকাতে পারতো। দেয়ালের উপরে উঠে বেলাল একটি ছোট বুরুজের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। একে একে বেলালের তিনসঙ্গীও উপরে উঠে এলো। তাদের সবারই হাতে তরবারী আর কোমরে গুঁজে রাখা খঞ্জর।

তাদের কারো কয়েদখানার ভিতরের অবস্থা জানা ছিলো না। কয়েদখানার কোথায় কি সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিলো না। আরব মুসাফিরদের কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে এ সম্পর্কেও তারা ছিলো অজ্ঞাত। বিশাল জেলখানা। জেলখানার দেয়ালের উপরে জায়গায় জায়গায় মশাল জ্বলছে। আসলে ভাবাবেগে বেলাল বন্দীদের মুক্ত করতে এ অভিযানে নেমে পড়েছিলো। অভিযান শুরু করার আগে তার প্রয়োজন ছিলো জেলখানার ভিতরের অবস্থা জেনে নেয়া। সে হারেস আলাফীকে বলেছিলো, জেলখানার প্রহরীদের হত্যা করে সে ওদের হাতিয়ার বন্দীদের দিয়ে দেবে, এরপর সবাই মিলে বাকী প্রহরীদের পরাস্ত করে প্রধান গেট খুলে বন্দীদের মুক্ত করে মাকরানে পৌছে দেবে।

* * *

বেলাল তার তিনসঙ্গীকে দেয়ালের উপরে উঠার জায়গাতে রেখে এক কোণের বুরুজের দিকে অগ্রসর হলো। পা টিপে টিপে অগ্রসর না হয়ে এমনভাবে অগ্রসর হলো, তাকে দেখে মনে হবে সে যেন জেলখানার কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বেশ ক'বছর যাবত রাজমহলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য থাকার কারণে বেলাল নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ কোড ও সাংকেতিক ভাষা জানতো এবং বলতে পারতো। সে যখন বুরুজের কাছাকাছি পৌছলো প্রহরী তাকে দেখে হাঁক দিলো।

"কে রে ওখানে?" হাঁক দিলো প্রহরী।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক।" বললো বেলাল।

"প্রহরী তাকে জেলখানার কোন পদস্থ কর্মকর্তা মনে করে বুরুজের ভিতরেই দাঁড়িয়ে রইলো। বেলাল তরবারী কোষমুক্ত করে ধীরে ধীরে বুরুজের দিকে অগ্রসর হলো। বুরুজের ভিতর দিকটা ছিলো অন্ধকার। চারটা খুঁটির উপরে গম্বুজ আকার ছাদ দিয়ে তৈরী বুরুজ চতুর্দিকে খোলা। বেলাল প্রহরীর কাছে গিয়ে তরবারীর আগাটা বুকে চেপে ধরে বললো, তোমার অস্ত্র ফেলে দাও। সে কোমরে কোষবদ্ধ তরবারী ও খঞ্জর হাতে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলো। বেলাল তাকে মেঝের উপরে ফেলে তরবারীর আগা তার ঘাড়ের উপরে চেপে ধরে বললো, "আরব কয়েদীরা কোথায়? সত্যিকথা বলবে এবং গড়িমসি না করে এক্ষুণিই বলবে।"

প্রহরী বললো, "আরব বন্দীরা মাটির নীচের কয়েদখানায়।"

"সেখানে যাওয়ার পথ কি? নীচের কয়েদখানার চাবি কার কাছে?"

"আমি তোমাকে সব বলছি, কিন্তু আমার ঘাড় থেকে তরবারী সরিয়ে নাও। তুমি আমার জীবন কেড়ে নিও না। আমি তোমার কাজে কোন অসুবিধা করবো না। কারণ এই বন্দীশালাটা আমার বাবার সম্পত্তি নয়, আর আমার বাবা এদেশের রাজাও নয়। আমরা তো পেটের দায়ে চাকরী করি মাত্র।"

প্রহরীর কথায় বেলাল তার ঘাড় থেকে তরবারী সরিয়ে নিলো।

"ঠিক আছে, এখন বল।" তাড়া দিলো বেলাল।

"আমি তোমার সাথে বন্ধুর মতো কথা বলছি, তুমিও আমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে এটাই প্রত্যাশা করি। তুমি যদি একা হও, কিংবা তোমরা পাঁচ সাতজন হয়ে থাকো, তাহলে আমি পরামর্শ দেবো, তোমরা ফিরে চলে যাও।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো বেলাল।

"তোমরা যদি বন্দীদের মুক্ত করতে এসে থাকো, তা তোমরা করতে পারবে না। আমি তোমাকে সরলভাবে বলছি, তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি বলো, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবো। আমাকে যদি বিশ্বাস করো তাহলে যা জিজ্ঞেস করবে, আমি তা তোমাকে বলে দেবো। তবে

আমি তোমাকে বলতে পারি উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবে না তোমরা, খুবই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে।" বললো প্রহরী।

"আগে বলো তো হঠাৎ করে আমার প্রতি তোমার এতোটা হৃদ্যতা কেন সৃষ্টি হলো?" জিজ্ঞেস করলো বেলাল।

তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে এতোটা সহজ হয়ে গেলে? মৃত্যুকে তোমরা এতোটাই ভয় কর? আমাকে দেখো, স্বজাতি বন্দীদের মুক্ত করতে জীবন বাজি রাখছি আর তোমরা...?"

"আরে দোস্ত...! কিসের জন্যে জীবন বাজি রাখবো আমি?" বললো প্রহরী। এদের আটকে রাখার জন্যে? যেসব নিরপরাধ মানুষকে ডাকাতি করে অন্যায়ভাবে এখানে আটকে রাখা হয়েছে! এসব হচ্ছে রাজা মহারাজাদের পাপ। এসব পাপের জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে আমি কখনও প্রস্তুত নই। নিরপরাধ আরব বন্দীদের মুক্ত করতে কেউ আসলে আমি কেন সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো। আমার সাধ্য থাকলে তালা খুলে আমি ওদের মুক্ত করে দিতাম। কারণ আমি জানি এদের আটকে রাখার কারণে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে একটা মহাবিপদ ধেয়ে আসছে, আর এ বিপদ আসছে তোমাদের দেশ থেকে।"

"আমি মনে করেছিলাম তুমি এতোটা বুদ্ধিমান হবে না। কিন্তু তুমি বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলছো, বললো বেলাল।

"ঠিকই বলেছো। এগুলো আমার কথা নয়। আমাকে এসব সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন আমার বাবা। বাবা বলেছেন, আমাদের রাজা একবার আরব সৈন্যদের পরাজিত করে মনে মনে খুব উৎফুল্ল হয়েছেন কিন্তু তিনি আরবদের মানসিকতা সঠিক জানেন না। আরব সৈন্যরা নিশ্চয়ই আবার আঘাত হানবে, তখন আর রাজার পক্ষে তাদের প্রতিরোধ সম্ভব নাও হতে পারে। আমাদের রাজা নিজেকে আসমানের দেবতা মনে করছে। কিন্তু সে যে অপরাধ করেছে, যে পাপ করেছে এর শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। সে তার বোনকে বিয়ে করেছে, এই অপরাধের শাস্তি না হয়েই পারে না।"

"আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করবো, এখন এর ঠিক ঠিক জবাব দেবে? প্রহরীকে সতর্ক করলো বেলাল।

প্রহরী বেলালকে নীচে নামার রাস্তা দেখিয়ে দিলো এবং পাতাল কক্ষের চাবি সম্পর্কে বললো, পাতাল কক্ষের চাবি কোনো প্রহরীর কাছে থাকে না। ওইসব

চাবি একটি কক্ষে রাখা আছে। সেই কক্ষ বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকে। চাবির ঘরটিই কয়েদখানার দফতর। সেখানে দুই প্রহরী থাকে। তারা সাধারণ সিপাই নয় উঁচুপদের কর্মকর্তা। জেলখানার কোথায় কোথায় প্রহরী পাহারারত রয়েছে তাও জানিয়ে দিলো।

* * *

প্রহরীর মাথায় পাগড়ী ছিলো। বেলাল এক ঝটকায় প্রহরীর মাথা থেকে পাগড়ী ছিনিয়ে নিল। প্রহরীকে ধাক্কা দিয়ে উপুড় করে মেঝেতে চেপে ধরলো। প্রহরীকে পিঠমোড়া করে হাত পা বেঁধে ফেললো বেলাল। অবশিষ্ট পাগড়ী ছিড়ে প্রহরীর চোখ বেঁধে দিলো।

"আমি তোমাকে প্রাণে মারবো না দোস্ত।" প্রহরীর উদ্দেশ্যে বললো বেলাল। কিন্তু তোমার উপর আমি ভরসাও করতে পারছি না। যদি কেউ আসে তাহলে তোমার বাঁধন খুলে দেবে।"

প্রহরীকে বেঁধে রেখে বেলাল তার সাথীদের কাছে ফিরে এলো। সাথীদের নিয়ে সে বাঁধা প্রহরীর বুরুজে গিয়ে প্রহরীর গোপন সুড়ঙ্গ পথের সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে গেলো। সুড়ঙ্গ পথটি ছিলো গোলক ধাঁধাঁ সৃষ্টিকারী। পথটির কোন কোন স্থানে মনে হতো পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। বেলাল ধাঁধা সৃষ্টিকারী পথটি সাথীদের নিয়ে অতিক্রম করে পৌঁছে গেলো প্রহরীর বলা চাবির ঘরে। সে ঘরের সামনে পৌঁছে বেলাল দেখলো লোহার দরজা। কিন্তু দরজাটি ছিলো খোলা। লোহার গেটটি ঘরের বহিঃপার্শ্বে, ভিতরের দিকে আরো একটি দরজা। প্রথম দরজার দু'পাশে দু'টি কক্ষের একটি খোলা অপরটি তালাবদ্ধ। আর ঘরের মূল দরজায় ভিতর থেকে অনেক বড় একটি তালা ঝুলছে। যে ধরনের তালা সাধারণত দুর্গসমূহের প্রধান গেটে লাগানো থাকে। বেলাল ও সাথীরা পাশের খোলা কক্ষে ঢুকে পড়লো। দরজার দু'পাশের দেয়ালে মশাল জ্বলছে। বেলাল একটি মশাল হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরটিতে দেখতে পেলো দু'পাশে দু'টি চৌকিতে উর্দি পরিহিত দু'জন লোক বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। বেলাল উভয়কে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিলো। ঘুমন্ত লোকগুলো হন্তদন্ত হয়ে জেগে বুকের উপর উন্মুক্ত তলোয়ারধারী অচেনা লোক দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো।

বেলাল ওদের নির্দেশ করলো— "পাতাল কক্ষের চাবি দাও। আর সদর গেটের চাবিও আমাদের হাতে দিয়ে দাও।"

প্রহরীদের একজন দেয়ালের পাশে গিয়ে দেয়াল থেকে একটি পাথর সরিয়ে এর ভিতর থেকে একটি চাবি বের করে বেলালের হাতে তুলে দিলো। যে কোন অজ্ঞাত মানুষের পক্ষে বোঝার উপায় ছিলো না, দেয়াল থেকে এ পাথরটি আলাদা করা যেতে পারে।

বেলাল ধমক দিয়ে বললো, "আমি পাতাল কক্ষ ও সদর দরজার চাবি চাচ্ছি।"

প্রহরী ভয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে তালাবদ্ধ দরজা খুলে দিলো এবং বেলালের দিকে তাকালো। বেলাল মশাল নিয়ে প্রহরীর কাছে গেলো। প্রহরী বেলালকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। বেলাল দেখতে পেলো সেই কক্ষের দেয়ালের সাথে অসংখ্য চাবি ঝুলানো রয়েছে। অসংখ্য চাবির গোছা থেকে দু'টি তুলে প্রহরী বেলালকে দেখিয়ে বললো, এটাতে পাতাল কক্ষের চাবি আর এটাতে সদর দরজার চাবি রয়েছে।

কক্ষটি ছিলো যথেষ্ট বড়। দেয়ালের একপাশে ঝুলানো ছিলো অনেকগুলো চাবির গোছা, আর অপর পাশের দেয়ালে কতগুলো তরবারী, বর্শা, খঞ্জর ঝুলছে। বেলাল ও তার তিন সঙ্গী মিলে দুই প্রহরীর পাগড়ী দিয়ে বুরুজের প্রহরীর মতোই ওদেরকে হাত পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাখলো। এরপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো এবং যথাস্থানে মশাল রেখে বেলাল সাথীদের নিয়ে কয়েদখানার ভিতরে প্রবেশ করলো। কয়েদখানার এক পাশে বড় বড় হল রুমের মতো প্রশস্ত কক্ষ। আর অপর পাশে ছোট ছোট অসংখ্য কক্ষ। প্রত্যেক কক্ষে মশাল জ্বলছে। অধিকাংশ বন্দী ঘুমাচ্ছে। আর কেউ কেউ কষ্ট যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কারা কক্ষের মশালের আলো ফাঁক দিয়ে বাইরে পড়ছে। এই আলোতে টহল দিচ্ছে প্রহরীরা। বেলাল তার সাথীদের নিয়ে আলো আঁধারীর মাঝে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। তারা কোনো মতে প্রহরীদের দৃষ্টির অগোচারে পাতাল কক্ষে নামার সিঁড়ি কোঠায় চলে এলো।

পাতাল কক্ষের সিঁড়ি কোঠা ছিলো গর্তের মতো। সিঁড়ি কিছু ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। মাঝামাঝি মশাল জ্বালানো। মশালের আলোর আভায় সিঁড়ি কোঠার উপর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। বুরুজের প্রহরীর বলা কথা মতো বেলাল ও সাথীরা পাতাল কক্ষের সিঁড়ি পর্যন্ত বিনা বাঁধায়ই পৌঁছে গেলো।

পাতাল কক্ষের সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নেমে বেলাল শ্লোগান দেয়ার মতো করে বললো, "আল্লাহর কসম! আজ তোমরা এই জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবে।"

তখন রাত দ্বিপ্রহর পেরিয়ে শেষ প্রহরে পড়েছে। শেষ রাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় বেলালের হাঁকে সব কয়েদী জেগে উঠলো এবং হৈ চৈ শুরু করে দিলো।

"চুপ করো সবাই! মুক্ত হতে এখনো আরো কাজ বাকী রয়েছে।" উচ্চ আওয়াজে কয়েদীদের উদ্দেশ্যে বললো বেলাল। বেলালের কথায় সবাই নীরব হয়ে গেলো। বেলাল বললো, আমাদের সবার হয়তো জেলখানার প্রহরীদের সাথে লড়াই করতে হবে।"

পাতাল কয়েদখানার প্রথম কক্ষের তালা খোলার জন্যে বেলাল চাবি ঘুরাতে লাগলো। কিন্তু তালা কিছুতেই খুলছে না। চাবি ছিলো অনেকগুলো। একটি একটি করে সবগুলো চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করলো বেলাল, কিন্তু কিছুতেই তালা খোলা সম্ভব হলো না।

"মনে হয় আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। বললো বেলালের এক সাথী। ওই বেঈমান মনে হয় আমাদের সঠিক চাবি দেয়নি।"

সবাই একই কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করছিলো ঠিক এমন সময় হঠাৎ একটা মৃদু কম্পন, সেই সাথে একটা হাল্কা বিস্ফোরণের আওয়াজ ও একজনের বিকট আর্তচিৎকার শোনা গেলো। সবাই চকিতে এদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো বেলালের এক সাথী ঝুঁকে রয়েছে, তার পিঠের দিকে বর্শা প্রবেশ করে পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে এবং দেখতে দেখতে বেলালের এই সাথী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সবাই সিঁড়ি কোঠার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো, সেখানে দশ বারোজন সশস্ত্র লোক দূর নিক্ষেপণ যোগ্য বর্শা হাতে দাঁড়ানো। বেলাল দেখলো ওদের সাথে বুরুজের সেই প্রহরীও রয়েছে যাকে সে হাত পা বেঁধে রেখে এসেছিলো।

"আরব বন্ধু!" বুরুজের প্রহরী বেলালের উদ্দেশ্যে বললো, আমি তোমাকে সতর্ক করে বলেছিলাম, নীচে যেয়ো না। কিন্তু তুমি আমার কথা শোননি। তুমি হয়তো ভেবেছিলে বাঁধা অবস্থায় সারা রাত আমাকে পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমি জানতাম কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বাঁধন খুলে দেয়ার লোক এসে পড়বে। আমার প্রাণ বাঁচানোর প্রতিদান আমি তোমাকে সতর্ক করার মাধ্যমে আদায় করেছিলাম, এখন আমি যার নুন খাই তার হক আদায় করছি। এখান থেকে কোনদিন কোন বন্দী বেরিয়ে যেতে পারেনি। তোমরাও আর বেরিয়ে যেতে

পারবে না। জল্লাদ ছাড়া আর কেউ তোমাদেরকে এখান থেকে বের করতে পারবে না।"

"তরবারী ফেলে নিরস্ত্র হয়ে উপরে উঠে এসো। নয়তো নিক্ষিপ্ত বর্শায় তোমাদের পেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়া হবে।" নির্দেশের কণ্ঠে বললো এক অফিসার ধরনের লোক।

অবস্থা বেগতিক দেখে বেলাল সাথীদের উদ্দেশ্যে অনুচ্চ আওয়াজে বললো, "বন্ধুরা! এরা আমাদের জীবিত রাখবে না। এসো লড়াই করেই মরি।"

বেলাল ও সাথীদের হাতে ছিলো উন্মুক্ত তরবারী। এরা বিজলীর মতো উন্মুক্ত তরবারী উঁচিয়ে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে এলো। কিন্তু উপরে দাঁড়ানো জেল প্রহরীরা প্রস্তুত ছিলো এমনটির জন্যেই। তারা দূর নিক্ষেপণযোগ্য বর্শা তাক করে রেখেছিলো এদের দিকে। বেলালের এক সাথী উপরে উঠে আঘাত হানার আগেই তার পেট বিদ্ধ করলো প্রহরীদের নিক্ষিপ্ত বর্শা। সে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লো আর অসাড় দেহ গড়িয়ে নীচে পড়তে লাগলো। বেলালও তার অপর এক সঙ্গীর তরবারী এক প্রহরীর পেট বিদ্ধ করলো বটে। কিন্তু তরবারী টেনে আর দ্বিতীয় আঘাতের সুযোগ পেলো না। প্রহরীদের আঘাতে পড়ে গেলো বেলালের সঙ্গী। একই সঙ্গে তিনটি বর্শা বিদ্ধ করলো বেলালের সেই সঙ্গীকে। আর বেলাল পা পিছলে কয়েক ধাপ নীচে পড়ে গেলো। এমতাবস্থায় কয়েকজন প্রহরী তাকে ঝাপটে ধরে উপরে টেনে নিয়ে সুরক্ষিত একটি লোহার গারদে ভরে তালা লাগিয়ে দিলো। এ ঘরটিতে তাজা ও পঁচা মানুষের রক্তের দুর্গন্ধ। বেলালের মনে হলো, এখানে প্রতিদিনই হয়তো কোন না কোন মানুষকে জবাই করা হয়। ঘরের দেয়ালেও ছিটা ছিটা রক্তের দাগ।

* * *

বেলা একটু বেড়ে উঠার পর রাজা দাহির তার খাস কামরায় লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে পায়চারী করছিলো। আর রাগে ক্ষোভে ফুঁসছিলো। অধোবদনে তার সামনে দণ্ডায়মান মায়ারাণী।

"ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রাজা বললো, "তোমার কথায় আমি ওদেরকে প্রাসাদে রাখতে অনুমতি দিয়েছিলাম। অথচ তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো, মহাভারতের কোন রাজা দূরের কথা কিংবা কোন প্রজাও মুসলমানকে বিশ্বাস করে না। তোমার কথায় আজ আমাকে এতোটা মূল্য দিতে হলো। যারা গো-মাতাকে হত্যা করে,

তাদেরকে কোনভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। তুমি বলতে পারো, আমি চার পাঁচশ আরবকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি কি দেখনি আমি ওদের কতোটা নিরাপদ দূরে রেখেছি। তাছাড়া ওদেরকে আমি স্বাধীন ছেড়ে দেইনি। ওদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে বেদুঈনের ছদ্মবেশে বহু সংখ্যক সেনাকে আমি ওদের এলাকায় ছড়িয়ে রেখেছি। মাকরানে মুসলমান বসতির চারপাশে যেসব বেদুঈন পরিবার রয়েছে এরা সবাই আমার সেনাবাহিনীর লোক। কারণ আমি জানি, আরবরা প্রতি আক্রমণ করতে পারে, আর এরা তাদের সগোত্রীয় ভাইদের সহযোগিতা করতে পারে এ আশংকা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না। এজন্য ওদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ করার জন্যে আমি ছদ্মবেশে সেনা মোতায়েন করে রেখেছি।

"ওদেরকে বিশ্বস্ত ও সৎ ভেবে আমি নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলাম।" বললো মায়ারাণী। এটাকে আমার অনভিজ্ঞতা বলতে পারো। ওরা যে অপরাধ করেছে-এর শাস্তি তো ওরা পেয়েই গেছে। আর যে ধরা পড়েছে; ওকে তুমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড .....।"

"এমন নিমক হারামকে আমি বেঁচে থাকতে দিবো না।.......গজরাতে গজরাতে বললো রাজা দাহির। আমি জেল দারোগাকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি ওকে জল্লাদের হাতে সোপর্দ করার আগে ওর কাছ থেকে এটা বের করতে চেষ্টা করতে যে, ওর সাথে আর কারা ছিলো? কারা ছিলো ওদের সহযোগিতায়? অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আরব সর্দার আলাফীর সাথে ওদের যোগাযোগ ছিলো কিংবা ওদের কেউ এদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে থাকবে। কয়েদখানার দারোগা ওর পেট থেকে এসব কথা বের করেই ছাড়বে। যদি কিছুই না বলে তাহলে বলে দিয়েছি ওকে জল্লাদের হাতে দিয়ে দিতে।

"বেলালের ব্যাপারে এমন কঠোর ফয়সালা শোনার পরও রাণীর চেহারায় কোন ভাবান্তর দেখা গেলো না। যে বেলালের প্রতি আসক্ত হয়ে রাণী ওকে রাজমহলে নিয়ে এসেছিলো সার্বক্ষণিকভাবে সঙ্গ পাওয়ার জন্যে। বেলাল যাতে রাণীকে ছেড়ে চলে না যায় এজন্য কৌশলে বেলালের সঙ্গীদেরকে মহলের নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নিয়েছিলো রাণী। বেলালের প্রেমের পরশে দীর্ঘ দু'দশকের মতো সময় পার করে দিয়েছে রাণী। আর আজ প্রাণের লোকটি মৃত্যুর মুখোমুখী। তাও এমন কঠিন মৃত্যু যা ভাবতেও গা শিউরে উঠে।

অতি প্রত্যুষেই জেলখানার দারোগা নিজে এসে রাজা দাহিরকে সংবাদ দিয়ে গেছে গতরাতে জেলখানায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে। তখনই রাজা দাহির ধৃত বেলাল বিন উসমানের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলো। রাজা বেলালকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে বেলালের তিনসঙ্গীর মরদেহকে দাফন কিংবা সৎকার না করে জেলখানার বাইরে ফেলে দিতে।

রাজার নির্দেশে বেলালকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছিলো জেলখানার দারোগা কুবলা। বেলালকে একটি শক্ত তক্তার মধ্যে শুইয়ে দু'পা রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে উপুড় করে রাখলো। দু'হাতের কব্জিতে রশি বেঁধে দু'দিক থেকে দু'দল লোক চিৎকার দিয়ে টানতে লাগলো আর কুবলা জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "বল তোর সাথে আর কে কে ছিলো? বেলালের মনে হচ্ছিলো তার হাত দুটো শরীর থেকে ছিড়ে যাচ্ছে। কুবলা বেলালকে বারবার জিজ্ঞেস করছিলো— বল মাকরানের কোন মুসলমান তোর এই অভিযানের কথা জানে? বেলালের শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে গেলো। কষ্ট যন্ত্রণায় চেহারা নীল হয়ে গেলো।

কুবলা বেলালের কাছে জানতে চাইলো—বল, আলাফীর সাথে তোর কি কথা হয়েছিলো?

বেলাল বললো, "আমার তিন সঙ্গী ছাড়া আমার সাথে আর কেউ ছিলো না। যারা আমার সাথে ছিলো তারা সবাই মারা গেছে। আমি জীবনে কখনো মাকরান যাইনি। আমার অভিযানের কথা আর কেউ জানে না।"

কুবলা যতোবার বেলালকে জিজ্ঞেস করলো, ততোবার একই জবাব দিলো বেলাল।

আসল কথা বলছে না ভেবে কুবলা শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। এভাবে চললো সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত।

দুপুরের দিকে বেলাল জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। দুপুরের পর বাঁধন খুলে দিলে বেলালের শরীর অসাড় হয়ে গেলো। ওকে টেনে-হেঁচড়ে সেই পুঁতিদুর্গন্ধময় কক্ষে রেখে তালাবদ্ধ করে দিলো প্রহরীরা। কষ্ট যন্ত্রণায় বারবার বেলাল পানি পান করতে চাচ্ছিলো কিন্তু পানির পেয়ালা তার মুখের কাছে নিয়ে ফিরিয়ে আনা হলো, পানি পান করতে দেয়া হলো না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় বেলালের মুখ ব্যাদান হয়ে গেলো।

দুপুরের পর আবারো একটি খাড়া তক্তার সাথে বেলালকে বেঁধে চার হাত পা ওজনী দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে রাখলো, আর দারোগা কুবলার জিজ্ঞাসাবাদ

চলতে থাকলো। কিন্তু বেলালের মুখ থেকে নতুন কোন কথাই বের হলো না। রাতের বেলায় আবারো সেই অন্ধকার দুর্গন্ধময় কক্ষে তাকে ফেলে রাখলো। কক্ষের দুর্গন্ধ আর নিজের শরীরের ঘামের দুর্গন্ধ মিলে আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। রাত নামার সাথে সাথে পোকা-মাকড়, বিচ্ছু বেলালের অসাড় দেহটাকে ঘিরে ধরলো। নাকে মুখে, সারা শরীরে বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের কামড়ে জ্বালা বিষের যন্ত্রণায় বেলালকে মৃতপ্রায় করে তুললো। উহ্ করার বোধটুকুও বেলালের অবশিষ্ট রইলো না।

* * *

মধ্য রাতে সেই কক্ষের দরজা খুলে বেলালকে টেনে-হেঁচড়ে আবার শাস্তির জায়গায় নিয়ে গেলো প্রহরীরা। এবার পা দুটো ছাদের সাথে রশি বেধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। বেলালের ঝুলন্ত হাত দুটো মাটি থেকে আধা হাত উঁচুতে ঝুলে রইলো। হাত উপরে উঠানোর শক্তি নেই। এবার শুরু হলো চাবুক। এক একটি চাবুকের আঘাতে বেলালের শরীরের চামড়া উঠে আসতে লাগলো, সেই সাথে ফিনকি দিয়ে ঝরতে থাকলো রক্ত। আর চললো কুবলার জিজ্ঞাসাবাদ। বল? তোর সাথে কি কথা হয়েছিলো আলাফীর? মাকরানের কে কে তোর সহযোগী ছিলো? কারা ছিলো এই পরিকল্পনায়?

কিন্তু বেলালের মুখে না শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ বের হলো না।

বেলাল বললো, আমার সাথে যারা ছিলো, তারা সবাই মারা গেছে। অবশেষে আফসোস করে কুবলা বেলালের উদ্দেশ্যে বললো, "আরে হতভাগা! এভাবে কেন মরছো? বলে ফেলো এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকো। বলো, এই তিন ব্যক্তি ছাড়া তোমার সহযোগিতায় আর কে কে ছিলো?"

"বেলালের কণ্ঠে কথা উচ্চারিত হচ্ছিলো না। কথা বলার মতো শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো বেলালের। বহু চেষ্টা করে শুধু এতটুকু বললো, ছিলো একজন।"

"ছিলো!" স্বীকারোক্তি শুনে কুবলা চাবুক মারা বন্ধ করে দিলো এবং ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে আনতে নির্দেশ দিলো— এরপর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—বলো, কে সে? তিনজন ছাড়া আর কে ছিলো তোমার সাথে?

"আল্লাহ্! আমার আল্লাহ্ ছিলো আমার সাথে।" এ কথা শুনে রেগে গিয়ে আবারো কয়েক ঘা চাবুক লাগিয়ে দিলো কুবলা। বললো, ডাক তোর আল্লাহ্‌কে। এখান থেকে তোকে আর তোদের সাথীদের মুক্ত করে নিক।"

"হ্যাঁ, আল্লাহ্ সবাইকে মুক্ত করবেন। আমার আল্লাহ্ আসছেন। আসলেই টের পাবে।"

এভাবেই কেটে গেলো রাত। সকাল বেলায় শাস্তির কক্ষ থেকে বেলালের অসাড় দেহটি জল্লাদের গারদে রেখে তালাবন্ধ করতে নির্দেশ দিলো জেল দারোগা কুবলা। আজো বেলালকে খানাপানি কিছু দেয়া হয়নি। দিনের বেলায় শুরু হলো নতুন ধরনের শাস্তি। সারা দিন ভয়ংকর শাস্তি দেয়ার পর রাতের বেলায় আবারো ফেলে রাখা হলো জল্লাদের গারদে। এখন আর বেলালের কোন হুঁশ জ্ঞান নেই। নিথর অসার মৃতপ্রায় বেলাল পড়ে রইলো মেঝেতে। বোধশক্তি আছে কি-না তাকে দেখে কারো পক্ষে বলা মুশকিল। খুবই হাল্কাভাবে নাকের কাছে হাত রাখলে নিঃশ্বাস অনুভব করা যায়। চাবুকের আঘাত পোকায় কামড়ানো ফোলা ক্ষতবিক্ষত শরীরে নিঃশ্বাসের উঠানামা বোঝা যায় না।

তৃতীয় দিন সকাল বেলায় রাজা দাহিরকে বলা হলো, তিনদিন বিরামহীন চেষ্টার পরও বেলাল কারো নাম উচ্চারণ করেনি। জ্ঞাত অজ্ঞাত কারো সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেনি। বেলালকে যেসব শাস্তি দেয়া হয়েছে সবিস্তারে জেল দারোগা কুবলা সবই জানালো রাজাকে। সেই সাথে বেলাল কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাও ব্যক্ত করলো সবিস্তারে। অবশেষে কুবলা বললো, "আমার মনে হয় সঙ্গী তিনজন ছাড়া এর সাথে আর কারো যোগসূত্র ছিলো না। থাকলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতো। মাকরানের আরবদের সম্পর্কে তাকে অজ্ঞাতই মনে হয়েছে।"

"ঠিক আছে, জল্লাদের হাতে দিয়ে দাও ওকে। আর হ্যাঁ, বধ করার আগে খাবার দিও। অনাহারে কাউকে বধ করা ঠিক নয়।"

"রাজার নির্দেশে খাবার ও পানি দেয়া হলো বেলালকে। পানি পান করে বেলালের প্রাণ ফিরে এলো এবং কিছুটা বোধশক্তি ফিরে পেলো। সন্ধ্যায় কুবলা তাকে বললো, "আজ রাত তোমার জীবনের শেষ রাত। যদি কোন শেষ ইচ্ছা বা কথা থাকে তাহলে ব্যক্ত করতে পারো।"

"একটাই আমার ইচ্ছা, একটাই আমার শেষ কথা—নিরপরাধ আরব নারী শিশুদের মুক্ত করে দাও।"

"আরে বোকা! এটা আমার সাধ্যের বিষয় নয়।" বললো কুবলা।

"আর একটি ইচ্ছা আছে আমার। দীর্ঘদিন আমি মায়ারাণীর সেবা করেছি। সে যদি একবার এখানে আসতো তাকে একটু দেখে নিতাম।"

"এটাওতো আমার সাধ্যের বাইরে।" বললো দারোগা কুবলা। রাণীকে এখানে আসার কথা আমি কোন্ অধিকারে বলবো?"

"মরার আগে আমার প্রতি এতটুকু দয়া করো। রাণীর কাছে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দেখো, সে অবশ্যই আসবে।"

"তাই যদি হয়, যে রাণী তোমার কথায় এখানে আসবে, তাহলে তাকে বলে তুমি মুক্ত হয়ে যাও। সে তো রাজার কাছ থেকে যে কোন দাবী আদায় করিয়ে নিতে পারে। ইচ্ছা করলে তোমার প্রাণও বাঁচিয়ে দিতে পারবে।" বললো জেল দারোগা কুবলা।

* * *

পরদিন ভোরেই মায়ারাণী জেলখানায় এসে উপস্থিত। বেলালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো তার অন্তিম সাক্ষাতের আবেদনে রাণী আসবে। আর তার আবেদন ছাড়াই তার মুক্তির ব্যবস্থা করবে।

"আগের মতো প্রেমিকার মতো করে আসেনি রাণী। রাণী এসেছে পূর্ণ রাজকীয় জাঁকজমক নিয়ে। তার সাথে সুসজ্জিত রাজকীয় প্রহরী। মায়ার পরনেও রাজকীয় পোশাক। আগে পিছে জন পনেরো গার্ড। রাজকীয় ঘোড়ার গাড়িতে জেলখানায় প্রবেশ করে রাণী সোজা গিয়ে দাঁড়ালো জল্লাদ গারদের সামনে। দূর থেকেই দেখা যায় মরার মতো পড়ে আছে বেলাল। থেতলানো চেহারা ও শরীর। সারা গায়ে রক্তমাখা। ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে পূর্ব পরিচয় না থাকলে বেলালকে চেনাই ছিলো দায়। মায়ারাণী গারদের পাশে গিয়ে বেলালকে ডাকলে বেলাল কোন মতে উঠে লোহার বেড়া ধরে দাঁড়ালো।

"এসেছো রাণী! আমার বিশ্বাস ছিলো তুমি আসবে! আমার দেশের নিরপরাধ বন্দীদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম আমি। তুমিও এ কাজটি করতে পারতে। কিন্তু তুমি আমার কথা রাখলে না। টালবাহানা করে প্রত্যাখ্যান করেছিলে।"

"বেলাল! তুমি আমাকে বলো তো, এ কাজ করতে কে তোমাকে উস্কানী দিয়েছে? তুমি তো এমন কাজ করতে পারো না। কে তোমাকে প্ররোচিত করেছিলো? কার কথায় তুমি একাজ করতে গেলে?"

"হায়! একথা জানার জন্যে তো জেলখানার দারোগা আমার হাড়গুড়ো করে দিয়েছে, শরীরের চামড়া তুলে ফেলেছে, সারা শরীর থেতলে দিয়েছে। আমার

কাছে একথার কোন জবাব নেই। যদি জবাব থাকতো, তাহলে আমার এ দশা হতো না রাণী!”

মায়ারাণী প্রেমের দোহাই দিয়ে বেলালের কাছ থেকে জানতে চাইলো, আসলে তোমার সাথে এ কাজে আর কে কে ছিলো?

কিন্তু বেলাল যে হারেস আলাফীর সাথে মিলে এই পরিকল্পনা করেছিলো রাণীর প্ররোচনাতেও তা মুখে আনলো না। আসলে রাণী প্রেমের টানে বেলালের মতো রাজদ্রোহীর সাথে জেলখানায় সাক্ষাত করতে আসেনি। এসেছিলো প্রেমের বাহানা নিয়ে বেলালের অপরাধের শিকড় তালাশ করতে।

“মায়া! তুমি তো ইচ্ছা করলে আমাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারো। রাজা তোমার কথা শোনে। আমাকে বাঁচিয়ে দিলে আমি আর এদেশে থাকবো না, দেশ ছেড়ে চলে যাবো।”

“না। আমি তোমার কাছে যে কথা জিজ্ঞেস করেছি, তুমি তার জবাব দাওনি। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছো। আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি না।”

“না রাণী না। আসলে এর পিছনে কারো উস্কানী ছিলো না। বিবেকের তাকিদেই আমি নিরপরাধ স্বদেশীদের মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। তোমাকেও তো এদের মুক্তির ব্যাপারে রাজাকে বলার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। আমি তোমাকে ধোঁকা দেইনি। আমি তোমাকে ধোঁকা দিতে পারি না। তোমার সাথে আমার যে সম্পর্ক, তাতে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। তোমার সাথে আমি কিছুই আড়াল করিনি। মায়া! আমি তোমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি! তুমি আমাকে রক্ষা করো রাণী!”

অস্বাভাবিক নির্যাতন, কঠোর শাস্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর মানসিক যন্ত্রণায় বেলালের শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি ছিলো না। জীবনের স্বপ্নে বাঁচার জন্যে সে মায়ার প্রতি প্রাণ বাঁচানোর আবেদন করে। কারণ শরীরের চেয়েও বেলালের দেমাগের অবস্থা বেশী খারাপ হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া দীর্ঘদিন রাজপ্রাসাদে রাণীর প্রেমের জালে আটক থেকে কষ্টসহিষ্ণু আরব জীবনকে হারিয়ে বিলাস আরামে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো বেলাল। এজন্যই জীবনের জন্যে মায়ার কাছে আবেদন করে। নয়তো সহজাত আরবরা এমন একটি ঘটনার পর কষ্ট ও যন্ত্রণা যতোই হোক, জীবন ভিক্ষার জন্যে এভাবে আকুতি জানায় না। কিন্তু বেলালের আকুতি মায়াকে মোটেও প্রভাবিত করতে পারেনি।

"না, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না।"

"সেই সময়টির কথা স্মরণ করো রাণী। যখন তুমি আমার কাছে একটু আদর একটু সোহাগ, একটু প্রেমের পরশের জন্যে ভিখারিণীর মতো অনুরোধ জানাতে। যেভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে সবার চোখের আড়ালে তুমি আমাকে দিনের পর দিন কাছে রাখতে সেইসব মুহূর্তের কথা একদিনে ভুলে যেয়ো না রাণী!"

"হু, মহব্বত! ঘৃণাভরে বললো রাণী। বেলাল! সেটিকে মহব্বত বলছো তুমি! আমি যদি তোমাকে ভালোই বাসতাম, তোমার প্রেম যদি আমার মনে সত্যিকার অর্থেই জায়গা করে নিতো, তাহলে হয় আমি তোমার ধর্মে দীক্ষা নিতাম, নয়তো তোমাকে আমার ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতাম। সেটি প্রেম ছিলো না, সেটি ছিলো শারীরিক প্রয়োজন। যাকে কোন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না। প্রয়োজনে মানুষ যেমন গৃহপালিত জন্তু পোষে, আমিও প্রয়োজনের তাকিদে তোমাকে পুষেছিলাম। সেই প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গেছে। আমি এজন্যই তোমাকে বলতাম, ধর্মের কথা আমার সামনে উচ্চারণ করো না। এখন তুমি রাজদ্রোহী। তুমি যে অপরাধ করেছো, একটু চিন্তা করে দেখো, তুমি যদি রাজা দাহিরের জায়গায় থাকতে, তাহলে কি এমন অপরাধীকে ক্ষমা করতে?"

একথা বলেই মায়ারাণী সেখান থেকে সরে গেলো। কুবলা মায়ার জন্যে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। সে মায়ারাণীর উদ্দেশ্যে বললো, কি হুকুম মহারাণী?

"আগে যা ছিলো তাই।" বললো মায়ারাণী।

মায়া জেলখানা থেকে বের হতেই বন্দী গারদ থেকে বেলালকে বের করে আনা হলো। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিলো না। তাকে টেনে হেঁচড়ে বের করলো প্রহরীরা। বেলালকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হলো। তার পা দুটোও বাঁধা হলো শক্ত রশি দিয়ে। এরপর তাকে হামাগুড়ি দিয়ে মাথা নীচ করে বসিয়ে দেয়া হলো জল্লাদের বলিখানায়। জল্লাদ তার মাথার চুল ধরে নীচের দিকে ঝুকিয়ে দিয়ে দীর্ঘ চওড়া একটি ধারালো রামদা দিয়ে এক কোপে ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। সেই সাথে চিরদিনের জন্যে দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেলো বেলাল।

* * *

বেলালের শিরোচ্ছেদের দু'দিন পর সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে মাকরানে পৌঁছলেন।

মাকরানের গভর্নর মুহাম্মদ বিন হারুন হাজ্জাজের নির্দেশে তিন হাজার অশ্বারোহী সেনাকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। সেনাপতি বুদাইল মাত্র একরাত মাকরানে যাপন করে পরদিন ফজরের নামায পড়েই ডাভেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেনাপতি বুদাইল জানতেন না, আরব বন্দীদেরকে কোন জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। ইতিহাসে বলা হয়েছে মাকরানের গভর্নরও জানতেন না, বন্দী আরব মুসাফিরদেরকে রাজা দাহির কোথায় বন্দী করে রেখেছিলো।

হাজ্জাজ নির্দেশ দিয়েছিলেন, সবার আগে ডাভেল কব্জা করবে কারণ ডাভেল সিন্ধু অঞ্চলের একমাত্র সমুদ্র বন্দর। হাজ্জাজ মনে করেছিলেন সমুদ্র বন্দর কব্জায় এসে গেলে সমুদ্র পথে সামরিক সাহায্য ও রসদপত্র পাঠানো সহজ হবে। হাজ্জাজের নির্দেশ পালন করতেই সর্বাগ্রে সেনাপতি বুদাইল ডাভেল বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

রাজা দাহির মাকরানের আশ্রিত মুসলমানদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যে মাকরানের আশেপাশে বহু সেনা সদস্যকে বেদুঈনের বেশে পরিবার-পরিজনসহ নিয়োগ করে রেখেছিলো। হারেস আলাফী দ্বিতীয়বার আরব আক্রমণ প্রতিরোধে অস্বীকৃতি জানানোর পর দাহির তার গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে জোরদার করে। রাজা দাহিরের ছদ্মবেশী সেনাদের একজন সেনাপতি বুদাইলের অগ্রবর্তী সেনাদেরকে ডাভেলের দিকে অগ্রসর হতে দেখে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ডাভেলের দিকে রওয়ানা হয়।

ডাভেলের অধিবাসীও সেনা কর্মকর্তারা মুসলমানদের এ অভিযান সম্পর্কে একেবারেই বেখবর ছিলো। কিন্তু রাজা দাহিরের গোয়েন্দা সদস্য বুদাইলের সহকর্মীদের একদিন আগেই ডাভেল পৌঁছে ডাভেলের শাসককে বললো, আরব সেনারা আসছে। সে তার দেখা সেনা বাহিনীর সংখ্যা ও অবস্থা সম্পর্কেও সংবাদ দিলো।

খবর পাওয়া মাত্রই ডাভেলের শাসক শহর জুড়ে প্রচার করে দিলো, "সবাই হুঁশিয়ার হয়ে যাও, সকল যুবক তুণ ধনু নিয়ে তৈরী হয়ে যাও, আরব মুসলমানরা আবার শহর দখল করার জন্যে এগিয়ে আসছে। সেনাবাহিনী শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবে, বেসামরিক লোকেরা শহরের ভিতরে অস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকবে। দেবদেবী ও মন্দিরের সম্মান রক্ষায় জীবন বিলিয়ে দেয়ার আবার সময় এসেছে।"

ডাভেল ছিলো শহরের প্রধান মন্দীরের নাম। মন্দিরের নামেই শহরের নাম হয়ে যায় ডাভেল।

ডাভেলের শাসক সংবাদবাহী অশ্বারোহীকে বললো, তুমি অরুঢ় চলে যাও এবং রাজা দাহিরকে গিয়ে মুসলিম ফৌজ আসার খবর দাও।"

ডাভেলের শাসক তার সেনাবাহিনীকে শহরের অদূরে ময়দানে এগিয়ে নিলো এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সবাইকে কাতারবন্দী করে রাখলো। ডাভেলের শাসক এমন একটি এলাকায় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গেলো যে এলাকা পেরিয়ে মুসলিম বাহিনীকে ডাভেলে প্রবেশ করতে হবে। এলাকাটি ছিলো অসমতল, অসংখ্য উঁচু নীচু টিলা ও গিরি খন্দকে ভরা। ডাভেল শাসক তার সেনাদেরকে বিভিন্ন উঁচু টিলার আড়ালে লুকিয়ে রাখলো। এবং কিছু সৈন্যকে রাখলো সমতল এলাকায়। এ জায়গাটি ছিলো অতর্কিতে আড়াল থেকে আক্রমণের জন্যে খুবই উপযোগী। মুসলমানদের এ এলাকা সম্পর্কে কোন ধারণা ছিলো না। তাদের জন্যে এলাকাটি ছিলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

সিন্ধী সেনাদের মনোবল ছিলো চাঙা। কারণ এর আগে তারা মুসলিম বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলো। আর মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিকেও তারা শহীদ করে দিয়েছিলো। সেই বিজয়ের ঘটনা বলে সিন্ধুবাহিনীর সেনাপতিরা সেনাদের মনোবল আরো চাঙা করে তুলেছিলো।

* * *

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল তার সেনাদের নিয়ে অনেকটা নির্ভয়েই আসছিলেন। অবশ্য আরবদের যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবে তিনি সেনাদের একটি অংশকে অনেক আগে অগ্রবর্তী দল হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দু'জন পিছিয়ে এসে সেনাপতি বুদাইলকে জানালো পথিমধ্যে ডাভেলের সৈন্যরা ওঁৎ পেতে রয়েছে। এরা দু'জন ডাভেল সেনাদের যে অবস্থায় দেখেছিলো তা সবিস্তারে সেনাপতি বুদাইলকে জানালো।

সেনাপতি বুদাইল ছিলেন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি শত্রুদের রণপ্রস্তুতির খবর শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, প্রতিপক্ষ তাদের আগমন সংবাদ অনেক আগেই পেয়ে গেছে। তিনি সেনাদেরকে তিনভাগে ভাগ করে একটি অংশ নিজের সাথে রেখে মূল পথে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং অপর দুই ভাগকে দু'দিকে অনেকটা ঘুরে শত্রু বাহিনীর পিছন দিয়ে দু'বাহুতে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

শত্রুপক্ষ ওঁৎ পেতে ছিলো। তাছাড়া তারা মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ সরবরাহের জন্যে কিছু সেনাকে অগ্রবর্তী দল হিসেবে পাঠিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দল সেনাপতি বুদাইলের বাহিনীকে তিনভাগ করে দু'ভাগ দু'পাশের বাহুতে আক্রমণের প্রস্তুতির খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। শত্রু বাহিনীর অগ্রবর্তী দল শুধু সেনাপতি বুদাইলের কমান্ডে পরিচালিত সেনাদের দেখে ছিলো। বুদাইলের সাথে যে সেনাবাহিনী ছিলো শত্রুবাহিনী তাদেরকেই গোটা মুসলিম বাহিনী কিংবা অগ্রবর্তী বাহিনী ভেবেছিলো। সেনাপতি বুদাইল গতি মন্থর করে দিলেন, যাতে তার ডান বামের দু'দল শত্রুদের ওঁৎপেতে থাকা জায়গায় দূরবর্তী পথ ঘুরে চলে আসতে পারে।

মুসলিম বাহিনীর দুই অংশ পথ ঘুরে শত্রুদের ওঁৎপেতে থাকা জায়গায় পৌঁছে দু'দিক থেকে একই সাথে হামলা করলো। এই অতর্কিত আক্রমণটিকে শত্রু বাহিনী মনে করলো আরব বাহিনী দু'দিক থেকে তাদের চেপে ধরেছে। ফাঁদ পেতে রাখা ডাভেল বাহিনী নিজেরাই ফাঁদে আটকে গেলো। এমনটির জন্যে ডাভেল বাহিনী মোটেও প্রস্তুত ছিলো না, তাই ডাভেল সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা।

সেনাপতি বুদাইল শত্রু বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, তার পাঠানো অন্য দু'ভাগের সেনারা শত্রু বাহিনীকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করেছে, তিনিও তার বাহিনী নিয়ে শত্রুদের মধ্যভাগে আঘাত হানলেন। হিন্দুরা তিনদিক থেকে যুগপৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে গেলো, এখন তারা বিজয়ের জন্যে নয়, প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর জন্যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করছিলো। রণক্ষেত্র ছিলো সম্পূর্ণ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। ডাভেল বাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে লাগলো। কিন্তু এমতাবস্থায়ই সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমে এলো। আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে শত্রু বাহিনীর সেনারা পালাতে শুরু করলো। রাতের অন্ধকার সেদিনের মতো যুদ্ধ মুলতবি করে দিলো। সেনাপতি বুদাইলের সেনারা ছিলো সফর ও যুদ্ধে ক্লান্ত। তারা সফরের অবস্থাতেই যুদ্ধ করেছে ফলে তাদের পক্ষে আর ডাভেলের দিকে অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখা সম্ভব হলো না। সেনাপতি বুদাইলের নির্দেশে সেখানেই রাতযাপনের সিদ্ধান্ত নিলো তারা।

* * *

সকালে সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল ডাভেলের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের চার পার্শ্বে অসংখ্য শত্রুসেনাদের মরদেহ ছড়িয়ে রয়েছে। রাতে শত্রুসেনাদের মরদেহ বাঘ, শিয়াল জংলী জানোয়ারেরা ছিড়ে খেয়েছে আর সকাল হতেই শকুনে ভিড় করেছে মরা দেহের উপর। অসংখ্য শকুন শত্রুদের মরদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। কোন শত্রু দল তাদের মরদেহ উঠানোর জন্যে আসেনি।

রণাঙ্গন থেকে ডাভেলের দিকে রওয়ানা করে মুসলিম বাহিনী বেশী দূর অগ্রসর না হতেই একদিক থেকে বিরাট আকারে ধুলিবালি উড়তে দেখা গেলো। সৈন্য ও সেনাপতিদের জন্যে এই ধুলিবালি অপরিচিত কোন জিনিস নয়। বুদাইল ধুলিস্তর দেখেই বুঝতে পারলেন শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই এ বাহিনী সিন্ধুরাজার সৈন্য। সেনাপতি বুদাইল সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে নিলেন।

দেখতে দেখতে ধুলোবালির অন্ধকার এগিয়ে আসতে লাগলো। যখন একেবারে কাছে চলে এলো তখন বুদাইল দেখতে পেলেন বিশাল এক বাহিনী উট ও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে। এদের মধ্যভাগে রয়েছে হস্তিবাহিনী।

ঐসিহাসিকগণ লিখেন, সিন্ধুরাজা দাহির ডাভেল সেনাদের সাহায্যের জন্যে পাঠিয়েছিলো এ বাহিনী। দাহিরের বাহিনীতে চার হাজারের চেয়ে বেশী অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী সৈন্য ছিলো। তা ছাড়া আধা ডজন প্রশিক্ষিত হাতিও ছিলো। বলা হয় রাজা দাহিরের রক্ষিতা পুত্র জেসিয়া এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলো।

ডাভেলের দিকে মুসলিম সেনারা অগ্রসর হচ্ছে এ খবর অরুঢ়ে পৌছার সাথে সাথেই রাজা দাহির দ্রুতগতিতে সেনা অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলো। এ বাহিনী জানতো না, ডাভেলের সৈন্যরা প্রথম সংঘর্ষেই পরাজিত হয়ে পালিয়েছে।

সেনাপতি বুদাইল অগ্রাভিযান মুলতবী করে সেনাদেরকে তিনভাগ করে ছড়িয়ে দিলেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সেনা সংখ্যা তিন হাজারের নীচে নেমে এসেছিলো। পূর্বদিনের লড়াইয়ে কয়েকশ সৈন্য আহত ও কিছু সংখ্যক নিহত হয়। সিন্ধু বাহিনীর সুবিধা ছিলো, তাদের প্রত্যেকেই ছিলো অশ্বারোহী, নয়তো উষ্ট্রারোহী প্রশিক্ষিত হাতিও ছিলো তাদের সহযোগী। এছাড়া তারা ছিলো বিজয়ের নেশায় উজ্জীবিত।

সেনাপতি বুদাইল আগে আক্রমণ না করে শত্রুদেরকে আগে আঘাত হানার সুযোগ দিলেন এবং তার বাহিনীকে বেশী এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন। হিন্দুরা প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানলো। মুসলিম বাহিনী কয়েকবার দুই প্রান্তে আঘাত করার চেষ্টা করলো কিন্তু দাহিরের ছেলে খুবই দক্ষতার সাথে তার বাহিনীকে প্রত্যাঘাত থেকে বাঁচিয়ে মোকাবেলা করছিলো।

দেখতে দেখতে যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হলো। হাতির উপর থেকে মুসলিম বাহিনীর দিকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো। দাহির পুত্র জেসিয়া ছিলো একটি হাতির উপরে উপবিষ্ট। দিনের শেষ ভাগে মুসলমানদের জন্যে যুদ্ধটি কঠিন হয়ে উঠলো। সেনাপতি বুদাইল জেসিয়ার হাতিটিকে অকেজো করে দেয়ার জন্যে মধ্যভাগে অগ্রসর হয়ে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেনাপতি বুদাইল তার একান্ত রক্ষীদের নিয়ে জেসিয়ার হাতির কাছাকাছি পৌঁছে জেসিয়ার হাতির শুঁড় কাটার চেষ্টা করছিলেন। আর হাতির উপর থেকে অসংখ্য তীর তার দিকে ছুড়ে মারছিলো শত্রু সেনারা।

এক পর্যায়ে সেনাপতি বুদাইল হাতির কাছে চলে গেলেন, তিনি হাতির শুঁড়ে আঘাত হানবেন, এমন সময় তার কোন সহযোদ্ধার বর্শা হাতির শুঁড়ে আঘাত হানে। হাতি বিকট চিৎকার দিলে সেনাপতি বুদাইলের ঘোড়া ভড়কে গিয়ে উল্টো লাফিয়ে উঠে। এতে সেনাপতি বুদাইল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। অমনি শত্রু সেনারা তাকে ঘিরে ফেললো। তিনি পড়ন্ত অবস্থা থেকে উঠার আগেই শত্রুবাহিনী তাকে ধরে ফেললো কিন্তু দাহির পুত্র গর্জন করে বললো—"ওকে ধরার দরকার নেই ছেড়ে দাও।" সেনারা ছেড়ে দিতেই জেসিয়ার নিক্ষিপ্ত বর্শা তার বুকে বিদ্ধ হলো এবং সেনাপতি বুদাইল শাহাদাত বরণ করলেন।

কেন্দ্রীয় কমান্ডের অভাবে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। বিক্ষিপ্তভাবে আরব সৈন্যরা সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই করলো। কিন্তু যুদ্ধের কায়া পাল্টে গেলো। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে আহত ও নিহতের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। অবশেষে অন্ধকার উভয় বাহিনীর মধ্যে দেয়াল সৃষ্টি করলে যে যেদিকে পারে পালাতে লাগলো। অন্যথায় মুসলিম বাহিনী প্রায় নিঃশেষে নিহত হতো কিংবা বন্দী হয়ে পৌত্তলিকদের জিন্দানখানায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে হতো।

* * *

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের মৃত্যুও মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের খবর যখন বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পৌঁছালো, অপমান ক্ষোভ ও অনুতাপে তার মাথা ঝুকে গেলো। হাজ্জাজের মনে হচ্ছিলো বর্শা সেনাপতি বুদাইলের বুক বিদীর্ণ করেনি, হাজ্জাজের নিজের বুক বিদীর্ণ করেছে। তিনি যখন মাথা উপরে উঠালেন, তখন ক্ষোভে তার চেহারা রক্তিম হয়ে গেছে, চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে রক্তবাণ।

"এতোটা কাপুরুষ তো ছিলো না বুদাইল!" অনুতাপ অনুশোচনা স্বগতোক্তি করলেন হাজ্জাজ। সে একটি শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে আরেকটি বাহিনীর কাছে হেরে গেলো কেন?"

"আমীরে ইরাক! আপনার উপর আল্লাহ্ রহম করুন। আল্লাহ্ সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের বীরত্ব ও শাহাদাত কবুল করুন! তিনি ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি শত্রুদের আক্রমণ করতে দুশমনদের মধ্যভাগে চলে গিয়েছিলেন। সেনাপতির কথা ভুলে তিনি সিপাহীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি হিন্দু সেনাপতির রক্ষণভাগ গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। শত্রু সেনাপতির নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে তার ঘোড়াকে শত্রু সেনাপতির হাতির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় হাতির উপর থেকে শত্রু বাহিনী তার উপর যেভাবে তীর বর্শা নিক্ষেপ করছিলো, তা থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করে শত্রু সেনাপতিকে বহনকারী হাতির শুঁড় কেটে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আহত হাতির ভয়ংকর চিৎকারে তার ঘোড়া ভড়কে গিয়ে লাফিয়ে উল্টে পড়লে তিনি মাটিতে পড়ে যান, আর শত্রু বাহিনীর বর্শা তার গায়ে আঘাত হানে। তার এই সাহসিকতা বর্ণনাতীত। আল্লাহর কসম! তিনি ভীরু ছিলেন না, ভয় শংকার লেশমাত্র ছিলো না তার মধ্যে।"

ডাভেল থেকে ফিরে আসা তিন সেনার একজন এ কথাগুলো হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে বললো।

"তুমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলে?"

"জী, হ্যাঁ, আমীরে ইরাক! আমি যা বলছি, নিজের চোখে তা দেখে এসেছি। আমি তার পিছনেই ছিলাম, তিনি যখন বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়েন, তখন তার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে ছিলাম আমি।"

"বুদাইল মারা গেলো আর তুমি পালিয়ে এলে? রক্তচক্ষু নিয়ে সেনার দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বললেন হাজ্জাজ। ওর জীবন বাঁচাতে তুমি মরণ স্বীকার করতে পারলে না। সিংহের মতো বাহাদুর সেনাপতিকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করে তুমি পালিয়ে এলে?"

কথা শেষ করতে করতে হাজ্জাজ তরবারী কোষমুক্ত করে এক আঘাতেই সেনার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

"কাপুরুষ, ভীতু! ভীতু না হলে কেউ সেনাপতিকে শত্রুবেষ্টিত রেখে পালিয়ে আসতে পারে না" বলে হাজ্জাজ রক্তমাখা তরবারীটি তার একান্ত প্রহরীর দিকে ছুড়ে মারলেন।

দ্বিতীয় অভিযানের শোচনীয় পরাজয়ের খবরও যথারীতি দামেশকে পৌঁছে গেলো। খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক পরপর দু'বার অভিযান ও পরাজয়ের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে হাজ্জাজকে দামেশকে আসার জন্যে বার্তা পাঠালেন।

"আমীরুল মুমিনীন! খলীফার বার্তার জবাবে লিখিত জবাব দিলেন হাজ্জাজ। আপনি নিষেধ করার পরও কেন দ্বিতীয়বার আমি সিন্ধু অঞ্চলে সেনা পাঠালাম আর শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলাম, এর জবাবদিহির জন্যে যদি ডেকে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে এ মুহূর্তে আমি আসতে পারছি না। প্রথম অভিযানের সময় আমি এ শর্তে আপনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম যে, যে ক্ষয়ক্ষতি এ অভিযানে হবে আমি রাজকোষ এর দ্বিগুণ সম্পদে ভরে দেবো। আমি তখনই আমিরুল মুমিনীনের মুখোমুখী হবো, যখন আমার শর্ত আমি পূরণ করতে সক্ষম হবো। সিন্ধু অভিযান এখন আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এখন আমি আমার ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠাবো। আশা করি আমিরুল মুমিনীন আমার এ সিদ্ধান্তে বাধা দিবেন না। জাতির সামনে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। পৌত্তলিকদের অহমিকা চূর্ণ করে মুসলমানদের বিজয় কেতন সিন্ধু রাজার রাজপ্রাসাদে উড্ডীন করার সুযোগ দিয়ে জাতির আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখার সুযোগ দিবেন।"

"ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক হাজ্জাজের চারিত্রিক অবস্থা জানতেন। জানতেন হাজ্জাজ কোন ব্যাপারে জিদ ধরলে তা না ঘটিয়ে ক্ষান্ত হয় না। এসব কারণে হাজ্জাজকে তিনি রীতিমত আতংক মনে করতেন।

খলীফার দূত হাজ্জাজের সকাশে থাকাবস্থায়ই সেনাপতি আমের বিন আব্দুল্লাহ্ হাজ্জাজের সাথে দেখা করতে এলেন এবং বললেন—

"সম্মানিত আমীর! আপনি যদি আমাকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান, তাহলে আমি কেবল আগের দু'পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েই ক্ষান্ত হবো না, অভিযানে যতো ব্যয় হয়েছে, তাও পূরণ করে দেবো। আর সিন্ধু এলাকার কর্তৃত্ব আপনার পায়ের নীচে এনে দেবো।"

"তোমার মনে যদি কোন বদ চিন্তা না থেকে থাকে, একজন সেনাপতি হিসেবে এ প্রস্তাব করে থাকো, তাহলে তোমার প্রস্তাবের জন্যে আমি সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আমার মন বলছে, এ অভিযানের সাফল্য ঘরে তুলতে হলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রয়োজন।"

সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েল ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের খুবই প্রিয় ব্যক্তি। সেনাপতি বুদাইলের রণকৌশল ও বীরত্বের প্রতি হাজ্জাজ ছিলেন আস্থাশীল। সেনাপতি বুদাইলের মৃত্যুতে হাজ্জাজ খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি একদিন বসরার কেন্দ্রীয় মসজিদের মুয়ায্যিনকে ডেকে বললেন, "আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন এবং তোমার কণ্ঠের আওয়াজকে আরো বুলন্দ করে দিন। তুমি আজ থেকে প্রত্যেক আযানের পর সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের নাম উচ্চ আওয়াজে উচ্চারণ করবে, যাতে আমি তার কথা ভুলে না যাই এবং তার রক্তের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকি এবং প্রতি নামাযের পর বুদাইলের জন্যে দু'আ করতে পারি।"

* * *

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দ্বিতীয় সিন্ধু অভিযান যখন ব্যর্থ হয়েছে এবং সেনাপতি বুদাইলের শাহাদাত ও মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ে হাজ্জাজ প্রতিশোধ স্পৃহায় অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন, তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম পারস্যের সিরাজ এলাকার গভর্নর। কয়েক মাস আগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফই মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে এই বলে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, রায়া এলাকায় যে উপজাতীয়রা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এসব বিদ্রোহ দমনের জন্যে তুমি সেনা অভিযানের প্রস্তুতি নাও। সেনাভিযান ছাড়া এসব উপজাতীয় বিদ্রোহ দমনের বিকল্প কোন পন্থা নেই। উপজাতীয়দের বিদ্রোহের দুঃসাহস চিরতরে নিঃশেষ করে দাও। নয়তো এরা এক সময় সালতানাতের জন্যে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন হাজ্জাজের নির্দেশে উপজাতীয় বিদ্রোহ দমনে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন এবং রায়া অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন, ঠিক এমন সময় তার কাছে হাজ্জাজের পয়গাম এলো—

"প্রিয় বৎস! আজ সেই সময় উপস্থিত, যার জন্যে আমি তোমাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি। রায়া অভিযান মুলতবি রেখে তুমি সিরাজেই অবস্থান নাও। আমি তোমার জন্যে সৈন্য পাঠাচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যে বাহিনী পৌঁছে যাবে। তোমাকে সিন্ধু অভিযানে যেতে হবে। আমি যে কোন মূল্যে সিন্ধু অঞ্চলকে সালতানাতের পতাকাতলে দেখতে চাই। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবিলম্বেই জানতে পারবে। ইতোমধ্যে আমাদের দু'টি অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিস্তারিত দূতের কাছ থেকে জেনে নিও। আল্লাহর কাছে শুধু এতটুকুই কামনা, তিনি যেন তোমার এ অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত না করেন।"

তৃতীয় ও চূড়ান্ত সিন্ধু অভিযানের প্রস্তুতির জন্যে হাজ্জাজ নাওয়া খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিলেন। দিনরাত তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও রসদপত্রের আয়োজনে অষ্ট প্রহর ব্যাপৃত তিনি। এক শুক্রবারে বসরার সকল পুরুষকে একত্রিত করে তিনি ভাষণ দিলেন —

"হে বসরাবাসী! তোমাদের মনে রাখা উচিত, সময় দু'ধারী তরবারীর মতো। সময় শতত পরিবর্তনশীল। আজ এর পক্ষে তো কাল ওর পক্ষে। সময় কখনো আমাদের অনুকূলে থাকে, আবার কখনো আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। অনুকূল পরিস্থিতিতে আমাদের আলস্যে ভর করা উচিত নয়। সময় অনুকূলে থাকার সময় আমাদের উচিত নিজেদের শক্তিকে শাণিত এবং সেনাবাহিনীকে সংগঠিত ও সুসংহত করা। আর সময় প্রতিকূলে চলে গেলে সময়ের বয়ে আনা প্রতিকূলতাকে শক্ত ও দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকর আদায় করা। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও অফুরন্ত অনুগ্রহ বিস্মিত হওয়া মোটেও ঠিক নয়। আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়...।

প্রিয় বসরাবাসী! আমি সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের কীর্তি ভুলতে পারছি না। স্বজাতির এক অসহায় কন্যার ফরিয়াদ আমার কানে সময় সময় ঘন্টার মতো ধ্বনিত হচ্ছে-হাজ্জাজ! আমাদের উদ্ধার করো, হাজ্জাজ! আমাদের সাহায্য করো...। বুদাইলের রক্তের প্রতিশোধও আমাকে অস্থির করে তুলেছে। মনে হয় সে আমাকে ডাকছে, 'হাজ্জাজ প্রতিশোধ নাও, হাজ্জাজ পৌত্তলিকদের

দর্প চূর্ণ করো...। আল্লাহর কসম! আমি অসহায় আরব নারী-শিশুদের উদ্ধার ও সেনাপতি বুদাইলের রক্তের প্রতিশোধ নিতে ইরাকের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবো না। পৌত্তলিকদের উচিত শিক্ষা না দেয়া পর্যন্ত আমার চিত্ত স্থির হবে না।

হে আরববাসী! শুধু আরবদের জাত্যাভিমান নয়; ইসলামের চেতনার মর্ম মূলে আঘাত হেনেছে এক মূর্তিপূজারী বেঈমান রাজা। রাজা দাহির আমাদের নারী-শিশু বন্দী করে আমাদের তিরস্কার করছে। তোমরা কি দুশমনদের বুঝিয়ে দিতে অক্ষম যে, কোন্ জাতিকে উস্কানী দিচ্ছে এ পৌত্তলিক। নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় যে জাতি অবলীলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে ভ্রূক্ষেপ করে না, অসহায় আর্তের সাহায্য যে জাতির ঐতিহ্য, সেই জাতির ধমনী কি আজ এমনই শীতল হয়ে গেছে, শরীরের রক্ত জমে গেছে যে, স্বীয় কন্যা-জায়া-তরুণীদের সম্ভ্রম ও শিশুদের জীবন বাঁচানোর আর্তনাদেও তাদের চৈতন্যোদয় হবে না?"

হাজ্জাজের ভাষণ শেষ হতে না হতেই চতুর্দিক থেকে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, জিহাদ, আল জিহাদ, লাব্বাইকা ইয়া হাজ্জাজ। শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। আবেগ উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে উঠলো সমাবেশ।

* * *

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দূত যখন সিরাজে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পৌঁছলো, তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম রায়া অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় দূতকে দেখে পয়গাম দ্রুত হাতে নিয়ে চকিতে চোখ বুলালেন তিনি। তার চেহারার রং বদলে গেলো, তিনি পয়গামটি একপাশে ফেলে দিলেন ছুঁড়ে মারার মতো করে।

"হু, চাচা তো এখনো ততোটা বুড়ো হয়নি। কিন্তু তার বিবেক এতোটা কমজোর হয়ে গেলো কি করে? সিন্ধু অভিযানের জন্যে কি আর কোন সেনাপতি ধারে কাছে ছিলো না? আমাকে এতো দূর থেকে কেনো যেতে হবে? তিনি কি জানেন না, রায়া উপজাতিদের বিদ্রোহ দমনে আমাকে কতোটা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে? আমি এখান থেকে চলে গেলে আবারো কি বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না? আর এমন কি ঘটলো যে, এখনও পর্যন্ত সিন্ধু রাজার কবল থেকে বন্দীদের মুক্ত করা গেলো না?"

“আমীরে সিরাজ! আপনার উপর আল্লাহ্ রহম করুন!” বললো দূত। বন্দীদের উদ্ধার করতে গিয়ে দু’টি অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, দু’জন সেনাপতি ইতোমধ্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং দু’বার মুসলিম বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে।”

“দু’জন সেনাপতি প্রাণ দিয়েছেন? বলো কি? বিস্ময়ে হতবাক হলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। তিনি দূতকে বললেন, বলো, তাড়াতাড়ি বলো, কি ঘটেছিলো সেখানে, কারা ছিলেন সেনাপতি?”

“প্রথম অভিযানে আব্দুল্লাহ বিন নাবহান সেনাপতি ছিলেন। তিনি সিন্ধু উপকূলের ডাভেল বন্দর দখলের অভিযানে শাহাদত বরণ করেন। তার বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধাও শাহাদত বরণ করে। দ্বিতীয় অভিযানের সেনাপতি ছিলেন বুদাইল বিন তোফায়েল। তিনিও শাহাদত বরণ করেন। তার শাহাদত আমাদের বাহিনীর জন্যে পরাজয়ের কারণ ঘটে। তৃতীয়বার সেনাপতি আমের বিন আব্দুল্লাহ তাকে সিন্ধু অভিযানে পাঠানোর জন্যে আপনার চাচার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজ বললেন, না, আর কারো প্রতি আমি আস্থা রাখতে পারছি না। আমার ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে আমি অভিযানে পাঠাবো। আমার বিশ্বাস, বিজয় তার পদচুম্বন করতে বাধ্য হবে।”

দূতের কথা শুনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের চেহারায় যে পরিবর্তন দেখা দিলো, তা ছিলো ব্যাপক অর্থবোধক। একটা গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন করে ফেললো বিন কাসিমকে। তিনি দাঁড়িয়ে পিছনে হাত বেঁধে দৃঢ় পায়ে কক্ষ জুড়ে পায়চারী করছিলেন, আর দূত তার পিছু পিছু হাঁটছিলো। তিনি গভীর দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে কি যেনো হিসেব করছিলেন। দূত নিবিষ্ট মনে তাকে অনুসরণ করছিলো।

“ইবনে নাবহান ও ইবনে তোফায়েল তো পরাজয় বরণ করার মতো সেনাপতি ছিলেন না।” দাঁড়িয়ে দূতকে লক্ষ্য করে বললেন বিন কাসিম।

“আল্লাহর কসম! তারা রণাঙ্গনে পিঠ দেখানোর মতো ব্যক্তি ছিলেন না। উভয়েই বেপরোয়াভাবে শত্রু বাহিনীর রক্ষণভাগে ঢুকে পড়েছিলেন।”

দূত দু’টি সিন্ধু অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে বর্ণনা দিলো। আরো জানালো, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মানসিক অবস্থা।

“তার অবস্থা এমনটিই হওয়া উচিত।” বললেন বিন কাসিম। আরবদের নাওয়া খাওয়া হারাম হয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। প্রতিটি আরব মুসলমানের স্ত্রী গমন হারাম করে দেয়া উচিত।”

ঠিক আছে। তুমি এখন গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো। শরীরটা ঠিক হলে চলে যেয়ো। চাচাকে বলবে, আপনার ভাতিজা আপনার আশা পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ্! হ্যাঁ, আমি অবশ্যই আমাদের বন্দীদের এবং আল্লাহ্ যদি সহায় হন, সিন্ধু অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু মন্দির চূড়ায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করবো।”

দূত চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মুহাম্মদ বিন কাসিম তার পারিষদবর্গকে ডেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পয়গামের কথা ব্যক্ত করলেন।

পারিষদবর্গের একজন বললেন, আমীরে মুহ্তারাম! রায়া অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন মুলতবি করে দেয়ার কথাটা হাজ্জাজ ঠিক বলেননি। সিন্ধু অভিযানে এখান থেকে শুধু আপনিই যাচ্ছেন। আর আপনার ক'জন দেহরক্ষী যাবে। আর আমরা তো এখানেই আছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আপনার অবর্তমানেও বিদ্রোহ দমন অভিযান আমরা অব্যাহত রাখবো।”

“আমরা যদি এ পর্যায়ে এসে বিদ্রোহ দমন অভিযান মুলতবি করে দেই, তাহলে উপজাতিদের গোয়ার্তুমী প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার ধারণ করবে।” বললেন অপর একজন কর্মকর্তা।

“আমি আপনাদের অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু এ কথাটি আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, দু'বার সিন্ধু অভিযানে পরাজিত হওয়ার পর তৃতীয় কোন পরাজয়ের সংবাদ হাজ্জাজ কোন অবস্থাতেই শুনতে চাইবেন না। পরাজয় তার কাছে অসহ্যকর হয়ে গেছে। তিনি পরাজয়ের জন্যে আর কোন সৈনিক, সেনাপতিকে ক্ষমা করার কথা ভাবতেও রাজি হবেন না। আপনারা সবাই তাকে কমবেশী জানেন। আমি তো এখানে থেকেই বুঝতে পারছি, তার মানসিক অবস্থা এখন কেমন।”

“পরিণতির কথা মাথায় রেখেই আমাদেরকে বিদ্রোহ দমনাভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।” বললেন অপর কর্মকর্তা।

“হাজ্জাজের উপরে আল্লাহ্ আছেন। আমাদের হাজ্জাজের সন্তুষ্টি নয় আল্লাহর সন্তুষ্টিই কাম্য হওয়া উচিত।” বললেন একজন সেনাপতি।

"তার পারিষদবর্গ কি বলছে সেদিকের চেয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বেশী মনোযোগ আকৃষ্ট করে ফেলেছিলো সিন্ধু অঞ্চলের মানচিত্র। তিনি সিন্ধু অঞ্চলের মানচিত্র মেলে ধরে সেদিকে তাকিয়ে পারিষদবর্গের কথা শুনছিলেন। আর সিন্ধু অঞ্চলের অবস্থা চিন্তা করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

* * *

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মন-মানসিকতা অনুধাবন করা আর কারো পক্ষে তখন সম্ভব ছিলো না। প্রতিশোধের নেশায় হাজ্জাজ প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। হাজ্জাজ যদি কারো উপরে ক্ষেপে যেতেন, তবে সেই আন্দাজ করতে পারতো। হাজ্জাজের মতের বিরুদ্ধে কেউ বাধা দিলে তিনি তার শিরোচ্ছেদ করে ফেলতেন। কখনো এমন মনে হতো যে স্বজাতির সকল মানুষকেই হত্যা করে ফেলবেন হাজ্জাজ। কোন অধীনস্থ তার হুকুমের ব্যতিক্রম করাকে তিনি মোটেই বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। মামুলী ব্যাপারেও অনেক ক্ষেত্রে হাজ্জাজ তার অধীনস্থদের কঠোর শাস্তি দিতেন। হাজ্জাজের হাতে স্বজাতির যতো লোক নিহত হয়েছে, এতো লোক শত্রুপক্ষেরও নিহত হয়নি। যে পরিমাণ মুসলমানের রক্ত হাজ্জাজের হাতে প্রবাহিত হয়েছে, এ পরিমাণ দুশমনদেরও সম্ভবত হয়নি। সেই কঠোর কঠিন হাজ্জাজ কিভাবে নিরপরাধ আরব নারী শিশুদের এক লুটেরা হিন্দু রাজার হাতে নির্যাতিত হওয়াকে সহ্য করতে পারেন! অবশ্য একথা বলা চলে, হাজ্জাজ তার বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্যে ছিলেন কঠোর আর দুশমনদের জন্যে ছিলেন সাক্ষাত মৃত্যু।

রাতের বসরা হয়ে উঠলো দিনের মতো কর্মমুখর। হাজ্জাজ যে নির্দেশ দিতেন, তিনি এর শতভাগ বাস্তবায়ন দেখতে চাইতেন। সিরীয় সৈন্যদের থেকে তিনি বেছে বেছে ছয় হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে বসরার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁবু ফেলে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলেন। এসব সৈন্যরা একাধারে রাতদিন তরবারী, তীর ও বর্শা চালনার উম্মত প্রশিক্ষণ নিতে লাগলো। সেই সাথে চললো অশ্বারোহণ মহড়া। কোন সৈন্য যদি ক্লান্ত হয়ে থেমে যেতো কিংবা পড়ে যেতো, তাহলে হাজ্জাজের নির্দেশ ছিলো, "তাকে চাবুক মেরে তুলে দেবে।"

সৈন্যদের প্রশিক্ষণ হাজ্জাজ নিজে তদারকি করতেন। হাজ্জাজ যখন দেখতেন, সৈন্যদের শরীর ক্লান্তি অবসাদে চুরচুর হয়ে গেছে। তখন তিনি সবাইকে একত্রিত করে বলতেন, "তোমরাই ইসলাম ও আরবের মর্যাদার

রক্ষক। সেই সাথে একথা চিন্তা করো, যে সব নারী ও শিশুকে হিন্দু রাজা বন্দী করে রেখেছে, এরা তোমাদের কারো না কারো মা, বোন অথবা কন্যা।"

অপর একদিন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হাজ্জাজ বললেন, "আজ আবারো আমি তোমাদের বলছি, অসহায় এক আরব কন্যা আমাকে সাহায্যের ডাক দিয়েছে, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি...। আমি একাকী কি তাদের মুক্ত করতে পারবো? তোমাদের আত্মমর্যাদা কি একথা সায় দিবে? তোমাদের নির্যাতিতা অসহায় বিপন্ন কন্যা-জায়াদের মুক্ত করতে আমি কোন চেষ্টাই না করি। আমি তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ভুলে থাকবো?... না, তোমরা আমার সঙ্গী না হলেও আমার পক্ষে তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা সম্ভব নয়, আমি একাকী হলেও তাদের ডাকে সাড়া দেবো...।"

"আমরাও যাবো।" এক বাক্যে সমবেত সৈন্যদের মুখে উচ্চারিত হলো। সৈন্যরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, "আপনি একা নন, আমরাও যাবো।"

এভাবে সারা দিনের কঠোরতম পরিশ্রমে অবসন্ন ক্লান্ত সৈন্যদেরকে নানা কথায় হাজ্জাজ উজ্জীবিত করতেন, তাদের আত্মমর্যাদাবোধকে চাঙ্গা করে তুলতেন এবং আবেগকে আন্দোলিত করতেন। যার ফলে কঠোর পরিশ্রান্ত সৈন্যরা সারাদিনের কষ্টকর প্রশিক্ষণের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠতো।

* * *

ট্রেনিং এর পাশাপাশি বসরার উন্মুক্ত মাঠে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অসি চালনা ও ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। মল্লযুদ্ধেরও করলেন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। এসব আয়োজনের ফলে সেই দিনগুলোতে মনে হতে লাগলো ইরাক ও সিরিয়ার সকল ঘোড়া ও উট বসরার মাঠে এসে জড়ো হয়েছে।

হাজ্জাজ সারা দেশে প্রচার করে দিয়েছিলেন, "বসরায় ঘোড় দৌড়, অশ্বচালনা, তরবারী চালনা, বর্শা নিক্ষেপ, মল্লযুদ্ধ, হাতিয়ার ও লাঠি খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এসব প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হবে কিংবা দক্ষতা দেখাবে, তাদেরকে সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে ভর্তি করে নেয়া হবে এবং দেশের বাইরে তাদেরকে এমন জায়গায় যুদ্ধে পাঠানো হবে, যেখান থেকে তারা লাভ করবে অঢেল ধন-সম্পদ।"

সে সময় মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধ যেমন ছিলো উন্নত, তেমনি সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদে আসীন হওয়া এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী সৈন্য হিসেবে মালে গনীমতের অধিকারী হওয়ার প্রতি আগ্রহ থাকতো যে কোন আরব যুবকের। সৈন্য ভর্তির মেলা ও প্রতিযোগিতা চললো টানা কয়েকদিন।

দিন যতোই যেতে লাগলো প্রতিযোগী যুবকদের ভীড়ও মেলাঙ্গনে মানুষের সমাগম আরো বাড়তে লাগলো। হাজ্জাজ বসরার কিছু লোককে নিয়োগ করে রেখেছিলেন, তারা মেলাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে মানুষের মধ্যে প্রচার করতো সিন্ধু অঞ্চলের এক হিন্দু রাজা মুসলমানদের একটি জাহাজ লুট করে জাহাজে আরোহী বহু আরব নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবককে বন্দী করে রেখেছে। আমাদের উচিত আরবের মর্যাদা রক্ষায় যুদ্ধ করে হিন্দু রাজাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আরব শিশু কন্যাদের মুক্ত করে আনা। প্রচারক দল নানাভাবে ভাষার লালিত্য দিয়ে মেলায় আগত মানুষের মধ্যে জাত্যাভিমান জাগিয়ে দিচ্ছিলো। যা হাজ্জাজ প্রত্যাশা করেছিলেন। এর ফলে মেলায় আগত সকল মানুষের মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকের মধ্যে জাত্যাভিমান ও ইসলামের চেতনা উজ্জীবনী শক্তিতে পরিণত হয়।

মেলা চলাকালে কয়েক দিন প্রতিযোগিদের উৎসাহ দিতে হাজ্জাজ নিজেও উপস্থিত হয়ে সমবেত দর্শক প্রতিযোগিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করেন, যে কথা তিনি বসরার জামে মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান প্রতি বছর দামেশকে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। সেই প্রতিযোগিতা দেখা ও অংশগ্রহণের জন্যে বহু দূর থেকে লোকজন আসতো। ঘটনাক্রমে যেদিনগুলোতে খলীফা আব্দুল মালিক সামরিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন, ঠিই একই সময়ে বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বসলেন। কিন্তু হাজ্জাজের প্রতিযোগিতার প্রচারণা এতোটাই তুঙ্গে ছিলো যে, দামেশকের অধিকাংশ লোক হাজ্জাজের মেলায় যোগদান করতে বসরায় চলে এলো।

সেদিন ছিলো মেলার ষষ্ঠ দিন। অস্ত্রবিহীন চার অশ্বারোহী একে অন্যের সওয়ারী কেড়ে নেয়া এবং অশ্বপৃষ্ঠ থেকে প্রতিপক্ষকে ফেলে দেয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। চার প্রতিযোগির প্রত্যেকেই সমানে সমান। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। উর্ধ্বশ্বাসে সবাই ঘোড়া ছুটাচ্ছে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে

আর দর্শকদের চিৎকার উল্লাসে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর অশ্বারোহীদের কসরতে মাঠের ধুলোবালি আকাশে উঠে যাচ্ছে। মধ্য মাঠ ধুলোতে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে হাজ্জাজ প্রতিযোগিদের পাশাপাশি তার ঘোড়া হাঁকিয়ে তাদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। হাজ্জাজের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিরা যেমন উজ্জীবিত হলো দর্শকরাও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লো।

দর্শকদের কোলাহলে বসরার সবকিছু চাপা পড়ে গেলো। হাজ্জাজ প্রতিযোগিদের দিকে নিবিষ্ট ছিলেন ঠিক এ মুহূর্তে ধুলি অন্ধকারের মধ্য থেকে ধাবমান এক অশ্বারোহী এসে হাজ্জাজের ঘোড়ার পাশাপাশি নিজের ঘোড়া হাঁকাতে লাগলো। কিন্তু হাজ্জাজের সেদিকে খেয়াল ছিলো না, তার পাশেই আর এক অশ্বারোহী রয়েছে। হঠাৎ আরোহী হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "বসরার আমীর কি আমাকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিতে চান?" হাজ্জাজের কানে ভেসে এলো তাকে চ্যালেঞ্জ করার আওয়াজ। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইলেন, কোনো অশ্বারোহী তাকেই চ্যালেঞ্জ করছে কি-না। হাজ্জাজ দেখলেন তারপাশেই খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক।

খলীফাকে তার পাশে চলতে দেখে হাজ্জাজ না বিচলিত হলেন, না তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো। অথচ তিনি জানতেন, খলীফা দামেশক থেকে এসেছেন, এ সময় তার দামেশকেই থাকার কথা। হাজ্জাজ খলীফার ঘোড়াকে ঠেলে ঠেলে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে ঘোড়া থামালেন।

"মনে হচ্ছে ইবনে ইউসুফ আমাকে শুধু ঘোড়া থেকেই নয় মসনদে খেলাফত থেকেই ফেলে দিতে চাচ্ছেন" বললেন, খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক। নয়তো আপনি বসরায় এ ধরনের মেলার আয়োজন করছেন, তা অন্তত আমাকে জানাতে পারতেন। আপনি কি জানেন না, এ সময় বসরায় সামরিক উৎসবের আয়োজন করা হয়?"

"খলীফাতুল মুসলিমীন! গুরু গম্ভীর সম্মোহনী কণ্ঠে বললেন হাজ্জাজ। আপনার প্রতিযোগিতা হয় একটি বিনোদনমূলক উৎসব। আর আমি এ আয়োজন করেছি প্রয়োজনের তাকিদে। আমি সিন্ধু আক্রমণের জন্যে সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্যে এ ব্যবস্থা করেছি। আশা করি আপনার গোয়েন্দারা আপনাকে সবই বলেছে। না বললে এ সময়ে আপনার এখানে আসার কথা নয়।"

"আপনি রীতি রক্ষার প্রয়োজনেও আমাকে এ সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি যে, দ্বিতীয় আরেকটি অভিযানে আমাদের সৈন্যরা সিন্ধু রাজের কাছে

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। এখন তৃতীয়বার আপনি অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু... সেই পরাজয়ের লজ্জা কি আপনাকে আমার দরবারে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে?" জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন খলীফা।

হাজ্জাজ ঠোঁটের কোণে ঈষৎ ক্রোড় হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, "লজ্জা যদি কাউকে করতে হয়, তাহলে আমি শুধু আল্লাহকেই করি। খলীফাতুল মুসলিমীন! স্বভাবত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে বললেন হাজ্জাজ। আপনি সেই সময় দুনিয়াতে এসেছেন, যখন আমি পূর্ণ যুবক। আমি দুনিয়ায় যা দেখেছি, আপনি তা দেখেননি। আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। আমি এ বয়সেও যা করতে সক্ষম, আপনার পক্ষে তা হয়তো সম্ভব নয়। আপনি আপনার মসনদকে ঘিরে চিন্তা করেন, আমার চিন্তা সমগ্র আরব ও মুসলিম সালতানাতকে ঘিরে।

আমি জানি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আপনি চান আমি কেন অভিযানের আগে আপনার অনুমতি নিলাম না। আমি জানতাম, আপনি আমাকে অভিযানের অনুমতি দেবেন না। আমি আপনাকে বলেছিলাম, সিন্ধু অভিযানে যে পরিমাণ সরকারী সম্পদ ব্যয় হবে, আমি তার দ্বিগুণ সম্পদ সরকারী কোষাগারে জমা দেবো। এখন আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সিন্ধু এলাকার কর্তৃত্ব আপনার পায়ের নীচে এনে দেবো।"

খলীফাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে হাজ্জাজ আরো বললেন, আমি যদি এই হিন্দুরাজার ঔদ্ধত্যের জবাব না দেই, তাহলে এরা আজ আমাদের জাহাজ লুট করে আরোহীদের বন্দী করেছে, কাল এখানে এসে আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধরে নিয়ে যাবে। দু'টি পরাজয় যদি আমরা হজম করে নেই, তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয়, আপনি খেলাফতের মসনদে নয় নিজেকে দুশমনের বন্দীশালায় দেখতে পাবেন।"

খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর অবস্থান ও যুদ্ধ প্রস্তুতির পরিস্থিতি দেখে আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। আসলে তখন মুসলমানদের অবস্থা পূর্বের মতো ছিলো না। মসনদে সীমিত হয়ে পড়েছিলো মুসলমানদের জাঁকজমক। খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক সিন্ধু অভিযানের বিপক্ষে ছিলেন। চাহিদার পরিপন্থী হলেও এটা ছিলো একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। খলীফা নির্বিবাদে খেলাফতের মসনদে সমাসীন থাকাটাই পছন্দ করতেন।

হাজ্জাজ সিরীয় সেনা ইউনিট থেকে সিন্ধু অভিযানের জন্যে যে ছয় হাজার সেনাকে নির্বাচন করেছিলেন, এদের সবাই ছিলো অশ্বারোহী কিংবা উষ্ট্রারোহী। এরা শুধু বাহনওয়ালাই ছিলো না, প্রত্যেকেই ছিলো টগবগে যুবক, তাগড়া। বয়স্ক দুর্বল ও অচৌকস কোন সেনাকেও হাজ্জাজ এ দলে অন্তর্ভুক্ত করেননি। সামরিক মেলার আয়োজন করে মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকেও ছয় হাজার যুবককে নির্বাচন করে হাজ্জাজ আরেকটি সেনা ইউনিট গড়ে তোলেন। এরা দীর্ঘ প্রশিক্ষিত সৈন্য না হলেও ছিলো দক্ষ, চৌকস ও উজ্জীবিত তারুণ্যের অধিকারী। এ বাহিনীকে গঠন করা হয় মূল বাহিনীর সহযোগী হিসেবে। সাপ্লাই ও রসদপত্র সরবরাহের সেচ্ছাসেবী এবং প্রয়োজনে সৈন্যবল বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করার জন্যে।

হাজ্জাজ সেনাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেন। সেনাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজন তিনি এভাবেই পূরণ করলেন, মনে হচ্ছিলো এরা সৈনিক নয় যেন শাহী খান্দানের লোক। সুঁই সুতা থেকে নিয়ে খাদ্য বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুই তিনি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী ও উন্নতমানের সরবরাহ করেন। তখন ইরাকের লোকেরা যে কোন আহারে সিরকা বেশী ব্যবহার করতো। হাজ্জাজ প্রত্যেক সৈন্যের জন্যে পর্যাপ্ত সিরকার ব্যবস্থা করেন। তরল সিরকা পরিবহন সমস্যা মনে করে সিরকায় তুলা ভিজিয়ে তা শুকিয়ে প্যাকেট করে দেন। যাতে খাবার সময় সিরকা ভেজানো তুলা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে সৈন্যরা সাচ্ছন্দ্যে আহার করতে পারে। তিনি সেনাপতি ও কমান্ডারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সৈন্যদের খাবার ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণে যেন কোনরূপ কৃচ্ছ্রতার আশ্রয় না নেয়। কারণ সৈনিকদের ব্যবহার্য সবকিছুই তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করেছিলেন।

হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানে প্রাত্যহিক খরচ নির্বাহের জন্য ৩০ হাজার দীনার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেন। সৈন্যদের খাবার ও রসদ পত্র জাহাজে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং পদাতিক সৈন্যদের জন্যে ছয় হাজার দ্রুতগামী উষ্ট্রী জাহাজে প্রেরণ করেন। এ ছাড়াও পণ্য পরিবহনের জন্য দিয়েছিলেন কয়েক হাজার উট।

জাহাজে পাঠানো সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে অন্যতম ছিলো মিনজানিক। ছোট বড় মিনজানিক ছিলো কয়েকটি। তন্মধ্যে একটি মিনজানিক এতোটাই বিশাল ছিলো যে, পাঁচশ মানুষ প্রয়োজন হতো এটাকে ঠেলে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নেয়া এবং এটি দিয়ে পাথর নিক্ষেপের জন্য। এই মিনজানিকের

নাম ছিলো 'উরুস'। এটি দিয়ে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হতো। যে পাথর পাঁচ ছয় জন মানুষে গড়িয়ে গড়িয়ে মিনজানিকের মধ্যে তুলে দিতো। উরুসের নিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথর যে কোন কঠিন দুর্গ প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি করতে। এবং শত্রুদের জন্যে এটি ছিলো ভয়ানক ও ধ্বংসের হাতিয়ার।

তৃতীয় ও চূড়ান্ত সিন্ধু অভিযানের বিশাল ব্যবস্থাপনার জন্যে হাজ্জাজ বহুমুখী প্রচারণার দ্বারা জনগণের মধ্যে যেমন জাত্যাভিমান ও ইসলামী চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তদ্রূপ ইরাকের নারী পুরুষের মধ্যে জাগাতে পেরেছিলেন জিহাদী আবেগ। ইরাকের নারীরা তাদের স্বামী, সন্তানদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করছিলেন এবং জিহাদের ব্যয় নির্বাহে নিজেদের সঞ্চিত সম্পদ ও অলংকারাদি হাজ্জাজের জিহাদ ফান্ডে অকাতরে ঢেলে দিয়েছিলেন। যার ফলে এতো বিশাল আয়োজন করা হাজ্জাজের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো।

হাজ্জাজের নবগঠিত সেনাবাহিনী প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যখন সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে বসরা থেকে সিরাজের পথে রওয়ানা হলো, সেদিন বসরার সকল নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সেনাবাহিনীর রণসজ্জা দেখা এবং তাদের বিদায় জানানোর জন্যে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। মুজাহিদদের সাফল্য ও শত্রুদের প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়লো বসরার লোকজন। হাজ্জাজ যেন সবার বুকে আগুন ধরিয়ে দিলেন। জনতার মুহুর্মূহু শ্লোগান ও শুভ কামনায় সিক্ত হয়ে হাজ্জাজের নবগঠিত বাহিনী বসরা ছেড়ে সিরাজের পথে অগ্রসর হতে লাগলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সেনাদের সাথে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন। অবশেষে একটি উঁচু জায়গায় থেমে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে শেষ সৈন্যটি তাকে অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি সৈন্যদের গমন প্রত্যক্ষ করলেন এবং হাত নেড়ে তাদের সাফল্যের জন্য দু'আ করতে থাকলেন। দীর্ঘক্ষণ সেনাদের আত্মীয়-স্বজনেরা সৈন্যদের গমন পথের ধুলা উড়ার দৃশ্য অবলোকন করে তাদের পুত্র, স্বামী, ভাইদের বিজয়ের দু'আ করে অবশেষে ঘরে ফিরলেন। এই বাহিনীর সহ-সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হলো জাহাম বিন জাফর জাইফীর কাঁধে।

* * *

হাজ্জাজের প্রেরিত সেনাদের পৌঁছার জন্যে বড় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। সেনাদের পৌঁছার অপেক্ষা করাটা ছিলো তার জন্যে পীড়াদায়ক। তিনি কোন কাজে অহেতুক সময় ক্ষেপণ করাটা মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। মাঝে মধ্যে তিনি ঘোড়ায় চড়ে বসরার পথে বহু দূর পর্যন্ত সৈন্যদের আসার খবর জানার জন্যে চলে যেতেন। একদিন নিজের কক্ষে কাজে মগ্ন ছিলেন বিন কাসিম। হঠাৎ তার কক্ষের দরজা সজোরে খুলে গেলো এবং তিনি কিছুদিন যাবত যে সংবাদের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সে খবর পৌঁছে গেলো।

"বসরার দিকে বহু দূরে ধুলি ঝড় দেখা যাচ্ছে। আল্লাহর কসম! এটা ধুলিঝড় নয়।" বললো সংবাদদাতা।

"ঘোড়া প্রস্তুত কর।" নির্দেশ দিলেন বিন কাসিম। ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

দ্রুত ছুটালেন ঘোড়া। সাথে সাথে তার দেহরক্ষী দল তার অনুসরণ করলো। অনেক পথ অগ্রসর হয়ে বসরার সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানালেন বিন কাসিম। এখন হাজ্জাজের নির্দেশ মতো গোটা বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। জাহাম বিন জাইফী হলেন তার সহযোগী।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু অভিযানের খবরাখবর দ্রুত পাওয়া ও নির্দেশ পৌঁছানোর জন্য বসরা থেকে মাকরান পর্যন্ত বহু সংখ্যক সেনা চৌকি স্থাপন করলেন। এসব চৌকিতে কিছু সংখ্যক সৈন্য, দ্রুতগামী ঘোড়াসহ দক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য অবস্থান করতো। তারা উভয় দিকের বার্তা দ্রুত অপর চৌকিতে পৌঁছে দিতো। এভাবে অস্বাভাবিক দ্রুতার সাথে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন হাজ্জাজ। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, স্বাভাবিকভাবে বসরা থেকে মাকরান পৌঁছতে একজন মুসাফিরের সময় লাগতো যেখানে দেড়মাস, সেক্ষেত্রে হাজ্জাজ মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সংবাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

জাহাম বিন জাইফীর কাছে হাজ্জাজ মৌখিকভাবে বলে দিয়েছিলেন বিন কাসিম তার পরবর্তী নির্দেশ পাওয়ার আগে যেনো আক্রমণ শুরু না করেন। ডাভেলে পৌঁছার আগেই কিছু ছোট ছোট দুর্গ অস্ত্রমুক্ত করার আবশ্যকতা ছিলো। কিন্তু হাজ্জাজ পুনর্নির্দেশ দেয়ার শর্ত করায় বিন কাসিমকে হাজ্জাজের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

হাজ্জাজের প্রেরিত বাহিনী সিরাজ পৌঁছার পরদিনই মুহাম্মদ বিন কাসিম মাকরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। সে সময় আরব সাগরের কূলে অবস্থিত মাকরানের যে অংশটি মুসলিম শাসনাধীন ছিলো এর শাসক ছিলেন মুহাম্মদ বিন হারুন। তাকে আগেই সংবাদ পাঠানো হয়েছিলো তৃতীয় এবং চূড়ান্ত আঘাতের জন্যে নতুন সেনাবাহিনী আসছে। তাই মাকরানের শাসক বিন হারুন কিছুটা পথ এগিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনীকে স্বাগত জানাতে ঘোড়ার পিঠে বসে রইলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মনে করেছিলেন মাকরানের শাসক হয়তো ঘোড়া দৌড়িয়ে তার কাছে চলে আসবেন। কিন্তু তিনি দেখলেন বিন হারুন ঘোড়ার পিঠে অধোমুখে ঠাঁয় বসে আছেন। তিনি এ অবস্থা দেখে নিজেই ঘোড়া হাঁকিয়ে কাছে গিয়ে যখন তার সাথে মোসাহাফা করলেন, তখন অনুভব করলেন বিন হারুনের দেহে প্রচণ্ড জ্বর। জ্বর এতোটাই তীব্র যে তার ঘরের বাইরেই বের হওয়া উচিত ছিলো না। কিন্তু মুহাম্মদ বিন হারুন স্বদেশী সৈন্যদের স্বাগত জানানোর আবেগকে ধরে রাখতে পারেননি। প্রচণ্ড জ্বর নিয়েই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই অসুখ নিয়েই তিনি বিন কাসিমের বাহিনীকে সঙ্গ দেন, সার্বিক সহযোগিতা করেন। আর এই অসুখেই তার মৃত্যু ঘটে।

* * *

একদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম তার সৈন্যদের নিয়ে মাকরান পৌঁছেন অপর দিকে সৈন্যদের জন্যে রসদ, খাবার ও অস্ত্রবহনকারী জাহাজ ও বড় বড় নৌকাও পৌঁছে গেলো মাকরানের উপকূলে। জাহাজ ও নৌকা থেকে আসবাব পত্র নামাতে কয়েক দিন লেগে গেলো। তদুপরি সব আসবাব পত্র জাহাজ থেকে নামানো হয়নি; কারণ স্থলভাগে বহন করা কষ্টসাধ্য ভেবে সেগুলোকে ডাভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

বিশাল আকারের জাহাজ ও নৌকা বহরের হাজার হাজার অশ্ব, উট, আহার সামগ্রী ও সৈন্য বাহিনীকে লুকিয়ে রাখা ছিলো অসম্ভব। তাই শত্রুদের অজ্ঞাতে তাদের উপর আক্রমণ করা যাবে সেই সুযোগ পাওয়ার সম্ভবনা মোটেও ছিলো না। কারণ রাজা দাহিরও যে আরবের পুনরাক্রমণ আশংকায় খোঁজ খবর পাওয়ার প্রতি যত্নবান ছিলো, সেটা মুহাম্মদ বিন কাসিমের বুঝতে বাকী রইলো না। অবশ্য এক্ষেত্রে বিন কাসিমকে বেশী ভাবাচ্ছিলো মাকরানে বসতি স্থাপনকারী

আরব মুসলমানরা। যারা হাজ্জাজ ও খলীফা ওয়ালিদের শাসনের প্রতি বিদ্রোহ করে দেশ ত্যাগ করেছিলো এবং রাজা দাহিরের আশ্রয়ে মাকরানেরই একটি অংশে বসতি স্থাপন করেছিলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন এ এলাকা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞাত। মাকরান এলাকাটি কিছুটা বালুকাময় থাকার কারণে আরব অঞ্চলের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্য ছিলো বটে। কিন্তু এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলো না বিন কাসিমের। এজন্যে রাতের বেলায় মাকরানের শাসক বিন হারুনের বাসভবনে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু অঞ্চলের মানচিত্র দেখছিলেন আর বিন হারুন তাকে মানচিত্রের বিভিন্ন এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সেই সাথে বলছিলেন বিভিন্ন জায়গার দূরত্ব, অবস্থান, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

"সম্মানিত গভর্নর! আমি এ অল্প বয়সে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছি। আপনাদের দু'আয় যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও নগণ্য নয়। কিন্তু স্বপক্ষ ত্যাগী গাদ্দারদের আমি ভীষণ ভয় করি, শত্রুকে নয়।" বললেন বিন কাসিম।

"ও, তুমি কি সেই আরবদের কথা বলছো, যাদেরকে রাজা দাহির আশ্রয় দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, তাদের ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন। কারণ তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। তাছাড়া আরবরা দক্ষ যোদ্ধা, লড়াকু। তারা নিশ্চয়ই রাজা দাহিরের পক্ষাবলম্বন করবে। কারণ রাজা দাহির আশ্রয় দিয়ে তাদের বিরাট উপকার করেছে।"

"আমাদের বিরুদ্ধে আগের দুই যুদ্ধে বিদ্রোহী আরবদের কেউ অংশ গ্রহণ করেছিলো এমন কোন খবর আমরা পাইনি।" বললেন মাকরানের শাসক। আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, রাজা দাহির আলাফীকে তার সহযোগিতা করার জন্যে প্রস্তাব করেছিলো এবং লোভও দেখিয়েছিলো, কিন্তু আলাফী এতে সম্মত হয়নি।"

"আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, সম্মানিত আমীর! আমি আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা করেই বলতে চাই, আপনার দেয়া তথ্যকে আমি বিশ্বাস করি। আপনি দেখেছেন বিগত দুইটি অভিযানের চেয়ে বসরা ও সিরিয়ার শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবার অনেক বেশী সৈন্য পাঠিয়েছেন। এই বিশাল

বাহিনীকে অবতরণ করতে দেখে রাজা দাহির নিশ্চয়ই তার সহযোগীদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য জোর চেষ্টা চালাবে। এও তো সম্ভব, যে কোন মূল্যে সে আরব অভিবাসীদেরকে তার পক্ষে যুদ্ধ করতে সম্মত করবে।" বললেন বিন কাসিম।

"এ ব্যাপারে আমরা আলাফীকে ডেকে কথা বলতে পারি। আমরা আলাফীকে রাজা দাহিরের সহযোগিতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে পারি। অবশ্য এর আগে এরা এক যুদ্ধে রাজা দাহিরের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলো এবং দাহিরের এক শক্তিশালী শত্রুকে এরাই শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলো। যাক, তুমি চাইলে আমি আলাফীকে এখানে ডেকে আনতে পারি।"

"তাকে কি এখানে ডেকে আনা সম্ভব?"

"ডাকলে হয়তো নাও আসতে পারে, তবে খবর পাঠিয়ে দেখা যাক। আমি তাকে গোপনে এক জায়গায় আসার কথা বলবো, সেখানে গোপনে আমি এবং তুমি অথবা তুমি একাকী তার সাথে দেখা করে কথা বলবে।" বললেন মাকরানের শাসক।

"আমি তো তার ঠিকানায় গিয়ে কথা বলতেও প্রস্তুত।" বললেন বিন কাসিম।

"না ভাই! যে আমাদের শাসক ও খলীফার বিদ্রোহী। তার প্রতি এতোটা আস্থাবান হওয়া ঠিক হবে না। কারণ বিদ্রোহী মন কখন কি করে বসে ঠিক নেই। তুমি একজন দক্ষ সেনাপতি ও বিচক্ষণ যোদ্ধা হতে পারো, তারপরও আমি বলবো, এ ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করাই সমীচীন হবে। আমি বরং এমন এক জায়গায় তাকে সাক্ষাতের কথা বলি যেটা আমাদের দখলে নয় আবার তার নিয়ন্ত্রণাধীনও নয়।" এই বলে মাকরানের শাসক এক ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলেন।

ডাকে সাড়া দিলো এক মধ্যবয়সী লোক।

"ইবনে হারসামা! তুমিই পারবে এ কাজটি করতে। বনী উসামার হারেস আলাফীকে আমার কথা বলবে। সেই সাথে বলবে অমুক জায়গায় সাক্ষাত করতে।"

"সম্মানিত শাসক। আলাফীকে ডাকার কারণ জানতে পারি কি? কারণ আমি কি তাকে বলবো মুহাম্মদ বিন হারুন আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। সে যদি আমার কাছে আরব সেনা উপস্থিতির কথা জানতে চায় তাহলে কি বলবো?"

"সে সতর্ক মানুষ। আরবের সেনা উপস্থিতির কথা তার কাছে অস্বীকার করা ঠিক হবে না। তাছাড়া সৈন্য আগমনের বিষয়টিও তার না বোঝার কথা নয়। এসব কথা তোমাকে বলে দেয়ার বিষয় নয়, তুমি বুদ্ধিমান লোক। তোমার মূল কাজ হলো, তাকে সাক্ষাতের জন্যে রাজি করানো। আশা করি তুমি তা পারবে। আমরা কেন তার সাথে সাক্ষাত করতে চাই, তাও তার বুঝতে অসুবিধে হবে না।"

মুহাম্মদ বিন হারুন একটি জায়গার কথা বলে বললেন, আলাফীকে নিয়ে তুমি আজ রাত এশার পর সেখানে উপস্থিত হবে।"

* * *

মাকরানে আট দিন কেটে গেছে বিন কাসিমের। এ দিনগুলোতে জাহাজ থেকে আসবাবপত্র, পণ্য সামগ্রী ও রসদ নামানোতেই লেগে গেলো। এ ছাড়া যেসব সামগ্রী ও রসদ ডাভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সেগুলো যাচাই করে অন্য জাহাজে তোলা হলো। আর এরই মধ্যে যেসব এলাকা দিয়ে বিন কাসিমকে অগ্রসর হতে হবে যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী সেসব এলাকার আগাম পরিস্থিতি জানার জন্যে বিন কাসিম অগ্রবর্তী গোয়েন্দাদের পাঠিয়ে দিলেন। মাকরানের যে এলাকায় সেনাবাহিনী অবতরণ করলো, সেই এলাকাটি সেনাদের ব্যস্ততা ও কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে উঠলো। মনে হচ্ছিলো যেন দিন রাত সবই একাকার হয়ে গিয়েছে। আর বিন কাসিমের সেনারা প্রস্তুতি নিচ্ছিলো যথাযথ আক্রমণের।

* * *

এদিকে রাজা দাহির তার রাজ দরবারে সমাসীন। তার সভাসদবর্গ উপস্থিত। আরব সেনাদের আগমন সংবাদ পেয়ে রাজা দাহির জরুরী সভা তলব করেছে। সংবাদ বাহকদের সংবাদ পাওয়ার পর রাজা দাহিরের পারিষদবর্গ কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় প্রহরী এসে খবর দিলো, "এক উষ্ট্রারোহী বাইরে অপেক্ষা করছে মহারাজ! মনে হয় কোন জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছে।"

"ওকে এক্ষণই এখানে নিয়ে এসো।" আগন্তুক দৌড়ে রাজ দরবারে প্রবেশ করে মেঝেতে বসে দু'হাত প্রসারিত করে রাজাকে কুর্নিশ করে হাঁটু ভাঁজ করে বসলো।"

“কি খবর এনেছো?”

“পানি, এক ঢোক পানি!”

সংবাদবাহী পানি ছাড়া আর কোন কথাই বলতে পারলো না। ক্ষুৎ-পিপাসায় লোকটির মুখ হাঁ হয়ে গেছে। রাজার নির্দেশে তড়িঘড়ি এক গ্লাস পানি আগন্তুককে পান করানো হলো। পানি পান করে আগন্তুক বললো, “মহারাজের জয় হোক। আরব দেশ থেকে এখন যে সেনাবাহিনী এসেছে, এটি কোন বাহিনী নয় উট, ঘোড়া আর মানুষের প্লাবন। জাহাজ থেকে যেসব রসদপত্র নামানো হয়েছে, এসবের কোন হিসাব কিতাব নেই। সৈন্য সংখ্যাও কতো তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। মাকরানের উপকূল জুড়ে জাহাজ ও নৌকার সংখ্যা এতো বিপুল যে, জাহাজের ভিড়ে কোন কিছুই আন্দাজ করা যায় না।”

“এ আগন্তুক ছিলো মাকরানের সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত দাহিরের এক গোয়েন্দা সদস্য। সে এক পথিকের কাছে শুনতে পায় যে, বহু জাহাজ ভরে আরব দেশ থেকে অগণিত সৈন্য মাকরানে অবতরণ করছে। খবর পেয়ে রাজা দাহিরের এই গোয়েন্দা বেশ বদল করে মাকরানের মুসলিম শাসিত এলাকায় গিয়ে স্বচোখে আরব সৈন্য অবতরণের দৃশ্য দেখে দ্রুতগামী উটে সওয়ার হয়ে রাজ-দরবারে সংবাদ নিয়ে আসে।

দাহিরের এ গোয়েন্দা রাজাকে জানায়, “আমি শুনেছি, জাহাজে করে যে পরিমাণ সৈন্য এসেছে এর চেয়ে ঢের বেশী এসেছে স্থলপথে। আসলে রাজা দাহিরের সংবাদ বাহকের খবর ছিলো অতিরঞ্জিত। সে নিজে যেমন মুসলিম বাহিনীর অবতরণ দৃশ্য দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো, সে অনুযায়ী রাজার কাছে যে রিপোর্ট দিলো তা ছিলো ভীতি জাগানিয়া। বাস্তবের চেয়ে বহুগুণ বেশী ভীতিকর হিসেবে চিত্রিত করেছিলো সে বিন কাসিমের বাহিনীকে। যার ফলে রাজা দাহিরের মধ্যে দেখা দেয় মারাত্মক শংকা। রাজা দাহির সাধারণ বৈঠক মুলতবি করে সামরিক অফিসারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসলো। প্রধান উজির বুদ্ধিমানকে রাখা হলো এ বৈঠকে।

বৈঠকে রাজা তার সেনা অফিসারদের জানালো, “আবার আরবরা আক্রমণ করতে এসেছে। বলো এবার আরব সেনাদের কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে?” আমাদের হাতে দু'টি সেনাপতি হারিয়ে এবং দু'বার পরাজিত হয়ে ওরা আমাদের শক্তির কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পেরেছে। এ জন্যই মনে হয় এবার বেশী সংখ্যক সৈন্য ও রসদপত্র নিয়ে এসেছে। ওদের দেমাগ খারাপ হয়ে গেছে। এবার

একটা বড় সেনাবাহিনীকে বাজি খেলায় পাঠিয়েছে। আমরা এবারের বাজিতেও বিজয়ী হবো। এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি?" অন্যদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন জুড়ে দিলো রাজা।

রাজার সেনা কর্মকর্তারা রাজার মতোই উচ্চাশা নিয়ে রাজার মতকেই সমর্থন করলো। তাদের কেউই রাজার মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করার সাহস পেলো না। ব্যতিক্রম ছিলো একমাত্র দাহিরের প্রধান উজির বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলো। সবার মতামত দেয়ার পালা শেষ হলে উজিরে আযম বুদ্ধিমান বললো—

"মহারাজ! রণাঙ্গনে তরবারী কাজ করে অহংকার কাজ করে না। সেখানে তীর বল্লম কাজ করে, অহংকার চাপাবাজি রণাঙ্গনে কোনই কাজে আসে না। কায়সার ও কিসরা আরব মুসলমানদের দুর্বল ভেবেছিলো। ইয়াজ্‌দেগির্‌দ তো বলেছিলো, আরব সৈন্যরা তার ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেলো, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী শক্তিশালী রোম ও পারস্য বাহিনীকে আরবরা পরাজিতই শুধু করেনি, শোচনীয়ভাবে নাস্তানাবুদ করেছে। এটা কোন কাল্পনিক গল্প নয়—রূঢ় বাস্তব ঘটনা।

"হ্যাঁ, এটাতো সত্য ঘটনা। ওখানে মুসলমানরা হিন্দুস্তানের হাতিগুলো পর্যন্ত বেকার বানিয়ে ফেলেছিলো।" বললো রাজা। আচ্ছা কি যেন নাম ছিলো সেই রণাঙ্গনের?"

"কাদেসিয়া।" বললো উজির বুদ্ধিমান। আগত মুসলমানরা ওইসব যোদ্ধারই সন্তান। এরা ইচ্ছা করলে আমাদেরও পরাজিত করতে পারে। এখন যদি ওরা অনেক বেশী সৈন্য নিয়ে এসে থাকে, তাহলে এই সৈন্যদের সেনাপতিও পূর্বের সেনাপতিদের তুলনায় বেশী অভিজ্ঞ ও দক্ষ। এমনও হতে পারে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নিজেই কমান্ড করবে। মহারাজ তো হাজ্জাজের নির্মমতা ও কঠোরতার কাহিনী শুনেছেন। আশ্রিত আরবরা আমাকে বলেছিলো, খলীফাকে হাজ্জাজ তেমন আমল দেয় না। হাজ্জাজ তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় তার ইচ্ছামতো শাসন চালায়।"

"হাজ্জাজ নিজে সেনাপতি হলে তাতে কি হবে?" জিজ্ঞেস করলো রাজা দাহির। তাহলে আমিও আমার সেনাবাহিনীর কমান্ড আমার হাতে রাখবো।

শুধু এটাই নয় মহারাজ। আপনার জেনে রাখা উচিত লড়াই শুধু রণাঙ্গনেই হয় না। সব লড়াই শুধু তীর ঢাল তলোয়ারে সীমাবদ্ধ থাকে না। সর্বক্ষেত্রে বিজয়

শুধুই শক্তিশালী সামরিক শক্তির অধিকারীদের পক্ষে যায় না, দুর্বলের ভাগ্যেও কোন কোন সময় জয় লিখা হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দুর্বল প্রতিপক্ষও শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পঙ্গু করে দেয়।"

"এটা কি করে সম্ভব?" রাজা দাহির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো উজির বুদ্ধিমানের কাছে। জবাবের অপেক্ষা না করেই রাজা দাহির বললো, "উজির যদি মনে করে থাকো যে, আমরা রণাঙ্গনে মোকাবেলা না করে অন্য কোন ধোঁকা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে শত্রুদের পরাভূত করতে পারবো সেটাকে আমাদের রক্ত প্রশ্রয় দেবে না। আমরা রণাঙ্গনে শত্রুদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে চাই এবং আমাদের তলোয়ারের কার্যকারিতা দেখাতে চাই। দু'বার আমরা যাদের হাঁটু ভেঙে দিয়েছি, তৃতীয়বারও অবশ্যই ওদের পরাজিত ও বিতাড়িত করতে সক্ষম হবো।"

"কিন্তু বিষয়টা সে রকম নয় মহারাজ! আমি অন্য কথা বলছি। হাজ্জাজ নিজে যদি এই বাহিনীর কমান্ড দেয় তাহলে যুদ্ধের পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের হয়ে যাবে মহারাজ! বললো উজির বুদ্ধিমান। আমি একথা বলছি না যে, মহারাজ দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকুন। লড়াই আমাদের করতেই হবে এবং রণাঙ্গনেই মোকাবেলা হবে। কিন্তু লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আগে শত্রুদেরকে যদি দুর্বল করে দেয়া যায়, তাহলে সেটি হবে বিজয়ের জন্যে সহায়ক। তখন খুব তাড়াতাড়ি শত্রুদের মাথা কেটে দেয়া সম্ভব হবে।"

"কিভাবে শত্রুদেরকে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই দুর্বল করে দেয়া যায়?"

"কিছু কিছু দুর্বলতা মানুষের মধ্যে এমন থাকে যা বীর বাহাদুরকে দুর্বল এবং দুর্বলকেও বীর বাহাদুর করে ফেলে। রাজা যেমন রাজ সিংহাসন ছাড়া থাকতে পারে না, পুরুষ ও তদ্রূপ নারীসঙ্গ ছাড়া স্বস্তি পায় না। রাজা যেমন তার মুকুট জগতের সবচেয়ে মূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে সাজাতে চায়, প্রত্যেক সামর্থবান পুরুষও চায় তার চাহিদা মেটানোর জন্যে সবচেয়ে সুন্দরী রূপসী নারীর সঙ্গ।"

"কথাটা বুঝলাম না উজির। পরিষ্কার করে বলো এবং সেই কথা বলো যা কার্যকর করা সম্ভব।" উষ্মা মাখা কণ্ঠে বললো রাজা।

"মহারাজ! নারী একটা নেশা। সম্পদ ও ক্ষমতা এই নেশাকে আরো তীব্র করে তোলে। ক্ষমতা হাতে এসে গেলে এ নেশা মেটানোর সুযোগ পূর্ণতা পায় এবং নেশাগ্রস্থ পুরুষ তার ব্যক্তিত্ব আত্মসম্মান ও কর্তব্যবোধ ভুলে যায়। পাঁচ

ছয়শ মুসলমান অনেক দিন যাবত আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে আমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি এবং আরবদেরও খবর নিয়েছি, এদের শাসকদের ব্যাপারেও জেনেছি, এদের মধ্যে নারী ও দৌলতের দুর্বলতা খুবই কাজ করে। কাজেই তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার আগে এদেরকে নারী ও দৌলত দিয়ে অন্ধ বানিয়ে ফেলা হবে বেশী কার্যকর।"

"বুদ্ধিমান! তুমি কি হাজ্জাজ ও হাজ্জাজের বাহিনীর কথা বলছো?" পরিষ্কার বুঝে উঠতে না পেরে উজিরের কাছে জানতে চাইলো রাজা দাহির।

"না, আমি বলছি সেই আরবদের কথা যাদেরকে আপনি আপনার আশ্রয়ে রেখেছেন। বললো উজির। মহারাজ প্রথম যুদ্ধের বেলায়ই দেখেছেন এই আরবরা আক্রমণকারী আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছে। অথচ শাসকরা ওদের ঘোর দুশমন। তাদের শত্রু কবিলার হাতে খেলাফতের ক্ষমতা। এসব আশ্রিত আরব হলো বনী উসামা গোত্রের। আর বর্তমান আরব শাসকরা হচ্ছে বনী উমাইয়া গোত্রের। তদুপরি স্বদেশীদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে এরা নারাজ। এখন এদের মধ্যে ওদের জাতিগত শত্রুতা আর শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষকে চাঙ্গা করতে হবে। এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যার ফলে আগত আরব সৈন্যদের প্রতি আশ্রিত আরবদের ঘৃণা ও হিংসা আক্রোশে পরিণত হয়।"

"তাতো বুঝলাম। কিন্তু এখন সেই কথা বলো, যা দিয়ে আমি এসব আরবের রক্তে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি।" বললো রাজা দাহির।

"মহারাজের জয় হোক।" উচ্ছসিত কণ্ঠে বললো উজির। এ কাজের দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিয়ে নিচ্ছি। মহারাজ সৈন্যদের দিকে নজর দিন, তাদের প্রস্তুত করুন। লড়াইয়ের কলাকৌশল মহারাজ আমার চেয়ে ঢের ভালো জানেন। তবে আমার মতামত হলো, দুর্গের বাইরে ময়দানে গিয়ে লড়াই করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ মুসলিম বাহিনী ডাভেল পর্যন্ত আসবে। মহারাজের রাজধানী তাদের কাছে এতোটা মূল্যবান নয়, ডাভেল তাদের কাছে যতোটা দামী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডাভেল এ অঞ্চলের একমাত্র বড় সমুদ্র বন্দর। ডাভেলের আগে আমাদের আরো দু'টি ছোট ছোট দুর্গ আছে। এগুলো মুসলমানরা হাতিয়ে নিতে পারবে। অবশ্য তাতে উপকার হবে মহারাজের। কারণ এসব দুর্গে মুসলমানদের যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হবে এবং অবরোধ আরোপ করে দীর্ঘদিন কাটাতে

হবে। এতে করে তাদের আহার সামগ্রী ব্যয় হবে। ফলে ডাভেল পর্যন্ত পৌঁছাতেই তাদের অর্ধেক সম্পদ ব্যয় হয়ে যাবে। তারা ডাভেলকে অবরোধ করলেও মহারাজ রাজধানীতেই অবস্থান করবেন, তাতে ফায়দা হবে এটাই যে, ডাভেল জয় করে যখন ওরা রাজধানীর দিকে, অগ্রসর হবে তখন ওদের সৈন্যরা ক্লান্তি অবসাদ ও রসদপত্রের ঘাটতির শিকার হবে। এমতাবস্থায় আমরা আশ্রিত আরবদের প্রস্তুত করে ওদের দিয়ে হাজ্জাজের বাহিনীর উপর আঘাত করাবো।"

উজির বুদ্ধিমানের পরিকল্পনা ছিলো যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। দৃঢ়তার ছাপ ছিলো তার কথায়। রাজা ও রাজার অপর কোন সেনাপতি উজির বুদ্ধিমানের পরিকল্পনার বিপরীতে যৌক্তিক কথা বলতে পারেনি। তাই উজিরের পরামর্শ মেনে নিয়ে রাজা ও সেনাপতিরা সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে লেগে গেলো। বুদ্ধিমানের পরামর্শে রাজা দাহিরের সেনাপতি কূটকৌশলের প্রতি বেশী নজর দিলো। অপর দিকে রাজা প্রধান সেনাপতিকে নির্দেশ দিলো কোন চৌকস গোয়েন্দাকে মাকরান পাঠিয়ে আরব বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার সঠিক ধারণা নিয়ে আসার জন্যে। রাজা এই নির্দেশও দিলো, গোয়েন্দাকে শুধু সৈন্য সংখ্যা জেনে আসলে হবে না, মুসলিম বাহিনীর কমান্ড কে করছে, তাও জেনে আসতে হবে।"

* * *

মাকরানের শাসক মুহাম্মদ বিন হারুন ও বিন কাসিম মনে করেছিলেন হারেস আলাফী তাদের সাথে সাক্ষাতে না আসার সম্ভাবনাই বেশী। এটা ছিলো একটা অবিশ্বাস্য ধরনের ঘটনা যে, আলাফী শুধু নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সাথে সাক্ষাতের ওয়াদাই করেননি, আমীর মাকরানের পাঠানো দূতকে বিশেষ সম্মান ও ইজ্জত করে আগেই বিদায় করে দিয়েছেন এই বলে যে, তুমি গিয়ে আমীরে মাকরানকে বলো আমি অবশ্যই আসবো।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং আমীরে মাকরান ইবনে হারুন কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম দেহরক্ষী নেয়ার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু বিন হারুন বললেন, "উমাইয়া শাসকদের প্রতি এদের মধ্যে যে ক্ষোভ ও ঘৃণা রয়েছে, তাতে এদের উপর এতোটা আস্থা রাখা ঠিক হবে না। দেশ ত্যাগের বঞ্চনায় এদের মধ্যে কোন প্রতিহিংসা যে কোন সময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম ও আমীরে মাকরান দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাক্ষাতের জায়গা পৌঁছে দেখেন হারেস আলাফী একাকী দাঁড়ানো। আমীরে মাকরান নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছার আগেই দেহরক্ষীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার কিছু আগে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই তারা যেন গোটা এলাকাটিকে ঘিরে ফেলে এবং খুব সতর্ক থাকে যেন তাদের বেষ্টনীর মধ্য থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে কিংবা কেউ ঢুকতে না পারে।

চাঁদনী রাত। চাঁদনী রাতের খোলা ময়দানের দৃশ্য যেনো এক স্বপ্নালোকের অবতারণা করেছে। চারদিকে ঝি ঝি পোঁকার ডাক আর শীতল বাতাসের ঝাপটায় গাছ গাছালী ও ঝোপ ঝাড়ের শাখা দোলার মায়াবী শব্দ। এমতাবস্থায় নিরাবেগ ভঙ্গিতে হারেস আলাফী তার ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়ানো।

আমীরে মাকরান ও মুহাম্মদ বিন কাসিম তার কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে অগ্রসর হলে আলাফী উভয়ের সাথে মোসাফাহা করলেন।

"আমরা পরস্পর পরিচিত। আলাফীর উদ্দেশ্যে বললেন আমীরে মাকরান।

"আমরা দু'জন পরিচিত না হলেও একজন অপরজনকে জানি।" বিন কাসিমের দিকে তাকিয়ে হারেস আলাফী বললেন—আমি এই তরুণকে এই প্রথম দেখছি, তুমিই তো কাসিমের ছেলে! হাজ্জাজের ভাতিজা তাই না?

"দু'জন সেনাপতিকে হারানোর পরও হাজ্জাজ কি যুদ্ধটাকে শিশুখেলা মনে করেন না-কি?"

"জী হ্যাঁ, আমি বিন কাসিম। আমিই এ বাহিনীর সেনাপতি।"

"অভিজ্ঞ দু'জন সেনাপতি যেক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে তোমার মতো তরুণ কি করে সেনাপতির দায়িত্ব পালনের সাহস করতে পারে? তুমি কি তাদের চেয়েও বেশী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো? তুমি কি ভাবছো, এখানে তুমি জিতে যেতে পারবে? হাজ্জাজের ভাতিজা হওয়া ছাড়া তোমার সেনাপতি হওয়ার আর কি বিশেষ যোগ্যতা আছে?"

"জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে।" বললেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। আমি আমার গুণাবলী বলার জন্যে আপনার কাছে আসিনি। তবে একথা নিশ্চয়ই বলবো, শুধু ভাতিজা হওয়ার সুবাদে আমাকে সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়নি।...থাক এসব কথা। আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে মিলিত হয়েছি, এ ব্যাপারে কথা বলাই হবে বেশী যৌক্তিক।"

"হ্যাঁ, কাজের কথাই হওয়া উচিত।" বললেন আলাফী। তবে এর আগে আমি একটা কথা বলে নিতে চাই। তোমরা কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি। যার ফলে বিরাট নিরাপত্তা দল নিয়ে এসেছো। অথচ অবিশ্বাস কিন্তু তোমাদেরকে আমার করা উচিত ছিলো, কারণ আমি তোমাদের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী। কাজেই আমার তো ভয় করার কথা গ্রেফতার হওয়ার আশংকায়। এজন্য আমার সাথীরা আমাকে আসতে নিষেধ করেছিলো। কিন্তু আমি তাদের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এসেছি।"

"আল্লাহর কসম! আপনি যে আত্মশক্তিতে আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন, এর মূল্য দেয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, আল্লাহ আপনার এ আত্মবিশ্বাসের প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। আপনাকে আমীরে মাকরান নয় আমি ডেকেছি। আমি আপনাকে ডাকার স্পর্ধা পেয়েছি, আরব জাতির সম্মান ও আরবের মান রক্ষার প্রয়োজনে। আমি আপনাকে ডেকে পাঠাতে পারি না, অনুরোধ পাঠাতে পারি।"

"আমি জানি কেন তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চাও।" বললেন হারেস আলাফী। তুমি জানো না, যে কয়েদীদের মুক্ত করার জন্যে তোমরা এসেছো, এদের মুক্ত করতে গিয়ে ইতোমধ্যে তিন বিদ্রোহী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তারা কয়েদখানার ভিতরে ঢুকে পড়েছিলো কিন্তু কয়েদীদের মুক্তি বোধ হয় এ মুহূর্তে আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো না। তাই সম্ভব হলো না। আমি সেদিন আমার লোকজন নিয়ে দূরে অপেক্ষা করছিলাম। আমার কাজ ছিলো মুক্ত কয়েদীদেরকে আরবে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা। কয়েদীদের মুক্ত করার অভিযানে যে নেতৃত্ব দিয়েছিলো তার নাম বেলাল বিন উসমান। হারেস আলাফী বিন কাসিমকে বন্দী মুক্তির ব্যাপারে বেলালের চেষ্টার কথা বিস্তারিত জানালেন।

"আমি সেই বন্দীদের মুক্ত করতেই এসেছি।" বললেন বিন কাসিম। কিন্তু আমি ব্যর্থ হতে আসিনি। তবে এ কাজে আপনার সহযোগিতা আমার খুব প্রয়োজন।"

"উমাইয়া শাসকরা কি তোমাকে বলেছে আলাফীকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে নিতে? না হাজ্জাজের নির্দেশে তুমি এ পদক্ষেপ নিয়েছো? আলাফী আমীরে মাকরানের দিকে তাকিয়ে বললো। অবশ্য এটা আমীরে মাকরানের বুদ্ধিও হতে পারে।"

“না, দোস্ত! আমীরে মাকরান আলাফীর উদ্দেশ্যে বললেন। আপনার সাথে দেখা করে কথা বলার চিন্তাটা একান্ত বিন কাসিমের ব্যক্তিগত চিন্তা।”

“আমি সিরাজ থেকে সরাসরি এখানে এসেছি। আমি বসরায়ও যাইনি, দামেশকেও যাইনি। আমার কয়েকজন সেনাপতি এ আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, মাকরানে বসবাসকারী আরব মুসলমান বিদ্রোহীরা রাজার পক্ষাবলম্বন করতে পারে। বিষয়টিকে আমিও আশংকাজনক মনে করেছি। সেই আশংকা থেকেই আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন বোধ করেছি। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো। মনে না চাইলে আপনারা আমাদের সহযোগিতা নাই বা করলেন। কিন্তু সিন্ধু রাজের সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন। নয়তো ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের কলংক হয়ে থাকবে। সেই সাথে একথাও বলা হবে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় আপন ভাইদের পরাজিত করতে আরব মুসলমানরা বেঈমান হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলো...। যদিও আমি জানি, আমাদের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আপনার হৃদয়ে প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে কিন্তু মুসলমানদের সম্মান রক্ষায় আপনাকে এ অনুরোধ করতে আমি দুঃসাহস দেখাচ্ছি।”

“প্রিয় ভাতিজা বিন কাসিম! তোমার উপর আল্লাহ্ রহম করুন। মনে হচ্ছে, বয়সের তুলনায় তুমি অনেক বেশী বুদ্ধিমান ও সতর্ক। শোন, আমার ও আমার সাথীদের মনে বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ আছে। তুমি নিজেও তো উমাইয়া গোত্রের ছেলে ও ছাকাফী বংশের সন্তান।”

বিন কাসিম...তোমার চাচা হাজ্জাজ আমাদের সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে। সে আমাদের কবিলার এক সর্দার সুলাইমান আলাফীকে প্রথমে কয়েদ করেছে। অতঃপর তার মাথা কেটে আমাদের বংশের ছেলেদের হাতে নিহত মাকরানের গভর্নর সাঈদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো গভর্নরের স্বজনদের সন্তুষ্টি করার জন্য।”

“এসবই আমাদের গোত্রীয় শত্রুতা।” বললেন বিন কাসিম। কিন্তু আমি আপনাকে এমন এক দুশমনের কথা বলছি, যে দুশমনের কারণে আমরা পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে বন্ধুতে পরিণত হাতে পারি।”

“এসব কথা আমাকে বলতে হবে না বিন কাসিম! তুমি এমনটি মনে করো না, যে খান্দানী শত্রুতার কারণে আমি চিহ্নিত শত্রুকেই বন্ধু বানিয়ে ফেলবো।” বললেন আলাফী। তোমার হতাশ হওয়ার কারণ নেই বিন কাসিম! আমি ধর্মীয়

শত্রুকে আমার জাতির বিরুদ্ধে গিয়ে দোস্ত হিসেবে কোলে তুলে নেবো না। আমি তোমাদের সহযোগিতা করবো বটে। তবে তোমাদের সঙ্গ দেবো না। একথা স্মরণ রেখো, আমাদের শত্রুতা শাসকদের সাথে; আমার দেশ, আমার জাতি ও ধর্মের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। অহংকারী ও জালেম শাসকদের বিরোধিতা করা গাদ্দারী নয়, বরং অযোগ্য ও অপরিণামদর্শী শাসকদের কব্জা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা দেশ প্রেমের অংশ। আমরা আমাদের শাসকদের বিদ্রোহী ঠিক; কিন্তু শাসন ব্যবস্থার বিদ্রোহী নই। আমরা তাদেরই প্রতিবাদ করেছিলাম, যারা শাসক হওয়ার যোগ্য ছিলো না, অথচ জোর করে খেলাফতের মসনদ কব্জা করে রেখেছিলো।"

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেন, এই সাক্ষাতে হারেস আলাফী বিন কাসিমের কথায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিন কাসিমও হারেস আলাফীর আচরণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আলাফী বিন কাসিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রাজা দাহিরকে কোন ধরনের সহযোগিতা করবেন না বরং নেপথ্যে দাহিরের বাহিনীকে দুর্বল করার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করবেন। তবে আলাফী একথা বলেননি কিভাবে তিনি রাজার বাহিনীকে দুর্বল করার জন্যে চেষ্টা করবেন। একথাও তিনি জিজ্ঞেস করেননি, বিন কাসিম কখন কিভাবে কোথায় আক্রমণ করবেন। কারণ তাতে সংশয় ও সন্দেহ দানা বাধতে পারে, সৃষ্টি হতে পারে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের উপাদান।

এখানকার সেনাবাহিনী কতোটা লড়াকু? আলাফীর কাছে জানতে চাইলেন বিন কাসিম। আসলেই কি এখানকার বাহিনী এতোটা সাহসী, যার ফলে এরা দু'বার আমাদের দু'টি অভিযানের সেনাপতিদের হত্যা করেছে এবং শোচনীয়ভাবে তাদের কাছে আমাদের সেনারা পরাজিত হয়েছে?

"তুমি যদি এদের উপরে তোমার ভীতি ছড়িয়ে দিতে পারো তাহলে সহজেই রাজার বাহিনীকে কাবু করা সম্ভব।" বললেন আলাফী। এখানকার সেনাবাহিনী বাহাদুর নয় বটে তবে একেবারে কাপুরুষও নয়। আগের দু'টি অভিযানে এজন্য এরা বাহাদুরী করেছে যে, তোমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো কম এবং আক্রমণে ছিলো তাড়াহুড়া। হাজ্জাজ দাহির বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারেনি। এতোটা দূরে এসে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিটাই অন্য রকম হওয়া উচিত ছিলো। আমি তোমাদের সৈন্যবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জামের খবর পেয়েছি। এ বিপুল সৈন্যবাহিনীও সাজ-সরঞ্জামের সাথে যদি তোমাদের মধ্যে লড়াই করার

মতো আবেগ ও চেতনা থেকে থাকে তাহলে তোমাদের বাহিনীকে ঠেকানোর মতো বাহাদুর সেনা এ অঞ্চলে নেই। আর যদি তোমার চাচা হাজ্জাজও খলীফাকে খুশী করার জন্যে তোমরা যুদ্ধে এসে থাকো, তাহলে রাজা দাহিরের বাহিনীকে তোমাদের মোকাবেলায় বেশী শক্তিশালী দেখতে পাবে, আর পরাজয়ই হবে তোমাদের বিধিলিপি।

* * *

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানে হারেস আলাফী ও বিন কাসিমের সাক্ষাতটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। সেদিন যদি বিন কাসিম আলাফীকে তাদের সহযোগিতার প্রশ্নে সম্মত ও রাজা দাহিরের পক্ষাবলম্বন না করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ না করতে পারতেন, আর হারেস আলাফীর নেতৃত্বে পাঁচ/ছয়শ বিদ্রোহী আরব রাজা দাহিরের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো, তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারতো, ইতিহাস হতে পারতো অন্য রকম। আলাফীকে রাজার পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখার কূটনৈতিক আলোচনা পর্বটি ছিলো বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাফল্যের অন্যতম একটি দিক। কারণ তিনি একটি পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ শত্রুবাহিনীকে মায়া ও মমতা দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অবশ্য মাকরানের শাসক বিন হারুন আলাফীর প্রতিশ্রুতির উপর আস্থাবান ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন আলাফীর কথা সঠিক নাও হতে পারে; অতএব তাকে বিরোধী শিবিরে রেখেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আলাফীর সাক্ষাতের পর আক্রমণের জন্যে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেন বটে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক সরঞ্জাম জাহাজে পৌছার জন্যে অন্তত মাস খানিক মাকরানে তাকে অপেক্ষা করতে হলো। গুরুত্বপূর্ণ এসব সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে অন্যতম ছিলো মিনজানিক। বিন কাসিমের এ অভিযানে কয়েকটি মিনজানিক ব্যবহৃত হয়েছিলো। তবে সবচেয়ে বড় ছিলো "উরুস" নামের মিনজানিক।

অবশেষে প্রায় মাসখানিক পর মিনজানিক বহনকারী জাহাজও পৌছে গেলো। এসব সামরিক সরঞ্জাম জাহাজ থেকে নামানোর পরই বিন কাসিম তার সেনাদের অভিযানে যাত্রার নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যে দিন মাকরান থেকে ডাভেলের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন তখন তিনি দেখলেন মাকরানের শাসক বিন হারুনও অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে এগুচ্ছেন। তিনি মাকরানের শাসককে আসতে দেখে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিন হারুন ছিলেন খুবই অসুস্থ।

"আমীরে মাকরান! আপনি অসুস্থ। এখন আপনি গিয়ে আরাম করুন। তিনি আমীরে মাকরানের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। আপনি আমার ও সেনাবাহিনীর জন্যে দু'আ করুন।

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না আমি কোন্ পোশাকে এসেছি?" তোমাকে একাকী বিদায় করে আমি আরাম করতে পারি না। বললেন আমীরে মাকরান মুহাম্মদ বিন হারুন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন বয়সে আমীরে মাকরানের ছেলের বয়সী। বহুবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমীরে মাকরান যখন বাড়িতে ফিরে যেতে সম্মত হলেন না, তখন বিন কাসিম তাকে সাথে নিয়েই রওয়ানা করলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের গন্তব্য ছিলো ডাভেল। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে কন্নৌজপুর পেরিয়ে যেতে হবে। কন্নৌজপুর ছিলো রাজা দাহিরের একটি শক্ত ঘাঁটি। শহরটির পুরোটাই ছিলো দুর্গ ঘেরা। দুর্গ প্রাচীর যথেষ্ট মজবুত ছিলো। ইচ্ছা করলে বিন কাসিম কন্নৌজপুর এড়িয়ে ডাভেল যেতে পারতেন কিন্তু দুর্গম এ শহরে রাজা দাহিরের যথেষ্ট সেনা সমাবেশ করার আশংকা ছিলো। যার ফলে বিন কাসিম এ শহরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। তাই কন্নৌজ পুর দুর্গকে শত্রু মুক্ত করার জন্যে দুর্গ অবরোধ করা হলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্দেশে তার এক ঘোষক কন্নৌজ পুর দুর্গের সদর দরজার কাছে গিয়ে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করলো, "দুর্গ আমাদের কব্জায় ছেড়ে দাও, তাহলে শহরের বাসিন্দাদের জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হবে। আমাদের যদি দুর্গ কব্জা করতে হয়, তাহলে কারো জীবন সম্পদের নিরাপত্তার কোন দায় দায়িত্ব আমাদের উপর থাকবে না। তখন আমাদেরকে কর দিতে হবে।"

বিন কাসিমের ঘোষকের এ ঘোষণার জবাবে দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলো। এর অর্থ হলো, শক্তি থাকলে দুর্গ দখল করে নিতে পারো, আমরা দুর্গ তোমাদের হাতে ছেড়ে দেবো না।"

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সেনারা অবরোধ অক্ষুণ্ন রেখে দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হলে দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে বিপুল পরিমাণ তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করা হলো। যারা প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হয়েছিলো তাদের কিছুসংখ্যক

নিহত হলো। আর অধিকাংশই মারাত্মকভাবে আহত হলো। কয়েকবার দুর্গ প্রাচীরে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্যে চেষ্টা করা হলো, কিন্তু প্রতিবারই মারাত্মক প্রতিরোধের মুখে পড়ে অধিকাংশ সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত কিংবা নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় মিনজানিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো।

সবচেয়ে বড় মিনজানিকটির ব্যবহার মোটেই সহজসাধ্য ছিলো না। তাই ছোট ছোট মিনজানিক দিয়ে দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত হলো।

ঠিক করা হলো মিনজানিক। পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো। কিন্তু দুর্গরক্ষীরা খুবই সাহসিকতার পরিচয় দিলো। মিনজানিক চালকদের বেকার করে দেয়ার জন্যে প্রধান ফটক খুলে ঝড়ের মতো কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে দ্রুতগতিতে মিনজানিক পরিচালকদের উপর তীরবৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার ঝড়ের বেগে কেল্লায় ফিরে যেতো। মুসলমান সৈন্যরা তাদের তাড়া করেও নাগাল পেতো না।

এভাবে টানা কয়েকদিন ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া চললো। দুর্গ প্রাচীর যেমন ছিলো তেমনই রয়ে গেলো। দুর্গবাসীদের মধ্যে তেমন কোন ভাবান্তর দেখা গেলো না। মুহাম্মদ বিন হারুন অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দুর্গ প্রাচীরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। বিন কাসিম প্রতিবারই তাকে তার তাঁবুতে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে অনুরোধ করতেন। কিন্তু বিন হারুন তাকে এই বলে নীরব করে দিতেন, "বাবা! তুমি আমার ছেলের বয়সী। আমি এ অবস্থায় তোমাকে ঠেলে দিয়ে আরাম করতে পারবো না।"

দীর্ঘ একমাস কন্নৌজ দুর্গ অবরোধ করে রাখার পরও দুর্গবাসীদের মধ্যে পরাজয় বরণ করার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। কন্নৌজে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস ছিলো পানি। খোঁজ নিয়ে বিন কাসিম জানতে পারলেন দুর্গের ভিতরে পানিরও কোন সমস্যা এ যাবত দেখা দেয়নি। তার অর্থ ছিলো দুর্গবাসীরা দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার প্রস্তুতি আগেভাগেই সেরে নিয়েছিলো।

একদিন মুহাম্মদ বিন হারুন মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বললেন, "বিন কাসিম! আমার মনে হয় এ দুর্গ সহজে জয় করা যাবে না। আমার মতে দুর্গ প্রাচীরে আংটা লাগিয়ে উপরে উঠার ব্যবস্থা করা উচিত। নয়তো প্রচণ্ড আঘাত করে প্রধান ফটক খোলার উদ্যোগ নেয়া দরকার। এখানে আর কতোদিন বসে থাকা যায়।"

"সম্মানিত আমীর! আমি অল্প সময়ের মধ্যেই এ দুর্গ জয় করতে পারি। কিন্তু এখানে আমি শক্তিক্ষয় করতে চাই না। কারণ সামনে আমার আরো কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। দেখা যাক না, এরা আর কতোদিন অবরুদ্ধ জীবন কাটাতে পারে। দুর্গের রক্ষিত খাবার ও পানি এক সময় অবশ্যই শেষ হবে। আমি চাই, দুর্গবাসীরা পানি ও খাবারের অভাবে সৈন্যদের জন্যে মুসীবত হয়ে উঠুক। ততোদিন আমি আমার সেনাদের সুরক্ষিত ও নিরাপদে সংরক্ষণ করতে চাই।

* * *

আরো একমাস বিন কাসিম কন্নৌজ দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। এক পর্যায়ে দেখা গেলো দুর্গ প্রাচীর থেকে আগে যে মাত্রায় তীর বৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতো, তাতে কিছুটা ভাটা পড়েছে।

একদিন খুব সকালে মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুততার সাথে আগের রাতে বিন কাসিমের দেয়া নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে গেলো। তারা দুর্গ ফটকের কাছেই অশ্বারোহণ করে পূর্ণ প্রস্তুতিতে রইলো, যাতে দুর্গ থেকে কোন সৈন্য বের হলেই ওদের তাড়া করা যায়। ওদিকে মিনজানিক গুলোকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং মিনজানিক গুলোর নিরাপত্তার জন্যে মিনজানিকের আগে বসানো হলো তীরন্দাজ ইউনিট।

সূর্য উঠার আগেই শুরু হলো দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপ। মিনজানিক এগিয়ে আনার কারণে মিনজানিক থেকে নিক্ষিপ্ত পাথর এখন সরাসরি দুর্গের ভিতরে আঘাত হানতে শুরু করলো। প্রধান ফটক পেরিয়ে হিন্দু তীরন্দাজরা মিনজানিক চালকদের বেকার করে দেয়ার চেষ্টা করতেই অশ্বারোহী বাহিনীর তাড়া খেয়ে আবার দুর্গের ভিতরে চলে গেলো। দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে মিনজানিক চালকদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ শুরু হলেও ওদের জবাবে মুসলিম তীরন্দাজরা ওদের দিকে তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করলো। এর ফলে হিন্দুরা আর মিনজানিককে বাধা দিতে পারলো না।

মিনজানিকগুলো অবিরাম দুর্গ প্রাচীরের উপর দিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, এমনিতেই তখন দুর্গের ভিতরে পানির ঘাটতি দেখা দিয়েছিলো। পানির জন্যে মানুষ ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলো। এর উপর টানা কয়েক

দিনের অবিরাম পাথর নিক্ষেপের ফলে দুর্গের অনেক ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গেলো, শীলা বৃষ্টির মতো নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো পাথর।

এমতাবস্থায় পাঁচদিন চলার পর দুর্গবাসীরা পরাজয় মেনে নিয়ে সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়ার জন্যে সেনাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। দিন যেতে না যেতেই দুর্গের ভিতরে দেখা দিলো সেনাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ। সেনাবাহিনীও ততোদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। এমতাবস্থায় দুর্গ শাসককে না জানিয়েই কিছু সৈনিক ও সাধারণ প্রজা মিলে দুর্গের প্রধান ফটকের উপরে সাদা পতাকা উড়িয়ে দিলো এবং ফটক খুলে দিলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সৈন্যরা বিজয়ী বেশে দুর্গে প্রবেশ করলো। বিন কাসিম দুর্গ শাসককে নির্দেশ দিলেন, "যা কর নির্ধারণ করা হবে, নাগরিকদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে যথাশীঘ্র বিজয়ী বাহিনীর হাতে পৌছাতে হবে।"

দুর্গের সকল সৈন্য ও পুরুষকে যুদ্ধবন্দী করা হলো এবং দুর্গ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে ওখানে কিছু সৈন্য রেখে একজনকে দুর্গের শাসক নিযুক্ত করে বিন কাসিম তাঁর সৈন্যদের সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

* * *

কন্নৌজের পরবর্তী শহর ছিলো আরমান ভিলা। এবার মুহাম্মদ বিন কাসিম সামরিক যুদ্ধের পাশাপাশি কূটনৈতিক যুদ্ধের প্রতিও মনোযোগী হলেন। তিনি কন্নৌজপুরের কয়েকজন বন্দীকে মুক্তি দিয়ে আরমান ভিলায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন, "তোমরা আরমান ভিলায় গিয়ে বলবে, মুসলিম বাহিনী আসছে, তোমরা কিছুতেই দুর্গ রক্ষা করতে পারবে না। দুর্গ বাঁচানোর চেষ্টা করলে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নির্দেশে কন্নৌজপুরের কিছু বাসিন্দা মুসলিম বাহিনী আরমান ভিলায় পৌছার আগে ওখানে গিয়ে ভীতিকর খবর ছড়িয়ে দিলো। ওরা বললো, "মুসলিম বাহিনী ভয়ানক শক্তিশালী। ওরা জিনের মতো শহরে বড় বড় পাথর দিয়ে ঢিল ছুড়ে ওদের সাথে কুলিয়ে ওঠা কোন মানুষের সাধ্য নেই। তবে এরা যতোটা ভয়ানক ততোটা হিংস্র নয়। আচার ব্যবহারে খুবই মায়াবী। তারা সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে কর নেয়ার বিনিময়ে জান-মাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা দেয়। কারো ব্যক্তিগত সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানে আঘাত করে না। মানুষকে খুবই ইজ্জত করে। এরা বিজয়ী হলেও শহরে লুটতরাজ করে না।"

এর ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন দুর্গ প্রাচীর ঘেরা দুর্গম শহর আরমান ভিলা অবরোধ করলেন, তখন দুর্গরক্ষীরা খুবই সামান্য প্রতিরোধ চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু এই প্রতিরোধ জোরালো ছিলো না। বস্তুতঃ কয়েকদিন অবরোধ করে রেখে মিনজানিক থেকে পাথর নিক্ষেপ শুরু করলেই দুর্গবাসীরা ফটক খুলে দেয়। এই দুর্গও বিন কাসিমের দখলে চলে আসে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তার সেনা বাহিনীকে শক্তিক্ষয় থেকে রক্ষা করে কঠিন যুদ্ধের মোকাবেলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। আরমান ভিলা ছিলো সেনাদের বিশ্রামের খুবই উপযোগী; তাই কিছুদিন এখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অবশ্য আরমান ভিলায় অবস্থানের অপর কারণ মাকরান শাসক মুহাম্মদ বিন হারুণের অসুখ বৃদ্ধি। সামরিক চিকিৎসকগণ শত চেষ্টা করেও মাকরান শাসকের জ্বর কমাতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আরমান ভিলাতেই তাকে দাফন করা হয়।

* * *

বর্তমানের বিখ্যাত হায়দারাবাদ শহর তখন ছিলো নিরুন নামে খ্যাত। রাসূল (স.) এর হিজরত ও নবুয়তের মাঝামাঝি সময়ে এই নিরুন শহরের গোড়া পত্তন হয়। পরবর্তীতে মোগল বিজয়ীরা নিরুনের নামকরণ করেন হায়দারাবাদ। কারণ হায়দারকুলী খান এটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন কন্নৌজপুর জয় করেন, তখন নিরুনে একদল হিন্দু প্রবেশ করলো। গায়ে তাদের গেরুয়া বর্ণের আলখেল্লা। এলোমেলো উস্কো-খুশকো দীর্ঘ চুল। তাদের পা থেকে গলা পর্যন্ত কাঠ ও পুঁতির মালা প্যাঁচানো। এক হাতে তামার চুড়ি আর এক হাতে ত্রিশূল। তাদের পিছনে রয়েছে অনুরূপ বেশধারী কয়েকজন অনুচর। হিন্দু গ্রুপের গুরু সাধুজ্বী আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'হাত উঁচিয়ে চিৎকার করছে—"লোক সকল! অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করো! বিপদ ধেয়ে আসছে!!"

মানুষ তাকে ফেরাতে চেষ্টা করতো, থামাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু কারো কথা তার কানে যায় বলে মনো হতো না। সে তার দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কতগুলো হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করে আপন মনে হাঁটতে থাকতো। আর বলতো, "হে শহরবাসী! পালাও, শহর ছেড়ে চলে যাও! আগুন, আগুন আসছে। পাথর...। আসমান থেকে পাথর পড়বে।..."

তার বলার ভঙ্গিটাই এমন ছিলো, যেই তার কথা শুনতো, তার মনে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার হতো। সাধারণ লোকেরা তার অনুসারীদের জিজ্ঞেস করতো, এই সাধু বাবাজী কোত্থেকে এসেছেন? তিনি কি বলেন? এ সবের অর্থ কি?"

তার অনুসারীরা লোকজনকে বলছিলো, "বাবাজী তিন চার মাস যাবত চুপচাপ ছিলেন। কোন কথাই বলতেন না। হঠাৎ আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "আসমান থেকে পাথর পড়বে... আগুন আসছে... ভগবানের বাহিনী আসছে!! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করো, শহর ছেড়ে দাও।"

নিরুন শহর রাজা দাহিরের অধীনে থাকলেও এখানকার শাসক ছিলেন একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। রাজা দাহির কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলো। সে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দীরগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। কিন্তু তারপরও সেখানে প্রচুর সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বসবাস করতো এবং তাদের মতো করে ইবাদত উপাসনা করতো। এমন জায়গার মধ্যে নিরুন ছিলো একটি। এখানে ছিলো যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধের বসবাস।

দিনে দিনে সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো সাধু সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী। লোকজনের মধ্যে দেখা দিলো ভয়ংকর ভীতি। সাধুর প্রচারিত কথা নিরুনের শাসককে জানানো হলো। সন্ন্যাসী সাধুর প্রচারিত শংকাবাণীতেও সারা শহরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। একথা শুনে নিরুনের শাসক সন্ন্যাসীকে তার সকাশে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। তার সৈন্যরা সন্ন্যাসীকে তার দরবারে নিয়ে গেলো।

শাসক সাধুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আশংকাবাণী প্রচার করছো সন্ন্যাসী!"

"এসব কথা আমার নয়। আসমানী কথা। আসমান থেকে পাথর পড়বে, সাগরের তীর থেকে এক শক্তিশালী রাজা আসবে। আগুনের মতো সব তছনছ করে তারা অগ্রসর হবে। কেউ তাদের মোকাবেলায় টিকতে পারবে না। তার পথ রোধ করলে আসমান থেকে পাথর নিক্ষিপ্ত হবে... ।"

"সন্ন্যাসী! তুমি কি আরব বাহিনীর কথা বলছো? যে বাহিনী কন্নৌজপুর দখল করে নিয়েছে?"

"আমি কন্নৌজপুর যাইনি। আমি দুনিয়ার কোন খবর রাখি না। আমরা জঙ্গলে থাকি। জঙ্গলের মধ্যে আমি আসমানী আওয়াজ শুনেছি।"

"সন্ন্যাসী মহারাজ! বললেন, নিরুনের শাসক সুন্দরশ্রী। আমার শহরের প্রতি আপনি কেন এতোটা দরদী হয়ে উঠলেন? আপনি কি অন্য শহরেও গিয়েছিলেন? অন্য কোন শহরেও কি আপনি এ সতর্কবাণী প্রচার করেছেন?"

"হায়! সব পাগল। রাজাও পাগল। শোন বোকা! আমি এ শহরে এসেছি এখানকার রাজা বৌদ্ধ বলে। বৌদ্ধ ধর্ম শান্তির ধর্ম। শ্রী গৌতম বৌদ্ধ সাম্যের বাণী প্রচার করতেন, কোন সংঘাত সংঘর্ষে যেতেন না। তোমার মনে যদি শান্তি প্রত্যাশা থাকে, তাহলে আসমানী গযব থেকে প্রভুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আমাদের কথা না মানলে নিজেও ধ্বংস হবে, শহরের বাসিন্দা এবং সকল সৃষ্টিকেও ধ্বংস করবে। তোমার মেয়েদেরকে জালেমরা কব্জা করে নেবে, শহরের কোন যুবতী নিরাপদ থাকবে না। খুনোখুনি হবে, লুটতরাজ হবে, আগুন জ্বলবে, আসমান থেকে পাথর পড়বে। শুভ কাজ করো, আসমানী গযব থেকে প্রভুর সৃষ্টিকে বাঁচাও, নিজেও শান্তিতে থাকো।"

বৌদ্ধরা শান্তি প্রিয়। যুদ্ধ বিগ্রহ, খুনোখুনিতে গৌতম বৌদ্ধের ভক্তরা মোটেও আগ্রহী নয়। রাজা দাহির যেমন কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলো, নিরুনের শাসক সুন্দরশ্রী ততোটাই ছিলেন বৌদ্ধমতের প্রতি বিশ্বাসী। দাহিরের বৌদ্ধ পীড়ন এবং বৌদ্ধদের ধর্মালয় বিনাসের কারণে নিরুনের শাসক সুন্দরশ্রী রাজার প্রতি রুষ্ট ছিলেন। সন্ন্যাসী সুন্দরশ্রীর দরবার থেকে বিদায় হওয়ার পরই নিরুনে প্রবেশ করলো কয়েকজন হিন্দু বেশধারী উষ্ট্রারোহী। খুবই ছন্নছাড়া অবস্থা তাদের। এই উস্ট্রারোহীরা লোকজনকে জানালো, "তারা কন্নৌজপুরের বাসিন্দা। জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে ওখান থেকে। তারা লোকজনকে মুসলিম সেনাদের ভয়াবহ আক্রমণের কথা শোনালো। জানালো এরা যখন কেল্লা অবরোধ করে, তখন আসমান থেকে বড় বড় পাথর বৃষ্টি হয়, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়।"

মুসাফিরদের এই ভয়াবহ কাহিনী আগ্নেয়গিরির মতো মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। এমনকি শাসক সুন্দরশ্রীর কানেও গেলো এদের কথা। অবশ্য এর আগেই রাজা দাহির নিরুনে দূতের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে, "মাকরানে আরব সৈন্য অবতরণ করেছে। এই সৈন্য আগের মতো নয় অনেক বেশী সাহসী এবং খুব শক্তিশালী।"

কন্নৌজপুর যখন বিন কাসিম দখল করে নিলেন, তখন দেশের সকল দুর্গে রাজা দাহির এই বলে পয়গাম পাঠালো, মুসলমানরা কন্নৌজপুর দখল করে নিয়েছে। তাদের কাছে দুর্গের ভিতরে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র রয়েছে। অবশ্য এতে

ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সবাই কেল্লাবন্দী হয়ে থাকবে। কেল্লার বাইরে গিয়ে কেউ যুদ্ধ করার চিন্তা করবে না।"

নিরুনের শাসক যখন চতুর্দিক থেকে ধ্বংস মারদাঙ্গা ও খুনোখুনির আভাস পেতে থাকলেন, তখন তার মধ্যে গৌতম বৌদ্ধের শান্তিবাদী চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তার বিবেক বলতে লাগলো, কেন আমি ওদের বিরোধিতা করে অর্থহীন রক্ত ঝরাবো। খুনোখুনি মহাপাপ। তিনি মানসিকভাবে মুসলিম বাহিনীর সাথে কোন ধরনের মোকাবেলা করার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন এবং সব ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান ভিলায় অবস্থান করে ডাভেল আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তিনি এটাও বুঝে নিতে পারলেন, ডাভেল যুদ্ধেই জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। সেনাবাহিনী এখানে বিশ্রাম নেয়ার পাশাপাশি দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গার ট্রেনিংও নিতে শুরু করলো। তিনি সেনাদের প্রশিক্ষণ ভাষণে একথা বুঝাতে চেষ্টা করলেন, "আমাদের এ যুদ্ধ কোন সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার ফসল নয়, একান্তই ধর্মীয় জিহাদ। মজলুম মা বোনদের উদ্ধার করে পৌত্তলিকদের নাগপাশ থেকে অগণিত বনি আদমকে মুক্তিদানের পবিত্র জিহাদ।"

ট্রেনিং চলার সময় একদিন বিন কাসিমকে খবর দেয়া হলো, "দু'জন হিন্দু সাধু আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়।" তিনি উভয়কেই ডেকে পাঠালেন। সাধু দু'জন ছিলো সিন্ধী হিন্দু সাধুদের মতো পোশাকে আবৃত। কপালে তিলক ও মাথায় সিঁদুর পরিহিত। উভয়েই বিন কাসিমের কাছে পৌঁছে পরিষ্কার আরবী শব্দে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিলো।

"আচ্ছা! আমাকে খুশী করার জন্যে তোমরা আমার ধর্মের রীতিতে অভিবাদন জানিয়েছো?" বললেন বিন কাসিম। এটা যদি তোমাদের অন্তরের বিশ্বাস হতো তাহলে কতোই না শান্তি পেতে। যে শব্দ তোমরা উচ্চারণ করেছো এর অর্থ জানো?"

"হ্যাঁ, জানি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" জবাব দিলো একজন।

"কে তোমাদের এই অর্থ শিখিয়েছে?" জানতে চাইলেন বিন কাসিম।

"মুহতারাম সেনাপতি! এটা আমাদের নিজ ধর্মের ভাষা। স্মীত হেসে বললো অপরজন। আমরা হিন্দু নই মুসলমান। আমরা সিন্ধি নই আরব। আমাদেরকে সর্দার হারেস আলাফী পাঠিয়েছেন।"

"তিনি কি পয়গাম দিয়েছেন?"

"ঠিক পয়গাম নয় সংবাদ, সম্মানিত সেনাপতি! বললো একজন। এখান থেকে সামনে যে শহর পড়বে সেটির নাম নিরুন। রাজা দাহিরের অধীনে হলেও এই শহরের শাসক সুন্দরশ্রী একজন বৌদ্ধ। তিনি শান্তিবাদী লোক। রাজা দাহিরকে না জানিয়ে তিনি বসরায় দু'জন লোক পাঠিয়ে আমীর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে কর দেয়ার প্রস্তাব করেছেন এবং মুসলিম কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার পয়গাম পাঠিয়েছেন। শুনেছি, হাজ্জাজ তার মৈত্রী প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কর কতো ধার্য করা হয়েছে তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে এতটুকু জানা গেছে, হাজ্জাজ নিরুন শাসককে তার শহরের নাগরিকদের জান-মাল ইজ্জত আব্রু রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলিম সেনারা তাদের সাথে সৌহার্দ পূর্ণ আচরণ করবে।"

"আরে এতো দেখছি অলৌকিক ব্যাপার! বললেন বিন কাসিম। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, রাজা দাহিরের একজন শাসক মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করার আগেই নিজ থেকে দুর্গ আমাদের কর্তৃত্বে দিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছে। আমার কাছে সংবাদটি বস্তুনিষ্ঠ মনে হচ্ছে না। আলাফী সাহেব কোন কূটচাল করেননি তো?"

"না, না, সম্মানিত সেনাপতি। আলাফী কোন কূটচালের মানুষ নন। এটাকে আপনি অস্বাভাবিক ঘটনা মনে করবেন না। কারণ এর পিছনে কার্যকারণ রয়েছে। সুন্দরশ্রীর আত্মসমর্পণের পিছনে ভূমিকা রয়েছে। আমরা সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ওদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে খুনোখুনির প্রতি ঘৃণা জন্মে দিয়েছি। আমাদের অন্য একটি দল কন্নৌজের অধিবাসী সেজে ওদের মধ্যে আতংক ছড়িয়েছে। যার ফলে বৌদ্ধ সুন্দরশ্রী আত্মসমর্পণ ও মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হয়েছে।"

"তোমরা কি এ ধরনের মিশন অন্য শহরেও চালাতে পারো না?"

"না, সম্মানিত সেনাপতি! অন্য সব শহর বিশেষ করে রাজধানী ও ডাভেল শহরে রাজা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে। ওখানে কোন অপরিচিত লোক কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না এবং কেল্লা থেকে বাইরে যেতে পারে না। ওই শহরগুলোতে এ মিশন চালাতে গেলে গ্রেফতার হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবুও আমরা আপনার পথ পরিষ্কার করার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টার কোন ত্রুটি করবো না। আমাদের সর্দার আলাফী জানিয়েছেন, এসব শুনে আপনি যেন এ

সবের উপর কোন ভরসা না করেন। সেনাদের মধ্যে যেনো যুদ্ধের ব্যাপারে আবেগের কোন ঘাটতি সৃষ্টি না হয়।"

"আমার পরবর্তী মঞ্জিল ডাভেল। সেখানকার অবস্থা কি? ওখানে কি পরিমাণ সৈন্য রয়েছে? সেনাদের মধ্যে লড়াইয়ের যোগ্যতা কতটুকু? এসব প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। তোমরা যোদ্ধা, তোমরা ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানো, তোমাদের পক্ষে ডাভেলের বাস্তব পরিস্থিতি বলা সম্ভব।"

আপনার এসব প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব দেয়ার চেষ্টা আমরা করবো। বললো একজন।

"রাজা দাহির কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন বিন কাসিম।

"সে রাজধানীতে।" বললো একজন। অবশ্য একথা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, সে ডাভেলে আসবে কি-না।"

"আমরা এ ব্যাপারটি বলতে পারি সম্মানিত সেনাপতি! মোকাবেলা খুবই কঠিন হবে। বললো একজন। আমার তো মনে হয় রাজা দাহির রাজধানী উরুরেই থাকবে। সে তখনই আপনার মোকাবেলায় আসবে, যখন আপনার সৈন্য সংখ্যা কমে যাবে এবং সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়ে পড়বে। এখন আপনাকেই বুঝতে হবে সেই পরিস্থিতি আপনি কিভাবে সামলাবেন?"

মুহাম্মদ বিন কাসিম আলাফীর দুই সাথীকে সসম্মানে মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় করলেন। এরপর থেকে তিনি এ বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, আলাফী তার বিরুদ্ধে নয় তার পক্ষেই নেপথ্যে ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করছে।"

* * *

মুহাম্মদ বিন কাসিম তার অভিযান ও সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ প্রতিদিনই নির্দিষ্ট দূতের মাধ্যমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠাচ্ছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফও বিন কাসিমকে নিয়মিত নির্দেশ ও দিক-নির্দেশনামূলক পয়গাম প্রেরণ করছিলেন। সিন্ধু থেকে বসরা পর্যন্ত সংবাদবাহকেরা এক সপ্তাহের মধ্যে উভয়ের পয়গাম প্রাপকের কাছে পৌছে দিতো।

পরদিন হাজ্জাজের পক্ষ থেকে বিন কাসিম পয়গাম পেলেন, ডাভেলের আগে নিরুন নামের একটি শহর আছে। ওখানকার লোকজন আমাদের কাছে নিরাপত্তার দরখাস্ত করেছে এবং আমাদের কর দেয়ার প্রস্তাব করেছে।" আমরা

তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।" হাজ্জাজ যে পয়গাম লিখেছিলেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ হুবহু তা উদ্ধৃত করেছেন—

...অতঃপর তুমি যখন সিন্ধু সীমানায় প্রবেশ করবে, তখন তাঁবুর নিরাপত্তার দিকে খুব খেয়াল রাখবে। ডাভেলের যতো নিকটবর্তী হতে থাকবে তাঁবু ও আসবাবপত্রের নিরাপত্তার প্রতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় আরো বেশী যত্নবান হবে। যেখানে শিবির স্থাপন করবে, সেখানে চারপাশে প্রতিরক্ষা খাল খনন করবে। রাতের বেশী সময় জেগে থাকবে, কম সময় ঘুমাবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারে, তাদেরকে রাতের বেলায় তিলাওয়াতের নির্দেশ দেবে, আর যারা তিলাওয়াত জানে না, তারা রাতের বেলা দু'আ ও যিকির করবে। তোমাদের সবাই আল্লাহর যিকির সব সময় করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে বিজয় ও সাফল্যের জন্যে একান্ত মনে দু'আ করবে। সুযোগ পেলেই 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'এর তসবীহ জপে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।...

আর ডাভেলের কাছাকাছি গিয়ে থামবে এবং তাঁবুর চারপাশে ১২ গজ চওড়া ও ৫ গজ গভীর পরিখা খনন করে শিবিরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবে। এমতাবস্থায় শত্রুরা তোমাদের উস্কানী দিলেও তোমরা কোন জবাব দেবে না। শত্রুরা তোমাদের গালমন্দ করলেও তোমরা এসব গায়ে মাখবে না। শত্রুরা যদি তোমাদের উত্তেজিত করতে উস্কানী দেয়, তবুও ধৈর্য্যধারণ করে স্থির থাকবে। আমার পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না। আমার নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করবে এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালনের চেষ্টা করবে। আল্লাহর রহমতে আশা করি বিজয় তোমাদের হবেই।"

* * *

ডাভেল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া মুহাম্মদ বিন কাসিমের গোয়েন্দরা এসে খবর দিতে লাগলো কেল্লার দরজা বন্ধ। কেল্লার বাইরে কোন সৈন্য ও সামরিক তৎপরতা নেই।

এসব খবর থেকে বিন কাসিমের বুঝতে অসুবিধা হলো না, রাজা দাহির মুখোমুখি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না।

ঘটনাক্রমে এমন সময় রাজা দাহিরের আশ্রিত আরব বসতিতে ঘটে গেলো একটা গোলযোগ। আশ্রিত আরবদের বসতি ছিলো মাকরান ও সিন্ধু-এর সীমান্ত এলাকায়। মুহাম্মদ বিন কাসিম যেসব বিজিত এলাকায় সেনা চৌকি স্থাপন

করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে একটি ছিলো আশ্রিত আরবদের বসতির নিকটবর্তী। প্রতিটি সেনা চৌকি থেকে চারজন করে অশ্বারোহী কিংবা উষ্ট্রারোহী পালা করে নিজ নিজ এলাকায় টহল দিতো।

আরব বিদ্রোহীদের বসতির কাছে যে চৌকিটি তৈরী করা হয়েছিলো এলাকাটি ছিলো ঘন সবুজ গাছপালায় ভরা। সবুজ বন-বনানীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একটি সরু নদী। এ অঞ্চলে সবুজ শ্যামল অনেক মাঠ ছিলো, ছিলো গাছপালা আচ্ছাদিত ছোট বড় অসংখ্য টিলা, ঝোপ ঝাড়। নদীর পাশের ঘন সবুজ এলাকায় মাঝে মধ্যে আশ্রিত আরবদের ছেলেমেয়ে ও কিশোরী-তরুণীরা ঘুরতে যেতো। অবশ্য নদীর তীরবর্তী এলাকাটি বসতির খুব কাছে ছিলো না যে, প্রতিদিন এখানে আরব কিশোরী তরুণীরা বেড়াতে আসতো। মাঝে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎই কোন তরুণী দলবেঁধে এ জায়গাটিতে ঘুরতে আসতো।

একদিন আরব বসতি থেকে বিবাহিতা তিন তরুণী এই জায়গাটিতে ঘুরতে গেলো। কিছুক্ষণ পর তিনজনের দু'জন সেখান থেকে চিৎকার করে ও কান্নাকাটি করতে করতে বস্তিতে ফিরলো। তৃতীয় তরুণী ওদের দু'জনের সাথে ছিলো না। তরুণীদের আর্তচিৎকার শুনে বসতির সব লোকজন বেরিয়ে এলো। তরুণীরা জানালো, "তারা নদীর তীরবর্তী এলাকায় পৌঁছলে আরব সেনাদের চার অশ্বারোহী সেখানে আসে এবং ঘোড়া থেকে নেমে তরুণীদের উপর হামলে পড়ে। তারা দু'জন কোন মতে ওদের পাঞ্জা থেকে পালিয়ে এসেছে কিন্তু তৃতীয়জনকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।"

একথা শোনা মাত্রই তিন তরুণীর স্বামীও আরো কয়েকজন যুবক তরবারী ও বর্শা নিয়ে নদীর দিকে দৌড়ালো। তারা তৃতীয় তরুণীকে পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে বসতির দিকে ফিরে আসতে দেখতে পেলো। তার কাপড় চোপড় ছেড়া এবং মাথা খালি। ওড়না নেই। মাথার চুল এলোমেলো, সে কেঁদে কেঁদে বাড়ির দিকে ফিরছে। তার স্বামী দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলে সে স্বামীর কোলে লুটিয়ে পড়লো। তার অবস্থাই বলে দিচ্ছিলো তার সাথে ভয়ংকর আচরণ করা হয়েছে। অতএব আর কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিলো না। তরুণী স্বামীর কোলে জ্ঞান হারিয়ে. ফেললো।

যারা তাৎক্ষণিকভাবে ওই তরুণীর অবস্থা দেখতে পেলো, তারা এতোটাই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে গেলো যে, এ মুহূর্তে তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সকল সৈন্যকে পেলে খুন করেই শান্ত হবে।

"এরা কি সেই সেনাবাহিনী, আমাদের সর্দার হারেস আলাফী যাদের সহযোগিতা করছে?"

"আল্লাহর কসম! আরবরা কখনো এমন ছিলো না। এসব পাষণ্ড বনী উমাইয়ার।"

"চলো, এখনই ঐ চৌকিতে চলো। একটা জানোয়ারকেও জিন্দা রাখবো না।"

"চলো, চলো, দেখতে দেখতে গোল জমে গেলো। সবাই বলতে লাগলো। ওখানে লোক দশ বারোজনের বেশী হবে না, সবগুলোকে সাফ করে ফেলো।"

উত্তেজনা ছিলো ঘূর্ণিঝড়ের মতো। মুহূর্তের মধ্যে সারা আরব বসতিতে তুফান ছড়িয়ে পড়লো। ছেলে বুড়ো সবাই উত্তেজিত, সবার হাতেই অস্ত্র। এরা সবাই আরব বংশজাত। কাজেই নারীর সম্ভ্রমহানি এদের সহ্যের বাইরে। সবাই চৌকির সেনাদের খুন করতে প্রস্তুত। আবার কেউ কেউ বলছিলো, এদের সবাইকে ধরে এনে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আবার কেউ কেউ বলছিলো, এদেরকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে যতোক্ষণ পর্যন্ত ওদের শরীরের চামড়া খসে না পড়ে, ততোক্ষণ ঘোড়া দৌড়াতে হবে।"

উত্তেজিত বস্তিবাসী চৌকির দিকে রওয়ানা হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে গোত্র সর্দার হারেস আলাফী ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। তার সাথে ছিলো আরো বয়স্ক তিনজন লোক। তারা উটের উপর সওয়ার ছিলেন। আলাফীকে দেখে গোত্রের সকল মানুষ সর্বনাশ হয়ে গেছে, সব ধ্বংস হয়ে গেছে মাতম ও চিৎকার শুরু করে দিলো।"

আলাফী তাদের শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

"আপনি আমাদের সর্দার! আপনার হুকুম পালন করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আজ এই চৌকির সব পাষণ্ডকে হত্যার নির্দেশ ছাড়া আপনার আর কোন নির্দেশ পালন করবো না।" বললো এক যুবক।

"আপনি বলেছিলেন, আরব সৈন্যদেরকে আমরা যেনো আপন মনে করি। কিন্তু এখন আমরা এই পাষণ্ডদের সেনাপতিকেও জীবিত ছাড়বো না।" বললো ক্ষুব্ধ আরেক যুবক।

"চুপ করে আছেন কেন সর্দার?" চিৎকার করে বললো আক্রান্ত এক তরুণীর স্বামী। এখন কোন লজ্জা করার সময় নয়। একটা কিছু বলুন, আমাদের

নির্দেশ দিন।"

"এই চার সৈন্যের শাস্তি অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু শাস্তি কার্যকর করার আগে আমাকে ওদের সেনাপতির সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দাও!"

"কোন্ সেনাপতির কথা বলছো তুমি? বললো এক অর্ধ বয়স্ক লোক। ঐ সেনাপতির কথা বলছো, যে হাজ্জাজের ভাতিজা! যে হাজ্জাজের কারণে আমাদেরকে দেশ ছাড়তে হয়েছে! বনী উমাইয়ার নূন রুটি খেয়ে বেঁচে থাকা হাজ্জাজ আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওর পালিত ভাতিজার সাথে তুমি কি কথা বলবে? সে তো কিছু না শুনেই বলে দেবে এটা ডাহা মিথ্যা ঘটনা।"

"এটা ভুলে যেয়ো না আমরা আরব। আমাদের একটা রীতি আছে। আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে কিছু বিষয়ে ওয়াদা করেছি। সেও আমাকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।"

এমতাবস্থায় আলাফীর আওয়াজ বেড়ে গেলো, হঠাৎ তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "তোমরা শুনে রাখো, হাজ্জাজের ভাতিজা যদি আমার কথা শুনে বলে, "এটা মিথ্যা ঘটনা, তাহলে এই তরবারীতে তোমরা তার রক্ত দেখবে! আমি জানি এ ঘটনা ঘটার সাথে সাথে তার প্রহরীরা আমার শরীরকে টুকরো টুকরো করে দেবে। তবুও আমাকে তার কাছে যেতে দাও, তোমরা স্থির হও। সে যদি কোনকিছু যাচাই না করে তার সৈন্যদের বাঁচাতে চেষ্টা করে, তাহলে তার জীবন থেকেই হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। আমি তোমাদের কাছে ওয়াদা করছি, আমি যা বলেছি তা করে দেখিয়ে দেবো।"

দৃশ্যত পরিস্থিতি এতোটাই উত্তাল হয়ে উঠেছিলো যে, নিয়ন্ত্রণে আনার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিলো না। কিন্তু দেশত্যাগী এসব আরব ছিলো খুবই সুশৃঙ্খল। তারা সর্দারের কথায় নিজেদের ক্ষোভ আপাত দৃষ্টিতে সামলে নিলো এবং তরুনীকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বস্তিতে নিয়ে এলো। ততোক্ষণে রাত অনেক হয়ে গেছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান ভিলায় সেনাদের প্রস্তুতি কাজে ব্যস্ত। হারেস আলাফী অর্ধরাতের একটু আগে আর দু'জন সঙ্গী নিয়ে বিন কাসিমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

আলাফী ও সঙ্গীরা ফজরের নামাযের আযান শুনে ঘোড়াকে আরো তাড়া করলেন যাতে নামাযের সময় থাকতেই সেখানে পৌছতে পারেন। তারা যখন

দুর্গের প্রধান ফটকের সামনে পৌঁছলেন, তখন ফটকের দরজা বন্ধ। কারো জন্যে এতো সকালে দরজা খোলা হয় না। কিন্তু বিন কাসিম প্রহরীদের বলে রেখেছিলেন, হারেস আলাফী যখনই আসবেন, তার জন্যে যেনো দরজা খুলে দেয়া হয়। বস্তুতঃ তার পরিচয় পেয়ে দরজা খুলে দেয়া হলো। তিনি ঠিক এমন সময় বিন কাসিমের সকাশে পৌঁছলেন, যখন জামাত দাঁড়াচ্ছে। তারা তিনজন শেষের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ হতেই হারেস আলাফী অন্যদের ডিঙিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পৌঁছলেন। বিন কাসিম এতো ভোরে আলাফীকে এখানে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন।

"আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক সর্দার! নিশ্চয় আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর এনেছেন? বললেন বিন কাসিম।

"হ্যাঁ, বিন কাসিম! খবর খুবই বড় এবং খুবই ভয়ানক! আলাফীর বলার ভঙ্গি শুনেই বিন কাসিমের চেহারায় উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি কোন মন্তব্য না করে আলাফী ও তার দুই সঙ্গীকে তার একান্ত কক্ষে নিয়ে গেলেন।

কক্ষে যাওয়ার পর আলাফী বললেন, "বিন কাসিম! তুমি যদি আলাফীর সাথে সত্যিকারের বন্ধুত্ব করে থাকো, তাহলে আজ বন্ধুত্বের হক আদায় করো।"

"হক অবশ্যই আদায় করবো। আপনি যদি উপকার করে এর প্রতিদান পেতে চান, তাহলে বলুন, কি প্রতিদান দিতে হবে?"

হারেস আলাফী তাকে পুরো ঘটনা জানালেন, যা তাদের বসতির পাশের চৌকিতে ঘটেছে এবং পরিস্থিতি কতোটা বিস্ফোরন্মুখ হয়ে রয়েছে। ঘটনা শুনে বিন কাসিম স্থবির হয়ে গেলেন।

হারেস আলাফী বললেন, "প্রিয় বিন কাসিম! তোমরা যাদেরকে বিদ্রোহী বলো, আমি অনেক কষ্টে তাদেরকে তোমাদের জন্যে নেপথ্যে সহযোগিতা করার জন্যে সম্মত করেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, এ মুহূর্তে তুমি যদি ওখানে যাও, তবে জানি না, তোমার দেহে কতগুলো বর্শা ও তরবারী আঘাত হানবে। আমি উত্তপ্ত পরিস্থিতি একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠাণ্ডা করে এসেছি। আমি যদি তাদের ধারণার চেয়ে বেশী সময় এখানে কাটিয়ে ফিরে যাই, তাহলে আমাকে পথেই তারা পাবে এবং খুন করে ফেলবে।"

"ঠিকই বলেছেন সর্দার! এমন ঘটনায় তাদের এরচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ ঘটনাটা এমন নয় যে, কথায় তাদের ঠাণ্ডা করা যাবে।"

“আমাকে বলো বিন কাসিম! তুমি এখন কি করবে? যদি কিছু করার না থাকে, তাহলে আমাকে বলো, আমি কি করতে পারি?”

“এ মুহূর্তে আমার কাজ ডাভেল আক্রমণ করা। কিন্তু এর আগে অবশ্যই আমি এ ব্যাপারটি সুরাহা করবো।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম তখনই তার ঘোড়া আনতে নির্দেশ দিলেন এবং গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীকে সঙ্গে নিলেন। তার দেহরক্ষীরা তার রওয়ানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রওয়ানা হলো। বলা হয়, যে কোন জটিল ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনে বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন শা'বান ছাকাফী।

* * *

হারেস আলাফী তার দুই সঙ্গীও মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে রওয়ানা হলেন। তারা ভেবেছিলেন অন্তত দ্বি'প্রহরের দিকে তারা বসতিতে পৌঁছে যেতে পারবেন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমান ভিলা থেকে বের হয়েই এভাবে ঘোড়া ছুটালেন যেন তিনি উড়াল দিয়ে সেখানে চলে যাবেন। তিনি ছিলেন সবার আগে এবং গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী ছিলেন তার পাশাপাশি। তিনি শা'বান ছাকাফীর সাথে ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

দ্বিপ্রহরের অনেক আগেই তারা দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছে গেলেন। সেনাপতিদের আসতে দেখে চৌকির সব সিপাহী চৌকি থেকে বেরিয়ে এলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম চৌকির কাছে গিয়ে পিছনে চলে এলেন আর শা'বান ছাকাফী চৌকির সৈন্যদের কাছে চলে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন-গতকাল বিকেল বেলার টহলে কে কে ডিউটিতে ছিলো?”

চার সিপাহী হাত উঁচিয়ে নিজেদের ডিউটিতে থাকার কথা জানালো।

“তোমরা চারজনই কি তিন তরুণীর উপর হামলা করেছিলে? না তোমাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো, যে চায়নি এ কাজে শরীক হতে?”

একথা শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শা'বান ছাকাফীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

“তোমরা দেখতেই পাচ্ছো, প্রধান সেনাপতি নিজে এসেছেন। তা থেকেই বুঝতে পারছো ব্যাপারটি কতো জটিল। আর এ ক্ষেত্রে তোমাদের অপরাধ পরিষ্কার। লুকানোর কোন অবকাশ নেই।”

“শত্রু ভূমিতে দাঁড়িয়ে যা তা বলবেন না সেনাপতি।” ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো চার অভিযুক্তের একজন। জন্মভূমি থেকে দূরে এনে এভাবে আমাদের অপমান করার কোন অধিকার আপনার নেই।”

“এক সিপাহীর কথা শেষ না হতেই বিন কাসিমের দিকে হাত প্রসারিত করে চার অভিযুক্তের অপর একজন বললো, “সম্মানিত সেনাপতি! সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যে আল্লাহর নামে আমরা আপনার সাথে এখানে জিহাদ করতে এসেছি। আপনার কাছে জানতে চাই, এ লোক আমাদের উপর কেন অপবাদ দিচ্ছে? আমরা কি আপনার বাহিনীর সৈনিক নই?”

“সিপাহীর প্রশ্নের উত্তরে মুহাম্মদ বিন কাসিম কিছুই বললেন না। কারণ অনুসন্ধানের কাজটি তিনি শা'বান ছাকাফীর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছিলেন। আসলেও এটি ছিলো শা'বান ছাকাফীর কাজ। অভিযুক্ত হওয়ার পর চার সিপাহী হা-হুতাশ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করলো। আলাফী ও তার দুই সঙ্গী দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে এসব দেখছিলেন।

শা'বান ছাকাফী হারেস আলাফীকে বললেন, “সর্দার! আক্রান্ত তিন তরুণীকে বসতি থেকে এখানে নিয়ে আসুন এবং তাদের সাথে যতো লোক আসতে চায় আসতে বলুন।”

হারেস আলাফী বসতির উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার পর চৌকির কমান্ডারকে গোয়েন্দা প্রধান ছাকাফী বললেন, এ মুহূর্তে যারা টহলে রয়েছে তাদেরকেও নিয়ে এসো। কমান্ডার সেনাপতির নির্দেশ পালনে চলে গেলো। এমন সময় চৌকি থেকে একটু দূরে গিয়ে বিন কাসিম ও গোয়েন্দা প্রধান ছাকাফী পরস্পর কথা বললেন।

শুরুতে শুধু অভিযুক্ত চার সিপাহী নিজেদের উপর মিথ্যা অভিযোগের জন্যে হা-হুতাশ করেছিলো, কমান্ডার ও আলাফী চলে যাওয়ার পর সবাই চেচামেচি শুরু করে দিলো এবং সেনাপতিদের সম্পর্কে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। মুহাম্মদ বিন কাসিমের কানে এসব কথা গেলেও তিনি নীরবে সিপাহীদের গালমন্দ সহ্য করলেন। অথচ এসব কটুবাক্য সাধারণ সৈনিকও সহ্য করতো কি-না সন্দেহ। এক পর্যায়ে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফী সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমরা শান্ত হও। এ ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো, তোমাদের উপর কোন ধরনের বে-ইনসাফী করা হবে না।”

একজন বয়স্ক সিপাহী বললো, “সম্মানিত সেনাপতি! দেখেতো মনে হলো যে তিনজন লোক আপনার সাথে এসেছিল এরা সেই লোক; যারা আরব থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসে রাজার আশ্রয় নিয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় এরা আমাদের বিরুদ্ধে রাজার নিমক হালালী করছে। আমি বলি, হিন্দুদের আগে এদের পরিষ্কার করা জরুরী। এরা আমাদের ঘোরতর শত্রু।”

“কি ব্যাপার! তোমরা কি মুখ বন্ধ করবে না? ধমকের স্বরে সিপাহীদের উদ্দেশ্যে বললেন গোয়েন্দা প্রধান। আমি তো তোমাদের বলেছি, কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। সত্যিকার অর্থে যে অপরাধী তারই বিচার হবে।”

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো চৌকির সকল সিপাহীর মধ্যে বিদ্রোহী আরবদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ উপচে পড়ছে। এরা যেন গোটা বসতি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে স্বস্তি পায়।”

দূর থেকেই দেখা গেলো তিন তরুণীকে নিয়ে আলাফী বসতি থেকে চৌকির দিকে আসছেন। তার পিছনে বসতির কিছু লোকও আসছে। শা’বান ছাকাফী দেখে তাদের দিকে ঘোড়া হাঁকালেন এবং তাদেরকে চৌকি থেকে দূরেই থামিয়ে দিলেন।

শা’বান ছাকাফীর অনুরোধে সেই তরুণীকে তার সামনে আনা হলো যার সম্পর্কে বলা হয়েছিলো যে, তাকে সৈন্যরা ধর্ষণ করেছে।

নদী কাছেই ছিলো। শা’বান ছাকাফী ভিকটিম তরুণীকে গাছ গাছালী ও টিলার আড়ালে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে তার মাতৃভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সিপাহীরা তুমি ও তোমার বান্ধবীদের জাপটে ধরেছিলো?”

তরুণী শা’বানের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। উত্তর না বলার কারণে শা’বান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় তোমাকে ও তোমার বান্ধবীদেরকে সিপাহীরা আঘাত করেছিলো? জায়গাটি কোথায়?”

এবার তরুণী ডানে বামে ঘাড় হেলিয়ে দু’টি জায়গা দেখিয়ে দিলো।

“আমরা সুবিচার করতে এসেছি। যারা তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাদেরকে তোমাদের সামনে হত্যা করা হবে। কাজেই তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারপর তরুণী আর কিছু বললো না।

শা’বান সেই তরুণীকে ওখানেই রেখে টিলার এপাশে এসে উচ্চ আওয়াজে বললেন, এই তরুণীটি কি বোবা?

শা'বানকে দেখে আলাফী তার কাছে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "শা'বান! তুমি হয়তো এর সাথে আরবীতে কথা বলেছো। ঐ তরুণী আরবী জানে না। এ ছিলো হিন্দু। এক বছর আগে আমাদের এক তরুণকে বিয়ে করার জন্যে মুসলমান হয়েছে।"

""ওর সাথে অন্য যে দুই তরুণী ছিলো এরা কি তোমাদের কবিলার মেয়ে?" জিজ্ঞেস করলেন ছাকাফী।

"না, এরাও এখানকার অধিবাসী। এরাও কিছুদিন আগে মুসলমান হয়ে আমাদের গোত্রের তরুণের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।"

শা'বান ছাকাফী কবিলার একজন এমন লোককে সঙ্গে নিলেন, যে সিন্ধী ও আরবী ভাষা বলতে ও বুঝতে পারতো। শা'বান তার মাধ্যমে তরুণীকে জিজ্ঞেস করলেন, তার উপরে যে জায়গাটিতে সিপাহীরা আক্রমণ করেছিলো, সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিতে।

তরুণী একটি জায়গা দেখিয়ে বললো, এইখানে। শা'বান তাকে পুরো ঘটনা বলার নির্দেশ দিলেন। তরুণী ঘটনা বলতে শুরু করলো এবং গোত্রের লোকটি তা আরবীতে তাকে বুঝাতে লাগলো। তরুণীর বর্ণনা শুনে শা'বান তরুণীকে বললেন, "সেই জায়গাটি দেখাও তো, যে জায়গাটিতে সিপাহীরা তোমাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলো? তরুণী একটি জায়গা দেখালো। শা'বান তরুণীকে একটি টিলার আড়ালে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর শা'বান অপর দুই তরুণীর একজনকে টিলার আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এর স্বামীও এর সাথে আসুন।

আরবদের অনুসন্ধানী ক্ষমতা ছিলো বিশ্বখ্যাত। আরব্য গল্প কাহিনীতেও তাদের অনুসন্ধানী প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। শা'বান ছাকাফী ছিলেন স্বভাবজাত অস্বাভাবিক অনুসন্ধানী প্রতিভার অধিকারী।

* * *

দ্বিতীয় তরুণীকে শা'বান ছাকাফী দুভাষী ও তার স্বামীর সাথে অপর টিলার আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সিপাহীরা তার উপর কোথায় আক্রমণ করেছিলো? তরুণী হাত দিয়ে একটি জায়গা দেখিয়ে দিলো। শা'বান ছাকাফীর নির্দেশে পুরো ঘটনার একটা বর্ণনা দিলো তরুণী।

দ্বিতীয় তরুণীকে অপর একটি টিলার আড়ালে দাঁড় করিয়ে তৃতীয় তরুণীকে তার স্বামীসহ ডাকলেন। শা'বান তাকেও অপর একটি টিলার আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় তোমার উপর সিপাহীরা হামলে পড়েছিলো?"

তরুণী একটি জায়গার প্রতি ইশারা করলো এবং শা'বানের নির্দেশে সেও ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দিলো।

তৃতীয় তরুণীকে অপর একটি টিলার আড়ালে দাঁড় করিয়ে প্রথম তরুণীকে আবার ডেকে আনলেন শা'বান এবং তার স্বামীকেও ডাকলেন। এই তরুণীর স্বামী এতোই ক্ষুব্ধ ছিলো যে, তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিলো, চোখ কোঠর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিলো। যেন সে শা'বানকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলবে এমন তার অবস্থা। ক্ষোভে রাগে সে ফোঁস ফোঁস করছিলো। শা'বান এসবকে গায়ে না মেখে একান্ত মনে তার কাজ করে যাচ্ছিলেন।

শা'বানের জিজ্ঞাসায় তরুণী বললো, সে চার সিপাহীকেই চিনতে পারবে।

চৌকির বারোজন সিপাহীকে একটি আলাদা জায়গায় দাঁড় করানো হলো এবং এই তরুণীকে স্বামীসহ তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি কোন চারজনকে চিনো?"

তরুণী দ্রুততার সাথে চারজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। তরুণীর নির্দেশিত চার সিপাহীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়া হলো এবং এই তরুণীকে তার স্বামীর সাথে আলাদা জায়গায় রাখা হলো।

এরপর শা'বানের নির্দেশে স্বামীসহ দ্বিতীয় তরুণীকে ডাকা হলো। এ তরুণী বললো, একজন সিপাহীকে সে ভালোভাবেই চিনতে পারবে। তাকে সিপাহীদের কাছে নিয়ে গেলে মাঝখান থেকে একজনের প্রতি সে ইশারা করে দেখালো। এই সিপাহীকেও অন্যদের থেকে আলাদা করে নেয়া হলো। অতঃপর তৃতীয় তরুণীকে স্বামীসহ ডাকা হলে সেও জানালো; এক সিপাহীকে সেও চিনতে পারবে সিপাহীদের সামনে নিয়ে যাওয়ার পর সেও একজনের প্রতি ইঙ্গিত করলো।

শা'বান আলাফীও তিন তরুণীর স্বামীকে তার কাছে ডেকে আনলেন এবং বললেন, এই চার সিপাহী গতকাল বিকেলে টহল কাজে নিয়োজিত ছিলো। যাদেরকে তোমরা এখানে দেখছো। আর তোমাদের তরুণীরা যাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, এরা তখন চৌকিতে অবস্থান করছিলো। শা'বান তিন তরুণীকে ডেকে এনে তাদের স্বামীদের সাথে দাঁড় করালো।

অতঃপর সমবেত সবার উদ্দেশ্যে শা'বান ছাকাফী বললেন, বন্ধুগণ! এ তিন তরুণী ভিন্ন ভিন্ন জায়গার কথা বলেছে। তোমরা মরু ভূমিতে জন্ম নিয়েছো এবং মরুতেই বড় হয়েছো। তোমরা জানো, মরুর ধুলিকণাও কথা বলে। চৌকির সৈনিক ঘোড়ায় সওয়ার ছিলো। যে জায়গায় আক্রান্ত হওয়ার কথা এই তরুণীরা বলেছে, এই জায়গায় চারটি ঘোড়ার কোন চিহ্ন আছে কি-না আমাকে দেখিয়ে দাও। ঘটনাটি গত সন্ধ্যার। এরপর না কোন মরুঝড় হয়েছে, না বৃষ্টি হয়েছে। এই তরুণী আমাকে জানিয়েছে তাকে মাটিতে ফেলে সম্ভ্রম হরণ করেছে। আমার সাথে তোমরা এসো এবং সেই জায়গাটি একটু দেখে নাও। শা'বান তাদেরকে তরুণীর দেখানো জায়গায় নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখাও তো এখানে এমন কোন চিহ্ন খুঁজে পাও কি-না?

প্রিয় স্বদেশী বন্ধুরা! আশ্রিত আরব বস্তিবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন শা'বান। এই তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি জায়গার কথা বলেছে। তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো, তাদের ভাষায় সৈনিকরা ছিলো অশ্বারোহী। অশ্বারোহী সৈনিকদের কাছ থেকে এই তরুণী দু'জন পালিয়ে গেলো? এরা কি ঘোড়ার চেয়ে বেশী দৌড়াতে পারে? আর তিন তরুণী সেখানে আক্রমণকারী হিসেবে যাদের চিহ্নিত করেছে, তাদের কেউই সেখানে যায়নি। যারা তখন ডিউটিতে ছিলো এরা তোমাদের সামনে দাঁড়ানো। শা'বান তরুণীদের উপস্থিতিতে সিন্ধী ভাষায় তরুণীদের বর্ণনা শোনালেন এবং বললেন, তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, তারা কি একথা বলেনি?"

...সম্মানিত হারেস আলাফী! বললেন ছাকাফী। বনী ছাকীফের রক্তে এখনো কোন মিশ্রণ ঘটেনি। বনী উসামা যদি গোত্রীয় শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্বের জন্যে হাত বাড়ায়, তাহলে বনী ছাকীফের সেনাপতি জীবন দিয়ে বন্ধুত্বের হক আদায় করবে। তোমরা এ ঘটনার ব্যাপারে কেন একটু চিন্তা করোনি, এই তরুণীরা কিছুদিন আগেও ছিলো পৌত্তলিক ঘরের সন্তান। এরা শৈশব থেকে মূর্তিকে পূজা করে করে বড় হয়েছে। এরপর যৌবনে তিন আরব তরুণ এদের কাছে ভালো লাগায় এরা তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের রক্তে রয়েছে হিন্দুয়ানী মানসিকতা। হিন্দুয়ানী মিথ্যাচারিতা। এরা যদি আরব বংশোদ্ভূত হতো, তাহলে আমি এতোকিছু করতাম না। শুধু জিজ্ঞেস করতাম, বলো, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা? আমি নিশ্চিত, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির জন্যে এটা একটা চক্রান্ত।

আলাফী এতোটা উঁচু চিন্তার অধিকারী ছিলেন না, তাছাড়া দীর্ঘদিন এখানে থাকার পর মাকরান ও হিন্দু অঞ্চলের চিন্তা চেতনা তার আরব সাথীদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো।

ছাকাফী বললেন, তোমরা দেশে থাকতে বিদ্রোহ করেছিলে। আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি তোমাদের বিদ্রোহ ছিলো সঠিক। কিন্তু আজ তোমাদের সেই সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা কোথায় গেলো?...তোমরা সবাই বিশেষ করে এদের স্বামীরা যদি আমাকে অনুমতি দাও, তাহলে এ ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্য ও মিথ্যাকে আমি আলাদা করে দেখিয়ে দেবো।

* * *

হঠাৎ কথিত সম্ভ্রমহানির শিকার হওয়া তরুণীর স্বামী তরুণীর উপর হামলে পড়লো। চিতাবাঘ যেভাবে শিকারের উপর হামলে পড়ে ঠিক সেভাবে তরুণীর চুল ধরে ওকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে মাটির উপর আঁচড়ে ফেললো তার স্বামী। তরুণী চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। স্বামী ওর বুকে পা রেখে ওর গলার উপরে তরবারী ঠেকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো, "বাঁচতে চাস্ তো সত্য কথা বল হিন্দুর বাচ্চি!"

অপর দিকে আলাফী নিজে তরবারী বের করে অপর দুই তরুণীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বললেন, বাঁচতে চাস্ তো সত্য কথা বল। অতঃপর সবার দিকে সম্বোধন করে আলাফী বললেন, "এদের চুলের সাথে রশি বেঁধে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে দাও।"

একথা শোনার পর এক তরুণীর মুখে উচ্চারিত হলো ভয়ার্ত আর্তনাদ। "না, আমি এভাবে মরতে চাই না! তোমরা যদি সত্য কথা শুনতে চাও, তবে শোনো।"

অপর দিকে যে তরুণীর গলায় তার স্বামী তরবারী ধরে রেখেছিলো সেও সত্য কথা বলার জন্যে সম্মত হলো।

অবশেষে তিন তরুণীর বক্তব্যে যা বেরিয়ে এলো এর সার কথা হলো, এদের তিনজনকে রাজা দাহিরের বোন ও স্ত্রী মায়ারাণী ফুসলিয়ে রাজী করায় যে, এরা তিন আরব যুবককে বিয়ে করে যেন এদের উপর যাদুকরী প্রভাব সৃষ্টি করে। মায়ারাণী এ কাজ করেছিলো, হাজ্জাজের পাঠানো দ্বিতীয় সেনাপতি বুদাইল বিন তোফায়েলের মৃত্যুর পর।

মুহাম্মদ বিন কাসিম মাকরানে আসার পর রাজা দাহিরের উজির বুদ্ধিমান তাকে পরামর্শ দিয়েছিলো, রণ ক্ষেত্রের পাশাপাশি কূটনৈতিক চালে মুসলমানদের দুর্বল করার জন্যে এবং এ দায়িত্ব উজির বুদ্ধিমান নিজের কাঁধে নিয়েছিলো।

বুদ্ধিমানের জানা ছিলো, মায়ারাণী এ অস্ত্র প্রয়োগের হাতিয়ার অনেক পূর্বেই প্রয়োগ করে রেখেছে। অতঃপর বুদ্ধিমান মায়ার সাথে যোগাযোগ করে এটিকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিলো। নারী গোয়েন্দা পাঠিয়ে এই তরুণী তিনজনকে পরামর্শ দিলো, "আলাফী ও আরব আশ্রিতরা শত্রুদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছে। অতএব এদের মধ্যে যে করেই হোক কঠিন শত্রুতার জন্ম দিতে হবে। বসতির পাশে বিন কাসিমের সেনা চৌকি স্থাপিত হলে এ তিন তরুণীকে ব্যবহার করে দু'পক্ষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। কারণ আরবরা নারীর সম্ভ্রমহানির অপরাধকে কখনও ক্ষমা করে না। নারীর ইজ্জত রক্ষায় অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সেই সাথে নারীর অসম্মানকারীকে আরব মুসলমানরা প্রচণ্ড ঘৃণা করে।

এ তিন শয়তানীর ভাগ্যের সিদ্ধান্ত আমাদের সর্দার দেবেন? চিৎকার করে বললো এক তরুণীর স্বামী।

"হ্যাঁ, এদের সবাইকে হত্যা করে ফেলো।" বললেন আলাফী।

হত্যার কথা শুনে তরুণী তিনজন চিৎকার শুরু করে দিলো। তারা বলতে লাগলো, এ কাজ তারা নিজেদের ইচ্ছায় করেনি। মায়ারাণী ও উজির বুদ্ধিমানের চক্রান্তে পড়ে করেছে। তারা কান্নকাটি করে জীবন ভিক্ষা চাইলো। কিন্তু আলাফী আবারো ঘোষণা করলেন, না এদের ক্ষমা করা হবে না।"

"থামো আলাফী, বজ্র নির্ঘোষ আওয়াজে বললেন সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম। এতোক্ষণ পর্যন্তই তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে গোয়েন্দা প্রধান শা'বান ছাকাফীর গোয়েন্দ তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি আলাফীর উদ্দেশ্যে বললেন—

"এদের নিরপরাধ মনে করো। রাজা দাহিরকে আমি একটি পয়গাম পাঠাতে চাই। তিনি তরুণীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদেরকে আমার সৈন্যরা রাজধানীর পথে কোন বসতিতে রেখে আসবে। তোমরা রাজধানীতে গিয়ে রাজা দাহির ও উজির বুদ্ধিমানকে বলবে, যুদ্ধ রণাঙ্গনে পুরুষে পুরুষের মধ্যে হয়ে থাকে, নারীকে যুদ্ধে ব্যবহার করা কোন বাহাদুরী নয়। যারা নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে যুদ্ধ জিততে চেষ্টা করে, তারা কাপুরুষ, তারা রণাঙ্গনে মোকাবেলা

করার যোগ্যতা রাখে না। রাজাকে বলো, আপন বোনকে স্ত্রী বানিয়ে রাখার মতো অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ অনেক হয়ে গেছে। তাকে তার কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এজন্য সে যেন প্রস্তুত থাকে।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রাণ ভরে আল্লাহর শুকর আদায় করে চৌকির কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ঘোড়ার উপরে বসিয়ে দু'জন সিপাহী দিয়ে রাজধানীর পথের কোন বসতিতে দায়িত্ববান কোন ব্যক্তির কাছে দিয়ে এসো। যাতে এদেরকে রাজধানীতে পৌঁছে দিতে পারে।

সেই সময় মহাভারতের হিন্দুদের কূটকৌশল ছিলো বিশ্বখ্যাত। তখন ভারতে মন্দির ও ব্রাহ্মণদের রাম রাজত্ব। মন্দিরগুলোই পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে এবং রাজাদের উপর রাজত্ব করে। তখন মন্দিরগুলো ছিলো রাজনীতি ও কূটনীতির আখড়া। এরা যে কোন শত্রুতায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো নারী অস্ত্র। পক্ষান্তরে মুসলমান সংস্কৃতি ছিলো এর সম্পূর্ণ বিরোধী। মুসলমানরা নারীর সম্মান ও ইজ্জতকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বলেই বিশ্বাস করতো। ফলে পরস্পর এই দু'টি চেতনাও সংস্কৃতির মধ্যে যখন সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে, তখন জন্ম নেয় বহু বিস্ময় সৃষ্টিকারী ঘটনা। যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে এবং আজো পাঠককে করে শিহরিত।

ডাভেলের চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরুর আগে এ ঘটনায় বিন কাসিম আন্দাজ করতে পারলেন, তার প্রতিপক্ষ তাকে কতোভাবে আঘাতের ব্যবস্থা নিয়েছে।

বিন কাসিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চৌকি থেকে আরমান ভিলায় ফিরে এলেন এবং পরদিনই ডাভেলের দিকে রওয়ানা হলেন।

গল্পের বাকী অংশ

পড়ুন পরবর্তী খণ্ডে
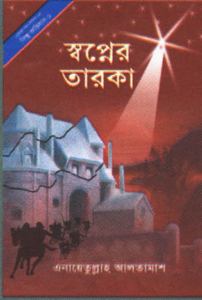
সিন্ধু উপকূলের নৌডাকাতরা আরবদের সর্বস্ব লুটে নিলো। নারী শিশুসহ বন্দী করলো সবাইকে। নির্যাতিতা এক আরব কন্যার আর্তনাদ ও উদ্ধারের আবেদন নিয়ে হাজ্জাজের কাছে রওয়ানা হলো এক অভিযাত্রী। লুটেরাদের ধৃষ্টতায় আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠলেন হাজ্জাজ। শপথ নিলেন রাজা দাহিরকে উচিত শিক্ষা দিবেন।

এক স্বজাতি কন্যার সম্ভ্রম রক্ষা আর নির্যাতিতদের উদ্ধারে হাজ্জাজের সহযোগী হলো বসরা বাগদাদ তথা ইরাকের হাজার যুবক। কিন্তু বাধ সাধলেন আয়েশী খলীফা।

অথৈ সাগর বিস্তর দূরত্ব দুর্গম পথ আর খলীফা ওয়ালিদ বিন মালিকের বিরোধিতা সত্বেত্ত অত্যাচারী সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে শুরু হলো লোমহর্ষক অভিযান....।

কিন্তু অপরিচিত ভারত আর বিশাল পৌত্তলিক শক্তির কাছে পরপর ব্যর্থ হলো দু'টি অভিযান। শাহাদত বরণ করলেন সেনাপতি সহ শত শত মুজাহিদ।

অবশেষে মাত্র সতের বছর বয়সী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে অপরাজেয় সিন্ধু রাজের বিরুদ্ধে পাঠালেন হাজ্জাজ। বিপুল শক্তির অধিকারী সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে এক কিশোর সেনাপতি....।

নির্ভিক চিত্তে দৃঢ়পদে বিজয়ের কঠিন সংকল্প নিয়ে শুরু হলো বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযান...কিন্তু কিভাবে? আসুন এই শ্বাসরুদ্ধকর উপাখ্যানের ভিতরে প্রবেশ করি....।

দারুল উলূম লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।